এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের গল্প | কেরিয়ার গাইড : অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেস | একদিনের ক্রিকেটে সেরা পাঁচ বোলার

১৬ অগস্ট ১৯৯৫ আনন্দবাজার প্রকাশন পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

টাইম মেশিনের ১০০ বছর

টিনটিন-এর অমর স্রষ্টা হার্জের জো, জেট ও জোকোর নতুন অ্যাডভেঞ্চার

গন্তব্য নিউ ইয়র্ক

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নিলয় সরকার
স্ক্যান করেছেন - নিলয় সরকার
এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। নীল সাগরে নির্বাসিত সবুজ শয়তান।
বুকে বাঁধা পাথরের চাঁই। আর কি চাই!

চিরবিদায়, **ওনিডা ২১!** ডুবছ তুমি, অথচ আনন্দের ঢেউ উঠছে আমার বুকে। বাঃ।

তোমার সুখী শরীরে এখন নোনাজলের সোহাগচুম্বন। কোথায় রইল সেইসব বিশেষত্বের ফিরিস্তি... ফুল স্কোয়ার টিউবের গরিমা, ৫০-চ্যানেলের দম্ভ?

তোমার অহমিকা তোমায় কুরে কুরে খাবে পাতালের পথে। নিজেকে অনন্য ভেবেছিলে, এখন পড়ে থাক একা। ডুবুরীরাও তোমার হদিশ পারেনা।

জলের-ও রসিকতা কম নয়। তুমি ডুবছ, আওয়াজ উঠছে, ডুবুক্... ডুবুক্...ডুবুক্...

ওনিডা ২১

পড়শীর ঈর্ষা আপনার গর্ব!

Avenues:O:176:94R

আনন্দমেলা

২১ বর্ষ ৯ সংখ্যা   ৩০ শ্রাবণ ১৪০২   ১৬ অগস্ট ১৯৯৫

৫৪ গন্তব্য নিউ ইয়র্ক

টিনটিন কমিক্‌স-এর অমর স্রষ্টা হার্জে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের মন কেড়ে নিয়েছেন। হার্জের আর এক সৃষ্টি জো, জেট ও জোকোর কমিক্‌স। জো, জেট ও জোকোর অ্যাডভেঞ্চার 'জন পাম্পের উত্তরাধিকার' বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 'আনন্দমেলা' পত্রিকায়। ওই কমিক্‌সেরই দ্বিতীয় ভাগ 'গন্তব্য নিউ ইয়র্ক' এই সংখ্যা থেকে শুরু হল। আনন্দমেলা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই কমিক্‌সটি প্রকাশিত হবে। 'স্ট্র্যাটোশিপ' নিয়ে জো, জেট ও জোকো কী করল, জানা যাবে নতুন এই কমিক্‌সে।

৮৯ ইউ এস ওপেন

আর কয়েকদিন পরেই শুরু হচ্ছে ইউ এস ওপেন। এই গ্র্যান্ড স্লাম টেনিস প্রতিযোগিতা কে জিতবেন? চ্যাম্পিয়ান হয়ে মোনিকা সেলেস কি তাঁর প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখবেন? আলোচনা করেছেন দেবকিশোর সরকার।

১৫ টাইম মেশিনের ১০০ বছর

ওয়েল্‌সের লেখা 'দ্য টাইম মেশিন'-এর রচনাকাল ১৮৯৫। বইটির শতবর্ষে ওয়েল্‌স ও তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন মঞ্জুভাষ মিত্র।

•

আগামী আকর্ষণ

প্রচ্ছদকাহিনী : **লাই ডিটেক্টর**

কেমন যন্ত্র লাই ডিটেক্টর? এই যন্ত্র কীভাবে মিথ্যে ধরে ফ্যালে?

শুরু হচ্ছে অ্যাসটেরিক্সের নতুন কমিক্‌স

গ্ল্যাডিয়েটর অ্যাসটেরিক্স

•

এ ছাড়াও

ধারাবাহিক উপন্যাস
ফুলের বিষের গন্ধ সমরেশ মজুমদার ৩৬
পাণ্ডব গোয়েন্দা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৬৩
গল্প
স্টিমারডুবির পরে এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ৬
সরষের মধ্যে ভূত শিবতোষ ঘোষ ৪৪
পালিয়ে ফেরা সুবোধ ভট্টাচার্য ৫৬
সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস (শেষাংশ)
গোয়েন্দা সব্যসাচী মণিশঙ্কর দেবনাথ ৬৬
কেরিয়ার গাইড
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি... অমর দাশ ৩৬
বিশ্ব বিচিত্রা
বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা... প্রশান্তকুমার বসু ৮০
বিজ্ঞান : গবেষণা
জীবন্ত ডি এন এ গণক সুব্রত রায় ৩২
কবিতা
রং-বেরং রত্নেশ্বর হাজরা ৭০
খেলাধুলো
কার পোস্টার ২৯ খেলার খবর ৮৬
একদিনের ক্রিকেট... হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮৩
এবার সুইপার হিসেবে... সমর গুপ্ত ৮৮
রঙিন পোস্টার : মোনিকা সেলেস ৮২
নিয়মিত কমিক্‌স
আর্চি ৩১ **টিনটিন** ৩৪ **অরণ্যদেব** ৩৮ **ডাঃ রেক্স মর্গান** ৪২ **অ্যাসটেরিক্স ও সোনার কাস্তে** ৪৬ **গ্রহের নাম অ্যালফ্লোলল** ৫০ **টারজান** ৫৮ **গাবলু** ৬২
নিয়মিত বিভাগ
চিঠিচাপাটি ৫ **বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে** ১১ **বইয়ের খবর** ৩০ **কুইজ** ৫২ **হাসিখুশি** ৬৪ **শব্দসন্ধান** ৭৪ **নানারকম** ৭৮

•

সম্পাদক
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দাম ১৫ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা
উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

বর্ষাকালের সর্দি-কাশি থেকে আপনার শিশুকে আগলে রেখে, ওকে দিন এগিয়ে যাবার শক্তি —

বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ স্পেশাল-এর কল্যাণে।

সাধারণ চ্যবনপ্রাশের চেয়ে অনেক বেশী কার্য্যকরী **বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ**। কারণ এতে মকরধ্বজ ছাড়াও আছে ৪৮ টি প্রাকৃতিক গুণ, যেমন বংশলোচন, পিপুল এবং আমলা।

তাছাড়া সাধারণ অসুখবিসুখ এবং সর্দ্দিকাশি প্রতিরোধ করতে **বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশে** যোগ করা হয়েছে **অকৃত্রিম ভিটামিন 'সি', ক্যালসিয়াম ও মিনারেল।**

দিনে দু'বার দু-চামচ **বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ** সারা পরিবারের পক্ষে আদর্শ টনিক। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শক্তিমান ও প্রাণবন্ত জীবনের এই একটিই সহজ উপায়।

বৈদ্যনাথ
চ্যবনপ্রাশ
স্পেশাল

দিনে দু-চামচ দিয়ে সর্দি-কাশি দিন তাড়িয়ে

Mileage 554

প্রাণিজগতে ছদ্মবেশ

➤ আনন্দমেলা পত্রিকায় প্রকাশিত যুধাজিৎ দাশগুপ্তের লেখা 'ছদ্মবেশ যাদের আসল রূপ' সত্যিই আকর্ষক এক নিবন্ধ। প্রাণিজগতের নানা রহস্য আজও আমাদের অজানা অচেনা রয়ে গিয়েছে। এই লেখাটি পড়ে প্রাণিজগতের বিশেষ কিছু কর্মকাণ্ডের হদিস পেলাম।

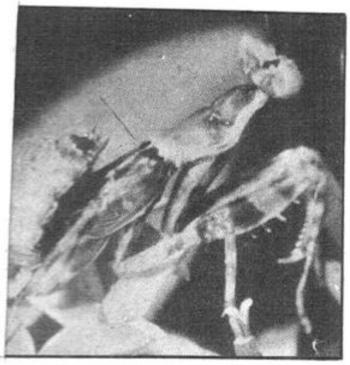

প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর আচারআচরণ যেমন বিস্ময় জাগায়, তেমনই অবাক করে দেয় ছদ্মবেশের ব্যাপারটি। লেখক তাঁর লেখায় প্রাণীদের আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে ছদ্মবেশ নেওয়ার কথা বলেছেন। সবুজ পাতার ওপর খোলা জায়গায় বসে থাকা সবুজ গঙ্গাফড়িং কিংবা শুকনো পাতার মতো ছোট মথ কীভাবে শত্রুর চোখে ধুলো দেয়, তা সুন্দরভাবে লেখক বুঝিয়েছেন। 'আফ্রিকান জেনেসিস' বইটির লেখক রবার্ট আড্রেকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই বি লিকি প্রথম চিনিয়েছিলেন কচুরিপানার ডাঁটির চারপাশে ভিড় করে থাকা ফুলের পাপড়ি যে-আসলে ছদ্মবেশী মথের দল, সে-তথ্যও কম আকর্ষক নয়। সব মিলিয়ে নিবন্ধটি সুখপাঠ্য হয়েছে।

●বিনম্র বসু
নিউ জলপাইগুড়ি

ভাললাগা-বিষয়ের অভাব নেই

আমি প্রায় ছ' বছরেরও বেশি সময় ধরে আনন্দমেলার নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের প্রচ্ছদকাহিনী, ফিচার, কুইজ, কমিক্স আমার খুবই প্রিয়। ভাল লাগে বিভিন্ন লেখকের গল্প, উপন্যাস পড়তে। তার সঙ্গে আছে নিয়মিত বিভাগ। পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। এবারের প্রচ্ছদকাহিনী 'ব্ল্যাক বক্স রহস্য' পড়ে সত্যিই খুব ভাল লাগল। ভিন্ন স্বাদের এই প্রচ্ছদকাহিনীটি পড়তে- পড়তে বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি। ভাল লেগেছে 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগটিও। তবে কমিক্সের মধ্যে 'গ্রহের নাম অ্যালফ্রোলল' এবং 'ডাঃ রেক্স মর্গান' তেমন করে মন টানে না। বরং এই দুটির বদলে ম্যানড্রেক, হিম্যান, ব্যাটম্যান বা সুপারম্যান কমিক্স প্রকাশিত হলে খুবই ভাল লাগবে। 'নানারকম' বিভাগের 'জট ছাড়াও' অংশটিতে যেসব শব্দ দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি আরও একটু কঠিন হলে মন্দ কী!
আমরা জানি, পদ্ম ভারতের জাতীয় ফুল। কিন্তু ৫ জুলাই-এর আনন্দমেলার 'ভাবতে- ভাবতে' বিভাগে লেখা হয়েছে, গোলাপ। তথ্যটি সঠিক নয়। এই ত্রুটি বাদ দিয়ে গোটা সংখ্যাটি দারুণ লেগেছে। সব মিলিয়ে আনন্দমেলার তুলনা মেলা ভার।

● অঞ্জন ঘোষ
মাইথন, এরিয়া-৬

পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে অনেক রহস্য

অসংখ্য রহস্য ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে, তার কিছু হদিস পেলাম আনন্দমেলা পত্রিকার 'আজও রহস্য' প্রচ্ছদকাহিনীতে। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রিল ভট্টাচার্যের লেখা পড়ে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। এজন্য লেখকদের ধন্যবাদ। ১২০ বছরের সদাহাস্যময়ী হুইলচেয়ারে বন্দিনী বধির ও প্রায়-অন্ধ জাঁর কালমঁর কাহিনী সত্যিই বিস্ময়কর। জীবনের ওপর দিয়ে নানারকমের ঝড় বয়ে গেলেও তিনি তা হাসিমুখেই মেনে নিয়েছেন। তাঁর জন্মদিনে 'বার্থ ডে কার্ড' পাঠিয়েছেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। ওই মৃত্যুঞ্জয়ী মহিলাটির জীবনীশক্তিকে সম্মান জানিয়ে নাম বদলে দেওয়া হয়েছে নার্সিংহোমের! তবে আমাদের

অপেক্ষায় থাকতে হবে তিনি জাপানের শিগোচিও ইজুমির দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার রেকর্ড ভাঙতে পারেন কি না, দেখবার জন্য। সেদিনের অবশ্য খুব বেশি দেরি নেই। রোবট নিয়েও বেশ কিছু তথ্য আছে লেখাটিতে। জানতে পারলাম, টোকিয়োর রোবট উৎপাদন কারখানায় কাজ করে রোবট। এবং সেই কারখানায় মানুষের কোনও ভূমিকাই নেই। আজ পর্যন্ত 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড্‌স' যত কপি বিক্রি হয়েছে, সেগুলিকে একটার-পর- একটা সাজিয়ে রাখলে ১৬৮টি মাউন্ট এভারেস্টের সমান, ঘটনাটিও দারুণ চমকপ্রদ! প্রচ্ছদকাহিনীটি না পড়লে এই আশ্চর্য ঘটনার কথা জানতে পারতাম না।

● অমূল্য চক্রবর্তী
বরানগর, কলকাতা

স্টিমারডুবির পরে

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

"মুন্নি, আবার তুমি চামচ দিয়ে প্লেটে ঠকঠক করছ?" ধমকে উঠলেন ছোটমাসি।

মুন্নির বয়স তিন, সে যখন যা ইচ্ছে তাই করে, যেখানে খুশি উঠে যায়, চেয়ার বেয়ে আলমারির মাথায় উঠে বসে পড়ে, তারপর হুকুম করে, আমি এখানে বসে ভাত খাব। তাকে সামলাতে বাড়িসুদ্ধু সকলের প্রাণান্ত। ছোটমাসির কথা সে শুনতে পেল বলে মনেই হল না। যেমন ঠকঠক করছিল তেমনই করে যেতে লাগল।

দুপুরে সবাই খেতে বসেছে। বাবা-মা অফিসে। মুন্নির একপাশে ছোট, অন্য পাশে বোবো, এরা দু'জন তার পিসতুতো ভাই, তাদের বয়স দশ আর বারো। মুন্নির কাছে তারা বিরাট বড়। তা ছাড়া আছে ছোটমাসির মেয়ে রুমনি, তার বয়স চার।

"মুন্নি ?" আবার ধমক দিলেন ছোটমাসি। "বলছি না ওরকম করবে না ?"

"কেন ? ওরকম করলে কী হয় ?" পালটা চ্যালেঞ্জ জানাল মুন্নি।

"কী আবার হয় ? প্লেট ভেঙে যায়।"

"কই, ভাঙেনি তো ?" অম্লান বদনে জবাব দিল মুন্নি।

আবার মনের আনন্দে চামচ ঠুকতে লাগল সে। বোঝাই যাচ্ছে বারণ করাতে তার জেদ আরও বেড়ে গেছে। এবারে বোবোদাদা আর ছোটদাদা আসরে অবতীর্ণ হল। কেননা এদের সাইজের জন্য মুন্নি এদের একটু ভয়ের চোখে দেখে।

"কী হয় ? কী হয় ?" বোবো চোখ পাকাল। "প্লেটে চামচ ঠুকলে কী হয় বলব ?"

"প্লেটে ঠকঠক করলে ভূত আসে," গম্ভীরভাবে বলে উঠল ছোট।

"মা ? প্লেটে চামচ দিয়ে ঠকঠক করলে ভূত আসে ?" ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল রুমনি।

ছোটমাসি বললেন, "ছোট ! বোবো ! কে বলেছে ভূত আসে ?"

বোবো আর ছোটয় গলাগলি ভাব। যদিও ভূতের কথাটা বলেছে ছোট, বোবো তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, "আসেই তো।"

"কে বলেছে ?"

"আমি বলেছি।"

"তুমি দেখেছ ?"

"কী ?"

"প্লেট ঠকঠক করলে ভূত আসতে ?"

"আমি দেখিনি, তবে মা দেখেছেন।"

"কোথায় ? কোথায় ভূত দেখেছেন মা ?"

"ওই তো পিন্টুকাকাদের বাড়ি ভূত ডাকার নেমন্তন্ন হয়েছিল, সেখানে বাবা-মা সবাই গিয়েছিলেন, আরও সবাই ছিল—"

"তোরা ছিলি ?"

বোবোর মুখ গম্ভীর হল, "আমাদের নিয়ে যাননি। ছোটদের নিয়ে যাওয়া বারণ ছিল, তাই। নইলে..." মনে করেই রাগ হতে লাগল। ইস, কত বড় একটা চান্স মিস হয়ে গেল। জীবনে আর হয়তো কোনওদিন ভূত দেখার নেমন্তন্ন হবে না। এমনিতেই সুন্দরবনের বাঘেদের মধ্যে ভূতরা চট করে মানুষের সামনে আসতে চায় না, আর এখন তো পোড়ো বাড়ি, সংরক্ষিত অঞ্চল হয়ে যাচ্ছে, সেইসব বাড়িতে যেসব ভূত আছে, যেমন ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূত ও আরও ভূত ঘুরে বেড়ায়, তাদের দেখাশোনার ভার সরকার নিয়ে নিয়েছেন। ইচ্ছে করলেই টর্চ হাতে অন্ধকার রাত্রে অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরনো যাবে না। সংরক্ষিত পোড়ো বাড়ির আনাচে-কানাচে গেলেই পুলিশ ধরে ফেলবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অসমাপ্ত কথাটা শেষ করল বোবো, "নইলে তুমি আমার কাছ থেকে আজ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেতে।"

ছোটমাসি অত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রই নন। বললেন, "ঠিক আছে। তোর বদলে তোর বাবা-মা দেখেছেন তো ? কী দেখেছিলেন তাঁরা ?"

পাছে বোবো আবার কথা বলতে শুরু করে দেয়, তাই ছোট তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি বলছি, আমি বলছি, এই বোবো, তুই মাঝখান থেকে বাগড়া দিবি না।"

"আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। তবে উলটোপালটা বললে কারেক্ট করে দেব।"

সকলেই খাওয়া ছেড়ে ছোটর দিকে গোল-গোল চোখ করে তাকিয়ে আছে। কেবল মুন্নি অত কিছু বোঝে না, সে এই সুযোগে মাছের ঝোল মাখা ভাতগুলো প্লেটের তলায় চালান করে দিয়ে বেছে-বেছে শুধু আলু মুখে পুরতে লাগল।

ছোটমাসি বললেন, "মুন্নি ?"

ছোট বলল, "এক থাপ্পড় মারব। ভাত ফেলছিস কেন ?"

ছোটমাসি বললেন, "সীতা, তুমি দুধ গরম করা ছেড়ে একটু এদিকে এসো তো। মুন্নি খালি আলু খাচ্ছে দ্যাখো।"

সীতার কাছে মুন্নি ঠাণ্ডা। সীতা এসে এক হাতে তার মাথাটা শক্ত করে ধরে অন্য হাতে গুলি পাকিয়ে ঝোলভাত মুন্নির মুখে পুরে দিতে লাগল, ছোটমাসি নিশ্চিন্ত মনে ছোটর দিকে ফিরলেন, "এইবার বল, প্ল্যানচেটের কথা।"

ছোট মহা আশ্চর্য হয়ে বলল, "তুমি কী করে জানলে ওটা প্ল্যানচেট ?"

ছোটমাসি মুচকি হেসে বললেন, "তুইই বল না। তোর মুখ থেকে আর-একবার না হয় শুনি।"

মুন্নি বলল, "আমি প্ল্যানচেট খাব।"

কেউ ওর দিকে নজর দিল না। বোবো কী একটা বলতে গিয়ে মুখটা হাঁ করে আবার বন্ধ করে ফেলল। রুমনি খুবই শান্ত মেয়ে। এতক্ষণে তার সব ভাত শেষ। সে আঙুল দিয়ে প্লেট চাটছে। আর মনে-মনে ভাবছে প্ল্যানচেট কি আঙুল দিয়ে চাটা যায় ?

ছোট আরম্ভ করল, "একটা অন্ধকার ঘরে সবাই গোল হয়ে বসে আছে—"

বোবো ফোড়ন কাটল, "একটা গোল টেবিলের চারপাশে।"

"ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। টেবিলের ওপর সবাই মিলে একটা পেন্সিল ধরে বসে আছে, ভয়ে সবাইকার বুক ধুপধুপ করছে।"

"কেন ?" ছোটমাসি জানতে চাইলেন।

"বাঃ, ভূত আসবে যে !"

বোবো ভাল করে বুঝিয়ে বলল, "ওই পেন্সিলের ওপর ভূতের ভর হবে।"

"কী হল তারপর ?" ছোটমাসি তাড়াতাড়ি শেষটা শুনতে চান। "এল ভূত ? দেখতে পেল সবাই ?"

"তা কী করে হবে ? ভূতকে কেউ দেখতে পায় না। পেন্সিলের ওপর এসে বসেছে ভূত, কেউ কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। পেন্সিলটা হঠাৎ কেমন ভারী-ভারী হয়ে গেল। তারপর ঠকঠক শব্দ হতে লাগল।"

বোবো একটু নাটকীয়ভাবে বলে উঠল, "পিন্টুকাকার সঙ্গে আগেই ভূতের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। উনি জানতেন ভূত মানুষের ভাষায় কথা বলে না। পেন্সিল দিয়ে

আওয়াজ করে। একটা ঠক মানে— হ্যাঁ, দুটো ঠক মানে— না।"

ছোট বলল, "গল্পটা কিন্তু আমি বলছি।"

ছোটমাসি বললেন, "হ্যাঁ, তুই বলে যা। তারপর কী হল?"

ছোট বলল, "তারপর তো পেন্সিল ঠকঠক করতে লাগল। পিণ্টুকাকা বললেন, 'তোমাদের কারও যদি কিছু প্রশ্ন থাকে এই বেলা করে ফ্যালো, ও কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।' তখন পিণ্টুকাকার এক দিদি বললেন, 'ভূত, তুমি কি আমাদের বেলগাছে থাকো?' পেন্সিল বলল, 'ঠক, ঠক'। তার মানে থাকি না। বাবা বললেন, 'তা হলে তোমার বাড়ি কোথায়?' পেন্সিল ভীষণ চটে গিয়ে অনেক ঠকঠক করতে লাগল। পিণ্টুকাকা যেই বলতে যাবেন ওরকম প্রশ্ন কোরো না, এমন সময় বাইরের ঘরে ফোন বাজল। 'দাদাবাবু, আপনার ফোন' বলতে-বলতে বংশী এসে যেই ঘরের আলো জ্বেলেছে, ব্যস, অমনই ভূত হাওয়া।"

ছোটমাসি হতাশ হয়ে বললেন, "চলে গেল? একদম চলে গেল?"

বোবো, ছোট সমস্বরে বলে উঠল, "একদম চলে গেল? আর এল না!"

"ও, এই হল তোর মা'র ভূত দেখা! এর চেয়ে ভাল ভূত আমি দেখেছি। শুনতে চাস তো তাড়াতাড়ি দুধ-ভাত খেয়ে নে।"

বোবো তাকাল ছোটর দিকে। ছোট বলল, "আমরা দুধ-ভাত খাই না।"

ছোটমাসি গম্ভীর হয়ে বললেন, "যখন যা পাবে তাই খেয়ে নেবে, বুঝলে! তা ছাড়া আমার ভূত দেখার গল্প যদি শুনতে চাও, তা হলে আর কথা না বাড়িয়ে সীতা যা দিচ্ছে তাই খেয়ে নাও।"

বোবোর মনে পড়ে গেল, চটে গেলে বাবা প্রায়ই বলেন, "এর পর নুন-ভাতও জুটবে না বলে রাখছি।" যাক গে, দুধ-ভাত তো নুন-ভাতের চেয়ে ভাল। কোনওমতে খেয়ে ফেললে সত্যি ভূতের সঙ্গে ছোটমাসির কেমন দেখা হয়েছিল জানা যাবে।

খাবার টেবিল নিঃশব্দ। কেবল চকাস-চকাস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারপর নিজে-নিজে চেয়ার থেকে নামতে গিয়ে মুন্নি এক আছাড় খেল। সেই ফাঁকে রুমনি তার জলের গেলাসটা উলটে ফেলল। সুতরাং সব ঠিকঠাক করে বড় শোওয়ার ঘরে খাটের ওপর জড়ো হতে আরও দশ-পনেরো মিনিট।

মুন্নি বলল, "আমি ব্যাটম্যান দেখব।"

বোবো বলল, "এখন ব্যাটম্যান কোথায়? সে তো বিকেলে। তুমি যাও, তোমার ঘরে ঘুমোও গিয়ে। আমরা ভূতের গল্প শুনব।"

ছোটমাসি আরম্ভ করলেন, "আমাদের ছেলেবেলার কথা। আমাদের বাড়িতে সবসময় লোক গিসগিস করত। এমনিতে তো আমরা ছিলামই, মানে আমরা চার ভাই-বোন, বাবা, মা, দুই কাকা, দুই কাকিমা, দাদুর দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা, তাদের ছেলেমেয়েরা—পিসতুতো, জ্যাঠতুতো, কতরকম দিদি দাদা, তাদের বয়স তিরিশ থেকে তেরো। তার ওপর অমুকের ভায়রাভাই, তমুকের শ্যালিকার ছেলে এইরকম লোকজনের আসাযাওয়া। কেউ পরীক্ষা দিতে এসেছে, কেউ ডাক্তার দেখাতে, কেউ সবেমাত্র চাকরিতে ঢুকেছে, যতদিন বাড়ি না পায় এখানে থেকে গেল। সুতরাং সব মিলিয়ে সর্বক্ষণই একটা বিয়েবাড়ি-বিয়েবাড়ি ভাব।

"আর-একজন ছিলেন একটু আধপাগলা গোছের সাধু টাইপের, তাঁর নাম রসিকবাবু, আড়ালে অনেকে বলত রসিক পাগলা। তাঁর একটা লাঠি আর একটা মস্ত বড় ঝোলা ছিল। তিনি বাইরের অফিসঘরের সামনের বারান্দার বেঞ্চিতে উবু হয়ে বসে থাকতেন আর খালি মাথা নাড়তেন। মাঝে-মাঝে ওঁর কাছে অনেক হোমরাচোমরা লোকজন আসতেন, ভক্তিভরে প্রণাম করতেন, কীসব কথাবার্তা হত। শুনতাম রসিকবাবু নাকি হাত দেখে অতীত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারেন। আমরা ছোটরা কিন্তু ধারে-কাছে কেউ না থাকলেই রসিকবাবুকে গিয়ে বিরক্ত করতাম। তারও একটা ভাল ফরমুলা ছিল। ওঁর কাছে গিয়ে 'বুচকি বুচকি ছু' বলতে হত একটু চেঁচিয়ে, আর শুনতে পেলেই উনি লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। আমরাও পাঁই-পাঁই করে পালাতাম।

"রসিকবাবু দিনে আর রাত্রে দু'বার বেঞ্চি থেকে নেমে ভেতরবাড়িতে যাওয়ার বারান্দায় এসে বসতেন, বাড়ির ভেতরে যেতেন না কিন্তু। ওঁকে সেখানে ভাত দিয়ে যেত বিরজু বাবাজি, ইয়া কান-উঁচু থালার আধখানা ভর্তি চুড়ো করা ভাত, বাকি আধখানায় ডাল আর ভাতের চুড়োর ওপর কিছুটা তরকারি। আমার বাবা একে বলতেন, 'ক্যাট জাম্পিং রাইস'। মানে যে ভাত বেড়ালও ডিঙিয়ে পার হতে পারে না। যাই হোক, এই ভাত নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে যেত, তখন রসিকবাবু লাঠি ঠকঠক করতেন, সামনে দিয়ে কেউ হয়তো যাচ্ছে সে হাঁক দিয়ে ডাকত, 'বাবাজি, ভাত!' তখন বিরজু বাবাজি আবার এসে ওঁকে আরও ভাত আর ডাল দিয়ে যেত।

"এই যে বিরজু বাবাজি, তার ওপর ছিল আমাদের এই বিশাল পরিবারের রান্না করার ভার। বুঝতেই পারছিস, এত লোকের রান্না যে-সে লোকের কর্ম না। বিরজু বাবাজির গায়ে যা জোর ছিল—ইয়া তার হাতের গুলি, গায়ে থাক-থাক চর্বি সবসময় ঘামে চকচক করছে, বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে পৈতে। খালি গায়ে ধুতি পরত বিরজু, জুতো কিংবা চটি পরার কোনও প্রশ্নই ছিল না, ফলে তার পায়ের পাতা দুটো ছিল ফাটা নৌকোর মতো। বিরজু ভোরবেলা উনুনে আগুন দেওয়া থেকে শুরু করে দুপুর তিনটে অবধি রান্নাঘর পরিচালনা করত। আবার বিকেল চারটের সময় আর-একপ্রস্থ উনুনে আগুন, তারপর রান্না- খাওয়ার জের চলত একেবারে রাত বারোটা অবধি।

"বছরে একবার বিরজু বাবাজি দেশে যেত। তখন আর-একজন কাউকে দিয়ে যেত রান্নাঘর সামলাতে, কেননা ওই বিরাট ভাতের হাঁড়ি নামানো, কিংবা পর্বতপ্রমাণ আটা মাখা তে মেয়েদের কর্ম না। যাই হোক, সময়টা আমা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে সম্ভবত বর্ষাকাল, কার তখনই গঙ্গার জল বাড়তে-বাড়তে আমাদে স্কুলের মাঠ অবধি পৌঁছে যেত। ওই সম গঙ্গায় ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকত, কে গোরু নিয়ে ওপারে যাচ্ছে, হঠাৎ জলের স্রো গোরু ভেসে চলে গেল। আবার অনেক সম ভেসে আসা গোরু কিংবা মোষ অন্য কেউ পে গেল। তার আনন্দ দেখে কে! পরে যখ আসল গোরুর মালিক হাজির, তখন দু'জ মারামারি—এ বলে আমার গোরু, ও বলে আম গোরু। যে পেয়েছে সে বলে, 'গোরুর গায়ে নাম লেখা থাকে? ভগবান আমাকে পাই দিয়েছেন। এ আমি কাউকে দিচ্ছি না।'

"যাই হোক, এইরকম পরিস্থিতিতে বির বাবাজির ফিরে আসার সময়। সকলেই অ আগ্রহে অপেক্ষা করছে, কারণ ছোট বাবা পক্ষে আমাদের বাড়ির নানারকম লোকজ হ্যাপা সামলাতে খুব মুশকিল হচ্ছিল। তা ছা তার গায়ে বিরজুর মতো জোরও নেই, খেতে গিয়ে দাদু খুঁতখুঁত করতেন। দাদুর সাম আর কারও কথাটি বলার সাহস ছিল না, বাবা, কাকা, জ্যাঠাবাবুরা মাথা নিচু করে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে দুধের বাটিতে ফেলতেন ফিসফিস করে বলাবলি করতেন, বিরজুটা কবে ফিরবে? আর তো পারা যায় না!

"বিরজুর ফেরার দিন কিন্তু ঠিক করাই ছি কী যেন একটা অমাবস্যার পরের দিন, দুপু স্টিমারে। তখন তো গঙ্গার ওপরে ব্রিজ হয় কয়েকটি ভাঙাচোরা গোছের ফেরি স্টি পারাপার করত। তারই একটাতে করে বি গিয়েছিল শোনপুর, আবার ওই পথেই

ফেরার কথা।

"দিনটা ছিল বেস্পতিবার। বেস্পতিবারের বারবেলা কী হয় জানি না, কিন্তু সেদিন একেবারে কূলে এসে ভরাডুবি যাকে বলে, তাই হল। মহেন্দ্রঘাটের খুব কাছাকাছি এসেছে স্টিমার—সমস্ত লোক হইহই করে সেদিকের ডেকে এসে জড়ো হয়েছে, সকলেরই আগে নামার তাড়া, ফলে স্টিমার ক্রমশ একদিকে কাত হতে-হতে এতটাই কাত হয়ে গেল যে, হুড়হুড় করে জল ঢুকতে লাগল। আস্তে-আস্তে স্টিমার একেবারে বেহাল হয়ে একদম উলটে গেল আর সমস্ত লোক ঝুপঝাপ করে জলে পড়ে গেল।

"সেই স্টিমারে বিরজুর ফেরার কথা। পাড়ার একজন অতি উৎসাহী লোক খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি এসে খবর দিলেন পাশাপাশি রাখা প্রচুর ডেডবডি দেখে এসেছেন তিনি, তার মধ্যে আছে আমাদের বিরজু বাবাজি, দু' চোখ বোজা, পৈতের সঙ্গে শ্যাওলা জড়ানো, অত বড় ভুঁড়ি একদম পেচকে গেছে।

"কান্নার রোল উঠল বাড়িতে। কোনও অতি আপনজন মারা গেলেও আমরা এতটা আকুল হয়ে উঠতাম কি না সন্দেহ। কারণ বিরজুর হাতেই ছিল যাকে বলে আমাদের প্রাণভোমরার কৌটো। আমরা আছি, চান করে খেতে বসেছি সার-সার আসন পেতে, অথচ বিরজু নেই— এ তো ভাবাই যায় না!

"এই ঘোর দুঃসময়ে বাড়ির লোকেরা স্পষ্ট দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল, এই ভাগটা বরাবরই ছিল, কিন্তু অন্য সময় এতটা বোঝা যেত না। একদলে ছিলেন আমার দাদু, তিনি সকাল-সন্ধেয় 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়তেন, জলখাবার খেয়ে অঞ্জলি দিতেন, তখনকার দিনের নিষিদ্ধ খাদ্য মুরগি আলাদা করে তোলা উনুনে রান্না করিয়ে বাড়িতেই খেতেন। বাড়িতে দাদুর 'ফলোইং' ছিল বেশি, তার মধ্যে প্রধান বাবা, তিনি আবার গোপনে-গোপনে রবিঠাকুরের বেশি ভক্ত ছিলেন। অন্যদিকে ছিলেন বাবাদের জেঠিমা, কাকিমার দল; তাঁদের রান্না হত নিরামিষ রান্নাঘরে। সে-ঘরে বাসি কাপড়ে ঢোকা বারণ ছিল, তাঁরা পাথরের থালায় অনেক রকম ফল, মিষ্টি খেতেন। তাঁরা বিশেষ-বিশেষ আচার-আচরণে বিশ্বাস করতেন, যেমন, সোমবারে নখ কাটা যাবে না, সন্ধে হওয়ার পর সাপকে বলতে হবে লতা, ছোটদের বাড়ির বাইরে বের করার আগে কড়ে আঙুল কামড়ে দিতে হবে— এরকম অনেক ব্যাপার। এখন এই বিপদের দিনে ঠাকুমাদের দল খুব জোর পেয়ে গিয়ে চ্যাঁচামেচি আরম্ভ করে দিলেন।

"'বলেইছিলাম, বেস্পতিবারের বারবেলা। কেউ কি সেদিন বাড়ি থেকে বেরোয়! যত অনাছিষ্টি!'

"'তার ওপরে আগের দিন গেছে অমাবস্যা।'

"'অপঘাতে মৃত্যু! এ তো যে-সে মৃত্যু নয়!'

"'বেলগাছে এসে ভর করবে এবার। ওরে বাবা, আর তো বিকেলের পর ওদিক মাড়ানো চলবে না!'

"'শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে হয়। ওরে তোরা কেউ পুরুতমশাইকে খবর দে।'

"ভেতরবাড়ি যখন এইরকম সব গণ্ডগোলে গমগম করছে, তখন বাইরের বারান্দায় দাদু গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন, বড়রা সব এদিক-ওদিক জটলা করছেন আর আমরা ছোটরা মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেবল বেঞ্চিতে বসে রসিক পাগলা নিজের মনে হেসে চলেছেন।

"দাদু পায়চারি করতে-করতে একবার রসিকবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে একবার তাকালেন তাঁর দিকে, তারপর নিজের মনেই বললেন, 'তখনই জানি একটা কারখানা হবে।'

"দাদু প্রচণ্ড রেগে গেলে কারখানা কথাটা ব্যবহার করতেন। তার মানে, কাণ্ড-কারখানা। একটা কাণ্ড হবে এই অর্থে ব্যবহার হত কথাটা। দাদু বলতেন, একটা কারখানা হবে। এইরকম বকুনি মাঝে-মাঝে আমাদের কপালে জুটত।

"রসিকবাবু বললেন, 'বিজ-বিজ-বিজ বিজ।' বলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

"দাদু ভাবলেন, ওর বোধ হয় খিদে পেয়েছে। বললেন, 'ওরে, কে কোথায় আছিস—ছোট বাবাজিকে বল, রসিকবাবুকে খাবার দিয়ে যেতে।'

"দিদি এক দৌড়ে ভেতরে গিয়ে খবরটা রিলে করে পরের মুহূর্তেই ছুটে এসে জানাল, 'বড়মা বললেন ছোট বাবাজি নেই।'

"'কেন? কোথায় গেল সে? সেও কি স্টিমারডুবিতে মরল নাকি?'

"'বড়মা ওকে পান আনতে পাঠিয়েছেন।'

"দাদু ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে 'আবার একটা কারখানা করে ছাড়বে তোমরা' গোছের কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। শুধু তাই নয়, রাগের বদলে কীরকম অন্য একটা ভাব তাঁর মুখের 'এক্সপ্রেশন' সম্পূর্ণ বদলে দিল। দাদু এত আশ্চর্য হয়ে কী দেখছেন, আমরা দৌড়ে গেলাম সরেজমিনে পরখ করতে।

"এর পরের ঘটনা আমি জীবনে ভুলব কি না সন্দেহ। বলতে গেলে এই আমার ভূতের সঙ্গে সবচেয়ে কাছাকাছি 'এনকাউন্টার'। এ তোদের প্ল্যানচেটের পেন্সিল-ঠকঠকানো ভূত নয়, সশরীরে, জলজ্যান্ত, জল থেকে উঠে আসা ভূত, আমাদের বিরজু বাবাজি। সে কানা-উঁচু থালা হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, থালার একদিকে পাহাড়ের মতো ভাত, অন্যদিকে এক পুকুর ডাল, ভাতের চুড়োয় কুমড়োর ঘ্যাঁট।

"আমার বুকের মধ্যে দুম-দুম শব্দ হচ্ছে, গলা শুকিয়ে গেছে, হাতের চেটো ভিজে গেছে ঘামে। পেছনে ছোড়দার গলা শুনলাম কাঁপা-কাঁপা, এমনিতে তো খুব সাহসী, এখন মিনমিন করে বলছে, 'রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কী—রাম লক্ষ্মণ, রাম লক্ষ্মণ, এই তোরা বল না।' কে কী বলবে, সবাই স্তম্ভিত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কোথাও কিছু নড়ছে না, কারও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। গাছের পাতাও কাঁপছে না, দৌড়তে-দৌড়তে কাঠবেড়ালিটাও থমকে গেছে, কোথাও কোনও কাকের কা-কা, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, রাস্তার গোলমাল কিচ্ছু নেই—সব নিশ্চুপ, নিঝ্‌ঝুম। আমরা একবাড়ি লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু ঘেমে যচ্ছি।

"দাদু একটু কাসলেন। এক-পা এগোলেন। বিরজু ভাতের থালা হাতে দু' পা এগোল।

"দাদু বললেন, 'বিরজু, তুমি!'

"বিরজু ভাঙা হিন্দিতে জবাব দিল, 'আমি না তো কি আমার ভূত?'

"রসিকবাবু খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠলেন। সম্ভবত এই প্রথম তিনি এত জোরে হাসলেন।

"বিরজু বিরক্ত হয়ে বলল, 'এত হাসির কী আছে? চলেন, চলেন, আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল।'

"এতক্ষণে আমার সেজোজ্যাঠাবাবু সাহসে ভর করে এগিয়ে এলেন, 'বিরজু, তুমি তা হলে স্টিমারডুবিতে মরে যাওনি?'

"বিরজু বলল, 'রাম, রাম। আমার দুশমন জলে ডুবুক। আমি এখন অনেকদিন আপনাদের সেবা করব।'

"সেজোজ্যাঠাবাবু বললেন,'তবে যে...'

"বিরজু বলল, 'আরে। আমি তো ওই স্টিমারে উঠিইনি। নৌকো করে এসেছি। কে আবার কী বলতে গেল আপনাদের! বিরজু মরে গেলে তাদের খুব সুবিধে হয়, তাই না!' এই বলে বিরজু তার অদৃশ্য দুশমনদের উদ্দেশে অনেক গালাগালি বর্ষণ করল।"

ছোট আর বোবো এতক্ষণে নড়েচড়ে বসল। বোবো উৎসাহভরে জিজ্ঞেস করল, "কীরকম গালাগালি দিল?"

ছোটমাসি বললেন, "সে কি আর এতদিন বাদে আমার মনে আছে?"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

পুজোয় আনন্দমেলা না পেলে

ভীষণ রোগ...

উপন্যাস

সোনার ঘড়ির খোঁজে
বিমল কর
সন্তু কোথায়, কাকাবাবু কোথায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
পাতালঘর
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
মিনু-চিনুর ট্রফি
মতি নন্দী
সহজপুর কত দূর
সমরেশ মজুমদার
গল্পজুড়ে আলো
শৈলেন ঘোষ
পাণ্ডব গোয়েন্দা
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
আকাশের সিঁড়ি
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়গল্প
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দুলেন্দ্র ভৌমিক ও পার্থ বসু

গল্প
লীলা মজুমদার, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দ গুহ, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় নবনীতা দেব সেন, হিমানীশ গোস্বামী বাণী বসু, আবুল বাশার, সিদ্ধার্থ ঘোষ ও শিবতোষ ঘোষ

ভ্রমণ-অ্যাডভেঞ্চার
নদী, পাহাড় পেরিয়ে আনিনি
বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

জ্ঞান-বিজ্ঞান
অনীশ দেব, পথিক গুহ, বিনায়ক মিশ্র, সুব্রত রায়, চঞ্চল পাল, যুধাজিৎ দাশগুপ্ত, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মণিশঙ্কর দেবনাথ, অভীক ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, জয় সেনগুপ্ত, শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, বিমল বসু, গৌতম হাজরা ও তপতী বসু

খেলাধুলো
গৌতম সরকার, রূপক সাহা সুপ্রকাশ ঘোষাল মানস চক্রবর্তী ও তানাজি সেনগুপ্ত

অপ্রকাশিত ছড়া-কবিতা
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ছড়া-কবিতা
অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী ও শিবায়ন ঘোষ

বিজ্ঞানের কুইজ
ডেরেক ও'ব্রায়েন

ধাঁধা-মজা
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

কমিক্স
অরণ্যদেব, কে এই প্রহরী

এ ছাড়াও শারদীয় শব্দসন্ধান ও গোয়েন্দা-তদন্ত

বিশেষ আকর্ষণ

সত্যজিৎ রায়ের অপ্রকাশিত গল্প
সহযাত্রী
এ ছাড়াও সম্পূর্ণ একটি
শঙ্কু-কাহিনী
আশাপূর্ণা দেবীর অপ্রকাশিত বড়গল্প
মন নিয়েই মহা মুশকিল
পি. সি. সরকার (জুনিয়ার) শিখিয়ে দিয়েছেন—
এক ডজন ম্যাজিক

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

আনন্দমেলা

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

১৪০২ ■ ৭২ টাকা

Clarion 3A1B10

পকেট-যন্ত্রানুষঙ্গী

● কোনও অনুষ্ঠানে গাইতে গেলে গায়ককে সাধারণত বাজনদারদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু 'পকেট ব্যান্ড' নামে এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটি সঙ্গে থাকলে যন্ত্রী না হলেও চলে। এতে তালবাদ্য এবং অন্য কিছু যন্ত্রের সুর মেলে, যা চালিয়ে দিয়ে শিল্পী স্বচ্ছন্দে যে কোনও গান গাইতে পারেন, নিজের হাতেও বাজাতে হয় না হারমোনিয়াম, গিটার বা বঙ্গো। অবশ্যই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উপযোগী এই ব্যান্ড। তবে কোনও সফ্‌টওয়্যার বিশেষজ্ঞ চেষ্টা করলে হয়তো শাস্ত্রীয় না হোক একে লঘু ভারতীয় সঙ্গীতের সহযোগী করে

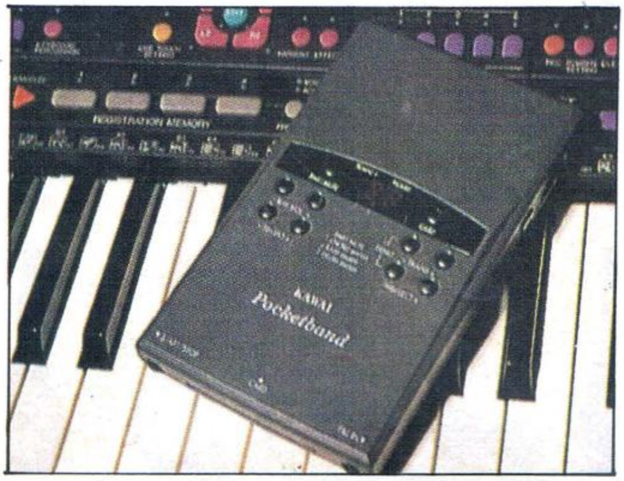

তুলতেও পারেন। পকেট-ব্যান্ডের আছে নিজস্ব স্পিকার, সেইসঙ্গে হেডফোন, যা কানে লাগিয়ে একা-একা খালি হাতে দিব্যি গাইতে পারেন কোনও পপ বা ডিস্কো স্টার।

রক থেকে বিগ ব্যান্ড পর্যন্ত ২০টি রিদ্‌ম বা তাল মিলবে এই যন্ত্রে। এতে গানও বাজানো যায়। 'কাওয়াই আমেরিকা'-র তৈরি এই যন্ত্রানুষঙ্গী ওজনে এক পাউন্ডেরও কম। দাম ১৯৯ ডলার।

আকাশপথে চলা

● রাস্তায় যখন সার দিয়ে গাড়ি চলে তখন একটা গাড়ির সঙ্গে অন্যটির নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। যাতে সামনের গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলে পেছনেরটা গিয়ে তাতে ধাক্কা না মারে। বিমানের বেলাতেও এ-ধরনের দূরত্ব মেনে চলা জরুরি, সেটা অবশ্য সামনের বিমানের সঙ্গে পেছনে-আসা বিমানটির ধাক্কা এড়াতে নয়।

কারণ, আকাশপথে বিমানগুলি ডাঙার গাড়ির মতো সাধারণত সার বেঁধে চলে না। যুদ্ধ হলে অবশ্য আলাদা কথা। জাম্বো জেট জাতীয় খুব বড় মাপের বিমান উড়ে চলার সময় পেছনদিকে প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে এবং অন্য কোনও বিমান তাতে পড়লে ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পারে দুর্ঘটনায়। নদী বা সমুদ্রে বড় জাহাজ বা স্টিমার গেলে তার পেছনে জলে যেরকম ঘূর্ণি জেগে ওঠে এবং ছোট বোট বা নৌকো সেটা এড়িয়ে চলে, আকাশপথেও সেই একই নিয়ম। এই নিয়ম ঠিক-ঠিক না মেনে চলার দরুনই গত তিন বছরে বোয়িং ৭৫৭-এর পিছু-পিছু ওড়া দুটি হালকা ধরনের বিমান ভেঙে পড়ে, মারা যান মোট ১৩ জন যাত্রী। তাই মার্কিন প্রশাসন বড় বিমানের বেলায় এই দূরত্ব তিন থেকে বাড়িয়ে চার মাইল করার নির্দেশ দিয়েছে। এই সংক্রান্ত এক মার্কিন পরামর্শদাতা কমিটি অবশ্য বলেছে যে, দূরত্বটা অন্তত ছ' মাইল হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, শুধু আমেরিকায় নয়, সব দেশেই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

প্রাণরক্ষক গুটি

● যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত কোনও সৈন্যকে গাড়ি বা বিমানে করে দূরের কোনও হাসপাতালে পৌঁছে দিতে-দিতেই অনেক সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বা অন্য কারণে তার মৃত্যু ঘটে। কারণ, নিয়ে যাওয়ার সময়টুকুতে তার উপযুক্ত চিকিৎসা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিটি যাতে বেঁচে থাকে তার জন্য বানানো হচ্ছে কফিনের মতো একরকম বাক্স, যাকে বলা হচ্ছে 'লাইফ সেভিং কোকুন' বা 'প্রাণরক্ষক গুটি'। এতে আছে অক্সিজেন তৈরির যন্ত্র, 'রেসপিরেটর' অর্থাৎ প্রশ্বাস গ্রহণের যন্ত্র, 'সাকশন ইউনিট', যা দিয়ে ক্ষরিত রক্ত এবং দূষিত গ্যাস বের করে দেওয়া যায় এবং আছে ভেতরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। এর ফলে গুটির মধ্যে রেশমকীটের মতোই নিরাপদে থাকে রোগী।

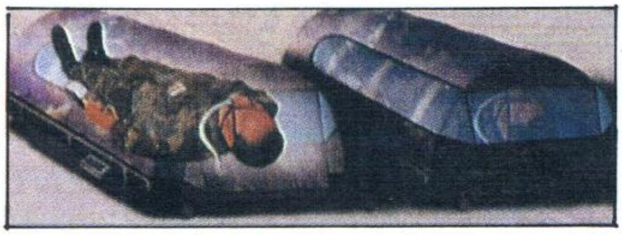

তাকে স্থানান্তরিত করার সময় আপনাআপনিই চলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও দেখভাল। এর পরিকল্পনা করেছে 'নরথ্রপ গ্রুম্যান' বলে একটি সংস্থা। ১৯৯৭ নাগাদ এটি বেরিয়ে যাবে।

মিনি ভিডিও ক্যামেরা

● লিলিপুট সাইজের এই ভিডিও ক্যামেরার নাম, 'পি সি কার্ড ক্যামেরা'। স্বচ্ছন্দে এটি অ্যাটাচির একধারে আটকে নেওয়া যায়। এতে অবশ্য কেবল সাদা-কালো ভিডিও ছবিই ওঠে। টিভি রিপোর্টারদের পক্ষে একেবারে আদর্শ। খবরের জন্য অকুস্থলে গিয়ে ঝটপট কিছু ঘটনার দৃশ্যও তুলে নিতে পারেন। পেশাদার ভিডিও ফোটোগ্রাফাররাও ব্যবহার করতে পারেন যত্রতত্র। কারণ স্থির ছবিও তোলা যায় এই ক্যামেরায়। প্রতি সেকেন্ডে ভিডিও বা স্টিল ছবির পাঁচটি করে ফ্রেম ধরা পড়ে এতে। এই মিনি ভিডিও ক্যামেরার লেন্স-এর 'রেজলিউশন পাওয়ার' অর্থাৎ দৃশ্যের খুঁটিনাটি অংশ ধরে রাখার ক্ষমতাও বেশি। এর সঙ্গে 'এডিটিং সফ্‌টওয়্যার'ও পাওয়া যায়। শুধু ক্যামেরার দাম ৬০০ ডলার। সফ্‌টওয়্যারসহ ৭০০ ডলার।

পুজো এসে গেল । আর পুজোর সময়, পড়তেই হবে এবারের সন্তু ও কাকাবাবুর উপন্যাস, জানতেই হবে কিকিরা কী করছেন এই পুজোয়, আর কী করছে পাণ্ডব গোয়েন্দারা । কখনও কি ছাড়া যায় সত্যজিৎ রায়ের লেখা একটি অপ্রকাশিত এবং প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে আরও একটি গল্প ? মোট আটটি উপন্যাস, চারটি বড়গল্প এবং আরও অনেক গল্প তো আছেই । দারুণ কাটবে পুজোর দিনগুলো ।

এবারের পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা হাতে না পেলে— সোজা একেবারে দোজোতে— আমি ব্ল্যাক বেল্ট, জানো না !

চাই হাতে, নয়তো
রোবটে

আনন্দমেলা
তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী
১৪০২ ■ ৭২ টাকা

Clarion 3A1B09

টেট্রাবট

● এও এক রোবট, কাজের ধরন অনুযায়ী যে নিজের রূপ বদলাতে পারে। ভবিষ্যতে চাঁদ বা মঙ্গলে স্থায়ী কেন্দ্র গড়ার কাজে এ-জাতীয় রোবট ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা ভেবেই মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এটি নির্মাণের জন্য টাকা ঢালছে। আর্থার স্যান্ডারসনের নেতৃত্বে রেন্‌সেলার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এর নির্মাণকল্পে চলেছে গবেষণা। বলা বাহুল্য, টেট্রাবটকে চালানো হবে দূর নিয়ন্ত্রণে। একুশ শতকে 'স্পেসস্টেশন' নির্মাণ বা চাঁদে কলোনি বসাতে এরকম বা এর চেয়েও উন্নততর শ'য়ে-শ'য়ে রোবট হয়তো কাজে নেমে পড়বে।

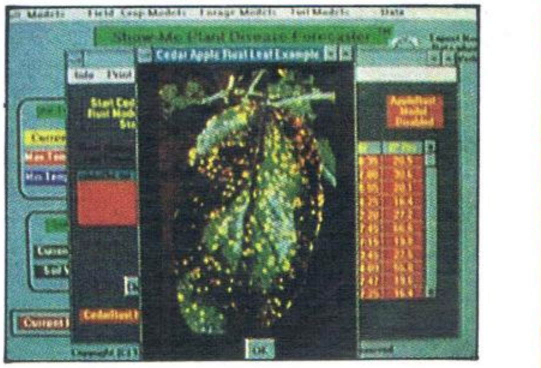

কম্পিউটারে পেস্ট কন্ট্রোল

● 'পেস্ট কন্ট্রোল' মানে ফসল খেতে, ফলের বাগানে রোগপোকার আক্রমণ ঠেকানো। এখন এ-কাজে ব্যবহার করা হয় নানা ধরনের কীটনাশক, যা নিয়তই দূষিত করছে পরিবেশ। ভবিষ্যতের কৃষকরা কম্পিউটারের সাহায্যে অনেক কম রাসায়নিক ব্যবহার করে সহজেই এটা করতে পারবেন। মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী এ নিয়েই গবেষণা চালাচ্ছেন। তাঁরা 'শো মি প্ল্যান্ট ডিজিস ফোরকাস্টিং' বলে একটি ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছেন, যাতে ব্যবহার করা হচ্ছে পি সি, ফিল্ড মনিটর এবং আবহ সংক্রান্ত কিছু যন্ত্রপাতি। এতে হাওয়ার গতি, বৃষ্টিপাত, বাতাসের আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং গাছের পাতার জলীয় অংশের মাত্রা নির্ণয় করে বলে দেওয়া হয় কখন কোন ধরনের রোগ-পোকার আক্রমণ কীরকম মাত্রায় ঘটতে পারে। কম্পিউটারের পরদায় ফুটে ওঠে সেইসব পোকার চেহারা, বিস্তারিত বিবরণ এবং কী ধরনের কীটনাশক কত পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে তারও নির্দেশ। ফলে কৃষকরা আগে থেকেই আক্রমণ ঠেকানোর জন্য তৈরি হতে পারেন। কীটনাশকও এলোমেলোভাবে যথেচ্ছ ছড়ানোর প্রয়োজন হয় না। এই 'শো-মি সিস্টেম'-এর দাম প্রায় ১২০০ ডলার (পি সি ছাড়া)। এটি বাজারে এসে যাবে আগামী বছর। ভারতের মতো উন্নয়নশীল কৃষিনির্ভর দেশে যেখানে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছে, এই ব্যবস্থা আদর্শ হয়ে উঠতে পারে।

বিমল বসু

PID 63 95 BEN
ZEN

টাইম মেশিনের ১০০ বছর

২৮ বছরের যুবক এইচ. জি. ওয়েল্‌স ছুটি কাটাতে এসেছিলেন সেভেনোয়াকসের পল্লীভবনে। মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে তিনি লিখে ফেলেন ৩৫ হাজার শব্দের কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী 'দ্য টাইম মেশিন'।

'ন্যাশনাল অবজার্ভার' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে উপন্যাসটি। ১৮৯৫ সালে লেখা সেই উপন্যাসের শতবার্ষিকী এবছর। এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে লিখেছেন **মঞ্জুভাষ মিত্র**

কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসে অসম্ভবকে সম্ভবের সীমানায় নিয়ে আসাই লেখকের প্রধান কাজ। কথাটা বলেছেন স্বয়ং এইচ জি ওয়েল্‌স। এভাবেই তিনি পাঠকের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন, তৈরি করে নেন এমন একটা মায়াজগৎ, যা আজ বহু বছর পরেও রীতিমত

'দ্য টাইম মেশিন' বইটির প্রচ্ছদ

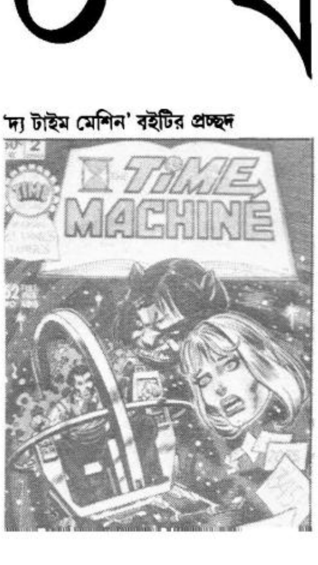

বিশ্বাসযোগ্য। ওয়েল্‌স আরও বলেছেন, মেরি শেলি যখন 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' লিখলেন তখন যন্ত্রদানবের ভেতর কী করে আত্মা জীবন্ত হয়ে উঠল তার কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নেই। এখানে জাদুক্রিয়া বা অতিপ্রাকৃতকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তিনি নিজে 'ফ্যান্টাসি' বা

ওয়েল্‌স তাঁর কল্পনা দিয়ে ৭০ বছর আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন সেটুকু বাদ দিয়ে ১৯৬৯ সালে চাঁদে প্রথম মানুষ ('দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন') যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে হয়তো দাঁড়াতেই পারত না।

কল্পজগৎ তৈরি করতে গিয়ে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন কোনও অলৌকিক নয়, বরং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অথবা সূত্রাবলীরই কাছাকাছি থাকতে।

কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের জগতে ওয়েল্‌স এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, তাঁর 'ওঅর অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই এ-কথা মানবেন। জুলে ভের্ন এসেছেন ওয়েল্‌সের আগেই। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী 'টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগ্‌স আন্ডার দ্য সি' ও অন্যান্য লেখায় মনোরঞ্জনের উপাদান ও 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর প্রবণতা কিছু বেশি। অন্যদিকে ওয়েল্‌সের লেখাগুলির শিকড় কিন্তু ছড়িয়ে আছে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভেতরেই। এইজন্য কেউ যদি ওয়েল্‌সকে আধুনিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের জনক বলেন, তা হলে বোধ হয় কথাটা মিথ্যা হবে না।

ওয়েল্‌সের বয়স তখন সবে ৩০। তখনকার উদীয়মান লেখকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, প্রায় ১০০ বছর আগে। তখন তিনি লিখেছিলেন 'দ্য ইনভিজিব্‌ল ম্যান'।

ওয়েল্‌সকে বলা যায় আধুনিক কালের রূপকথার লেখক। তবে তাঁর লেখায় অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের জায়গা

'ফেমাস ফ্যান্টাস্টিক মিস্ট্রিজ' সিরিজের 'দ্য আইল্যান্ড অব ডঃ মোরো'-র প্রচ্ছদ

নিয়েছে বিজ্ঞান। সমকালীন এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোসেফ কনরাড একটি চিঠিতে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন ওয়েল্‌সের। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের এই মানবিকতাকে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভবের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পরও কী করে তার দুঃখবেদনা ও আর সবকিছু পুরোপুরি মানবিক করে রাখা যায়, তা জানতে হলে অবশ্যই ওয়েল্‌সের কাছে যেতে হবে।" এই যে ওয়েল্‌স ধূমকেতুর মতো সাহিত্যের আকাশে উদিত হলেন, তাঁর প্রতি সেকালে ও একালে অজস্র প্রশংসাবাণী বর্ষিত হয়েছে। বার্নাড বার্গঞ্জি 'এইচ. জি. ওয়েল্‌স : এ কালেকশন অব ক্রিটিক্যাল এসেজ' বইটিতে ভারী সুন্দর করে আসল কথাটা বলেছেন, "তাঁর গোড়ার দিকের বিজ্ঞানভিত্তিক 'রোমান্স'গুলি মানুষের কল্পনাকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে এবং পরবর্তীকালে প্রযুক্তির বিকাশকেও সম্ভবত কিছু প্রভাবিত করেছে। আসলে ওয়েল্‌স বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন সুদূর অথচ চিত্তাকর্ষক কিছু সম্ভাবনার দিকে তাঁদের চোখ খুলে দিয়ে। ওয়েল্‌স তাঁর কল্পনা দিয়ে ৭০ বছর আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন, সেটুকুকে বাদ দিয়ে ১৯৬৯ সালে চাঁদে প্রথম মানুষ ('দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন') যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে হয়তো দাঁড়াতেই পারত না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তথ্যাবলীর সুষ্ঠু ব্যবহার করে এই যে ওয়েল্‌স আধুনিককালে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং যার অনেকটাই মিলে গেছে, স্বভাবতই তিনি মানুষটি কেমন ছিলেন, কোথায় তাঁর জন্ম কেমন তাঁর পড়াশোনা, এসব জানতে ইচ্ছে করে। হার্বার্ট জর্জ ওয়েল্‌সের জন্ম ইংল্যান্ডের কেন্টের ব্রমলে নামক জায়গায়। নিম্নমধ্যবিত্ত ইংরেজ পিতামাতার সন্তান তিনি। ছেলেবেলা থেকেই ওয়েল্‌স ছিলেন এক স্বপ্ন-দেখা মানুষ। স্কুলে ছাত্র হিসেবে তিনি অবশ্য তেমন কিছু একটা করতে পারেননি, বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবেও তিনি ছিলেন অতি সাধারণ। কল্পনায় ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে দক্ষ এক সাংবাদিক হিসেবে বিজ্ঞান ও বিশ্বভুবনের অত্যাশ্চর্য পরিমণ্ডলে বিচরণ যাঁর নেশা, এমনই এক ঔপন্যাসিক হিসেবে ভিক্টোরিয়ান যুগপ্রান্তের ইংরেজ লেখকটি পরে হয়েছিলেন জগৎজোড়া খ্যাতির অধিকারী। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর যে খোলা মন ছিল, আত্মজীবনীতে ওয়েল্‌স নিজেই সে কথা বলেছেন। এক পরিবর্তনশীল সময়ে জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় থেকে উপাদান নিয়ে নিজের লেখায় সাফল্যের সঙ্গেই ব্যবহার করেছিলেন তিনি। মাত্র ৩২ বছর বয়সের মধ্যেই ওয়েল্‌স বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লিখে প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন এবং প্যারিস থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সবাই তাঁর নাম জেনে গিয়েছিল।

পরবর্তী যেসব বিখ্যাত লেখক ওয়েল্‌সের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদেরই একজন হচ্ছেন আর্জেন্টিনার লেখক লেখক জর্জ লুই বোর্হেস। ওয়েল্‌স সম্বন্ধে বহু কথায় যা বলা যেত দু'-একটি কথাতেই তা তিনি বলেছেন। ওয়েল্‌সের গল্প বলার দক্ষতার সঙ্গে তিনি জোনাথন সুইফ্‌ট এবং

এডগার অ্যালান পো-র দক্ষতার তুলনা করেছেন। অস্কার ওয়াইল্ড যে ওয়েল্‌সকে জুলে ভের্নের এক বৈজ্ঞানিক সংস্করণ বলেছেন,তা তাঁর খুব ভাল লাগেনি। দু'জনের পার্থক্যও তিনি দু'এক কথায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ভের্ন মূলত ছোটদের জন্য লিখেছিলেন। কিন্তু ওয়েল্‌স লিখেছেন ছোটবড় সবার জন্য। অন্যদিকে, লিখেছেন সম্ভাব্য কিছু ঘটনা নিয়ে। যেমন একটা 'সাবমেরিন', তখন যেমন ছিল তার চেয়েও বড় একটা জাহাজ,দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার, সবাক চলচ্চিত্র,বেলুনে আফ্রিকা অতিক্রম, নিভে-যাওয়া একটা অগ্নেয়গিরির 'ক্রেটার' বা গহ্বর যার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছনো যায় ইত্যাদি। এসবেরই প্রাথমিক সূচনা তখনকার দিনে হয়ে গিয়েছিল অথবা হতে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, ওয়েল্‌সের বিষয়গুলি ছিল একেবারে নতুন,মানুষের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়েই তিনি লিখেছেন। এই মুহূর্তে অসম্ভব কিন্তু ভবিষ্যতে তা সম্ভব হতে পারে এমন কিছু স্বপ্ন মানুষকে তিনি দেখিয়েছেন। এক অদৃশ্য মানুষ, একটা ফুল যা মানুষকে খেয়ে ফেলে,একটা স্বচ্ছ ডিম্বাকৃতি বস্তু,যাতে প্রতিফলিত হয় মঙ্গলের ঘটনাবলী, একটা মানুষ,যে ভবিষ্যতের দিনগুলিতে ভ্রমণ করে ফিরে এল সেই সময়ের একটা ফুল হাতে নিয়ে,আর একটা মানুষ জীবনান্তর থেকে ফিরে এল। কিন্তু সে একেবারে বদলে গেছে, তার হৃৎপিণ্ড চলে গেছে ডান দিকে—এমনই সব ঘটনা আছে ওয়েল্‌সের লেখায়। সেরা লেখকদের মতোই ওয়েল্‌স তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে সমস্যাটা যতটা দেখান সমাধানের পথটা ততটা দেখান না। আবার তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে মানুষেরই গোপন সত্তা। তাই 'আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো'তে ঔপন্যাসিক ওয়েল্‌স যেন বলতে চান মানুষ একদা বিবর্তনের পথে অরণ্যপশু থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, তার মধ্যে জান্তব প্রবৃত্তিগুলি আজও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, যে-কোনও সময় সেগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। দ্য ইনভিজিব্‌ল ম্যান যেন আমাদের সত্তার গোপন ভয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিবিম্বিত করেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন থেকে যাবে ওয়েল্‌সের এইসব লেখার আবেদন।

ছাত্রজীবনেই ওয়েল্‌স যেসব লেখালেখি করেছিলেন তাতে তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবন কোন দিকে যাবে তার পূর্বাভাষ পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৮৮-তে 'এ টেল অব দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' লেখাটিতে কৌতুকের ছলে বর্ণনা করেছেন আগামী শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা দেখা যাবে, তার কথা।এরকম আর একটা লেখা'দ্য ম্যান অব দ্য ইয়ার মিলিয়ন'। এককথায় বলা যায়, 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন' এবং 'দ্য ওঅর অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'-এর সূচনা এখান থেকেই। জনপ্রিয় 'পাঞ্চ' পত্রিকায় ওয়ল্‌সের এই লেখাটিকে ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যমে খোঁচা দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীর চেহারা কেমন হতে পারে, সে সম্বন্ধে কল্পকাহিনীর লেখক নিজে একটা স্কেচ বা রেখাচিত্রও এঁকেছিলেন। নিবন্ধ লিখে ক্লান্ত হয়ে নবীন বয়সেই তিনি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন।

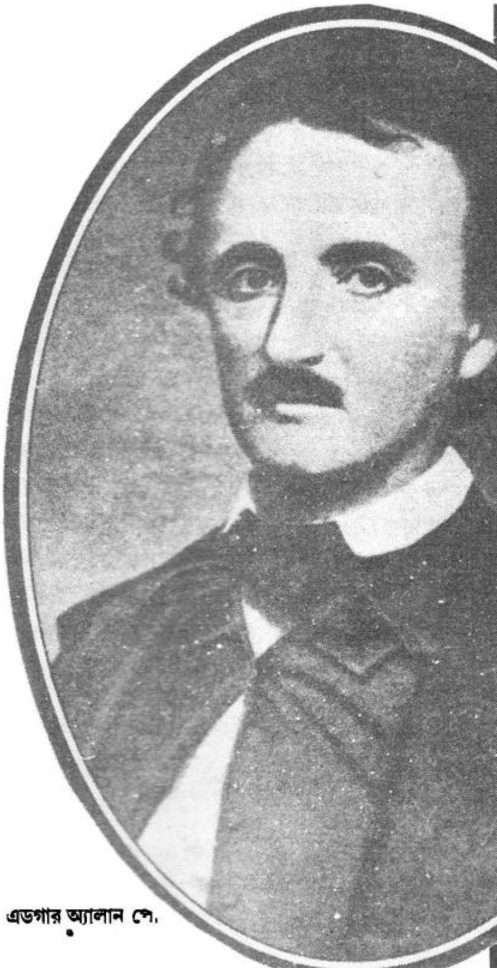

এডগার অ্যালান পো.

ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশ পরিক্রমা করে ফিরে আসার পর

The Evening News

World's largest evening sale

LATE EXTRA

Back On Earth .. Major Yuri Gagarin Says: I Feel Well—No Injuries

MAN IN SPACE

Russian Round World In
9 Minutes, Then Down!

ছাত্রাবস্থায় 'দ্য ক্রনিক আরগনটস' বলে যে কাহিনী শুরু করেছিলেন, তার ভিত্তিতেই লিখলেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'দ্য টাইম মেশিন'। উপন্যাসটি খুব দ্রুতগতিতে লেখা। তখন তিনি থাকতেন ক্যাথেরিন এমি রবিন্‌স-এর সঙ্গে যিনি পরে হন তাঁর দ্বিতীয় পত্নী জেন।

সেভেনোয়াক্‌স-এর. পল্লীভবনে লেখা 'দ্যা টাইম মেশিন' উপন্যাসের পরে পরেই ওয়েল্‌স আরও কয়েকটি

গল্প লিখে ফেললেন, যা তাঁকে রাতারাতি খ্যাতি এনে দিল। 'দ্য স্টোলেন ব্যাসিলাস অ্যান্ড আদার স্টোরিজ', 'দ্য আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো', 'দ্য ইনভিজিব্‌ল ম্যান' ইত্যাদি। ১৮৯৫-'৯৭-এর ছোট্ট সময়বৃত্তেই লেখা হয়েছিল। এই লেখাগুলি এখনও ছাপা হয়, বিশ্বজোড়া এদের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ, সিনেমা এবং টেলিভিশনে এদের বারবার দেখানো হয়ে থাকে। এরা ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান সাহিত্য-উপন্যাসের অথবা কল্পবিজ্ঞানকাহিনীর ছকটাই বেঁধে দিল। জুলে ভের্ন, পো এবং কিছুটা কোনান ডয়েল এ পথেই জনপ্রিয় হয়েছেন—কিন্তু ওয়েল্‌স যেন চলে এলেন প্রথম স্থানে। ওয়েল্‌স একাই কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসকে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুললেন এবং পরে বহু লেখক এই পথে এলেও এখনও তিনি শ্রেষ্ঠ।

চেয়ারিং ক্রশ-এর কর্মব্যস্ত, কোলাহল মুখর পরিবেশ থেকে কিছু দূরে, ২৩ ইয়ার্ডলে রোড-এ সেভেনোয়াকসের

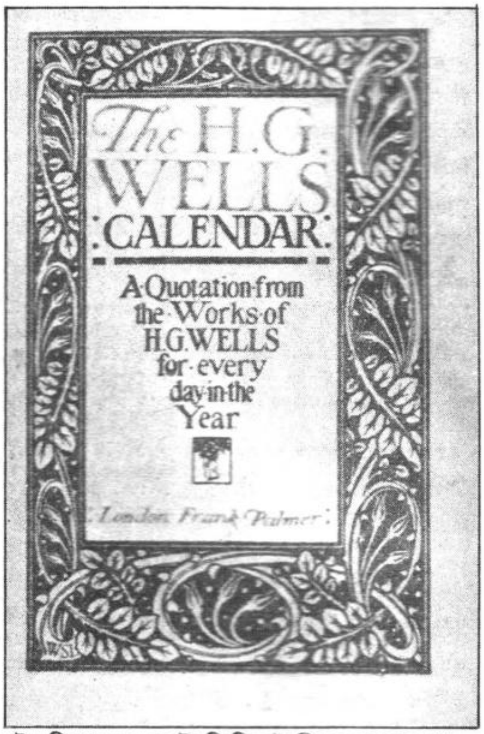

এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর উদ্ধৃতি নিয়ে তৈরি হয়েছে ক্যালেন্ডার

পল্লীভবনে ২৮ বছরের ওয়েল্‌স ছুটি কাটাতে এসে মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে লিখে ফেললেন ৩৫ হাজার শব্দের যুগান্তকারী বিজ্ঞানকাহিনী 'দ্য টাইম মেশিন'। নামকরা সম্পাদক ডব্লিউ.ই. হেন্‌লি-র 'দ্য ন্যাশনাল অবজার্ভার' পত্রিকার জন্য কাহিনীটি লেখা হয়েছিল। অখ্যাত তরুণ লেখককে তিনি বেশ ভাল সম্মান দক্ষিণাই দিয়েছিলেন। দ্য টাইম মেশিনের রচনাকাল ১৮৯৫। এ-বছর এ বইটির শতবার্ষিকী।

দ্য টাইম মেশিনের গল্পটা সংক্ষেপে জানাই। 'টাইমট্র্যাভেলার' বা সময়পথিক একটা অবাককরা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল, এই যন্ত্রটা তাকে নিয়ে গিয়েছিল মহাভবিষ্যতে। লেখক বলছেন, সঠিক বছরটা হচ্ছে ৮০২৭০১ সাল। সত্যিই ব্যাপারটা অকল্পনীয়। একজাতের মানুষ 'এলয়ি' (Eloi) শান্তশিষ্ট নিরীহ ধাঁচের। এরা আসলে যেন আমাদেরই ভবিষ্যৎ বংশধর, তারা কাজকর্ম করে না এবং আমোদপ্রমোদ বিলাসব্যসনেই সময় কাটাতে ভালবাসে। কিন্তু এর ফলটাও বড় একটা ভাল হয়নি। মরলক্স (Morlocks) বলে একটা বীভৎস ও হিংস্রজাতি ছিল, যারা থাকত মাটির তলায় এবং প্রায়ই তারা এলয়িদের ধরে নিয়ে যেত খিদে মেটানোর জন্য। এলয়িরা ছিল চিনা মাটির পুতুলের মতো সুশ্রী ফিটফাট, আর যারা শিকারি সেই মরলকরা ছিল তাদের ফ্যাকাশে, থুতনিবর্জিত আর ঢাকনাবিহীন ধূসর লালচে চোখ নিয়ে। বীভৎস তাদের চেহারা কিন্তু আলোয় তারা অন্ধ ও অসহায়; তাদের অন্ধকার চিররাত্রির জগতে সময়পথিক যখন দেশলাই জ্বালাল তখনই সে বুঝতে

সার হামফ্রে ডেভির কাহিনী

ছাত্রজীবনে ওয়েল্‌সের পাঠ্য ছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার হামফ্রে ডেভির রচনা। এই বিখ্যাত রসায়নবিদের (১৭৭৮—১৮২৯) রচনাবলী খুঁজতে-খুঁজতে তিনি পেয়ে যান 'কনসোলেসনস অব ট্রাভেল' নামে একটি বই। বৈজ্ঞানিক-লেখক এই অপূর্ব কাহিনীতে বলেছেন, আকাশভ্রমণের এক আশ্চর্য কাহিনী। তরুণ ওয়েল্‌স রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ের সঙ্গে পড়ে ফেললেন এক অচেনা, অজানা পথিকের মহাকাশে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ, পথিকটির পথপ্রদর্শক সঙ্গী এক অভিজ্ঞ প্রাণময় অস্তিত্ব, যাকে অভিহিত করা হয়েছে 'জিনিয়াস' এই নামে। এখানে পাই এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারকের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনার কথা। ফ্যান্টাসির মোড়কে গল্পটি পরিবেশিত হলেও তার বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিটি স্বভাবতই নিখুঁত। বইটি পড়ে ওয়েল্‌স অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছিলেন। এইভাবে নানা সূত্র থেকে রসদ সংগ্রহ করে গড়ে উঠেছিল তাঁর কল্পবিজ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রেরণা এভাবেই এসে গেল। ডেভি-র রচনায় গল্পকথক বিবৃত করছে কীভাবে লঘু ভারহীন অবস্থায় সে আকাশে উত্থিত হল এবং বৃহস্পতি, শনি, শুক্র ইত্যাদি গ্রহ ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল। মহাকাশে মহাবিশ্বে সে বহু বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান পেল।

ব্যারন মাঞ্চুসেনের চন্দ্রভ্রমণ

গ্রহান্তরযাত্রা নিয়ে যে কল্পকাহিনীটি ওয়েল্‌স ছেলেবেলায় পড়েছিলেন তা হচ্ছে, ১৭৮৬ সালে প্রকাশিত 'দ্য ট্রাভেল্‌স অ্যান্ড সারপ্রাইজিং অ্যাডভেঞ্চারস অব ব্যারন মাঞ্চুসেন'। বইটিতে লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু মনে হয় তাঁর নাম আর ই র‍্যাস্প। যাই হোক, বালক ওয়েল্‌সের হাতে আসে এই বইটিরই পরের একটি সংস্করণ। যেটিতে ছবি এঁকেছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জর্জ ক্রুইকস্যাঙ্ক। মাঞ্চুসেনের 'চন্দ্রভ্রমণ' অংশটি পড়ে তিনি এমন মুগ্ধ হন যে, সতেরো বছর বয়সে নিজে এর অনুকরণে মানুষের চন্দ্রভ্রমণ নিয়ে বেশ বড়সড় একটি গল্প লিখে ফেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গল্পটি হারিয়ে যায়। কিন্তু এভাবেই ওয়েল্‌স বিজ্ঞান-রোমান্স লেখার দিকে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। পরে তিনি একের পর এক লেখেন, 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন', আষাঢ়ে গল্প নয়, বিজ্ঞানসম্মত কাহিনী। অবশ্য মাঞ্চুসেনের গল্পটা ছিল ভারী মজাদার। তিনি নিজেই নিজের চন্দ্রভ্রমণের কথা বলেছেন সুন্দরভাবে। ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চাঁদে এসে তাঁরা নীচের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীকে দেখতে পেলেন। চাঁদের বাসিন্দারা শকুনের মতো দেখতে বিশাল আকারের পাখির পিঠে চড়ে বেড়ায়। তাদের এক-একটা ভাগই যে-কোনও জাহাজের আয়তনকে ছাড়িয়ে যায়। এই গ্রহের মাছিগুলি পর্যন্ত ভেড়ার চেয়ে বড়। চাঁদের অধিবাসীরা লম্বায় ছত্রিশ ফুটের কম নয়। তারা তাদের মুণ্ডু ডান হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এমনকী ভ্রমণকালে তারা সেই মাথা বাড়িতে রেখে আসতে পারে!

পারল তাদের দুর্বলতা। সময়পথিক ভবিষ্যৎ যে পৃথিবীতে গিয়ে পড়েছিল সেখানে এরাই ছিল প্রভু; বান্ধবী উইনার কাছ থেকে গল্পকথক শুনেছিল, অমাবস্যার রাতগুলিই ছিল এলয়িদের কাছে দারুণ বিপজ্জনক।

এই কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীতে এইচ.জি. ওয়েল্‌স বাহুল্যবর্জিত গদ্য ব্যবহার করেছেন, দু'-এক কথায় সাধারণকে করে তুলেছেন অসাধারণ। উদাহরণ দিই। টাইম ট্র্যাভেলার যখন ভবিষ্যতে এসে উপস্থিত হল, সেই সময় সুন্দর পুতুলের মতো দেখতে এলয়িরা তাদের 'ব্লন্ড' চুল আর নিখুঁত চেহারা নিয়ে আশ্চর্য টাইম মেশিন ঘিরে ভিড় করল শিশুদের মতো। যন্ত্রপাতির দিকে তারা আগ্রহী হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যন্ত্রটা নাড়াচাড়া করলে বিপদ হতে পারে এটা বুঝতে পেরে, যে লিভারগুলির সাহায্যে যন্ত্র চলে সময়পথিক তাড়াতাড়ি 'স্ক্রু ড্রাইভার' দিয়ে সেগুলি খুলে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিল। এখানে পাঠকের মনে ভয়ের শিহরন খেলে যায়। সুদূর ভবিষ্যতে এসে সময়পথিক কী অনিশ্চিত বিপদে পড়েছে, সঙ্গের যন্ত্রটা হারিয়ে গেলে সে চিরদিনের জন্য পথহারা হয়ে যাবে, বর্তমান পৃথিবীতে তার নিজের জীবনে আর ফিরতে পারবে না—এইসব কথা ভাবনায় এসে যায়।

মরলকরা টাইম মেশিন চুরি করে মাটির তলায় তাদের ডেরায় নিয়ে গিয়েছিল। সময়পথিক মাটির নীচে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে বহু কষ্টে সেটা উদ্ধার করে। এই মরলকরা আগেই বলেছি, আমরা যেমন মাংস খাই, তেমনই এলয়িদের তারা খাদ্য বা মাংস হিসেবে ব্যবহার করত। সুন্দর নিরীহ মেয়ে উইনার প্রতি নায়কের মমতা এই উপন্যাসে উজ্জ্বল করেছে ওয়েল্‌সের মানবতাবোধকে। কাহিনীর শেষে সময়পথিক উনিশ শতকে তার নিজস্ব স্থান-কালে ফিরে এসেছিল। অবিশ্বাসী বন্ধু ও পরিচিতদের কাছে বলেছিল নিজের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা। আগুন তার সহায় হয়েছিল, আগুন দিয়েই সে মরলকদের পুড়িয়ে ফেলতে পেরেছিল। কিন্তু এটা করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছিল এলয়ি মেয়ে উইনাকে। সে যখন পৃথিবীতে আবার ফিরে এল তখন হতবাক বন্ধুরা ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দেখে, বিধ্বস্ত প্রায় ছায়ার মতো স্বচ্ছ ফ্যাকাশে মানুষটা বসে আছে তালগোল পাকানো একটা ধাতুপিণ্ডের মাঝখানে। ওয়েল্‌স এই যে লম্বা লম্বা বছর এগিয়ে ভবিষ্যতের বুকে মানুষের বেড়িয়ে আসার ছবিটা আঁকলেন তাতে পৃথিবীর শেষ পরিণতিটা ভয়াবহ, মৃত পৃথিবীর বুকে বেঁচেছিল শুধু একটা দানব কাঁকড়া। তবু পাঠকের রোমান্টিক চেতনাকে পরিতৃপ্ত করেছিল। কারণ নায়ক আবার ফিরে গিয়েছিল বিপদের ঝোড়ো কেন্দ্রে, মায়ামমতার উইনাকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি।

রবার্ট ডব্লিউ পল নামে লণ্ডনের এক যন্ত্রবিজ্ঞানী

চাঁদের মাটিতে প্রথম মানুষ

ওয়েল্‌স-এর 'থিংস টু কাম' বইটিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র

কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের জগতে ওয়েল্‌স এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'ওঅর অব দ্য ওয়ার্ল্ড্‌স' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই এ-কথা মানবেন। জুলে ভের্ন এসেছেন ওয়েল্‌সের আগেই। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনী 'টুয়েন্টি থাউজেন্ড লিগ্‌স আন্ডার দ্য সি' ও অন্যান্য লেখায় মনোরঞ্জনের উপাদান ও 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর প্রবণতা কিছু বেশি।

ওয়েল্‌সের লেখাগুলির শিকড় কিন্তু ছড়িয়ে আছে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভেতরেই। এইজন্য কেউ যদি ওয়েল্‌সকে আধুনিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের জনক বলেন, তা হলে বোধ হয় কথাটা মিথ্যে হবে না।

'দ্য ওঅর অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' চলচ্চিত্রের পোস্টার

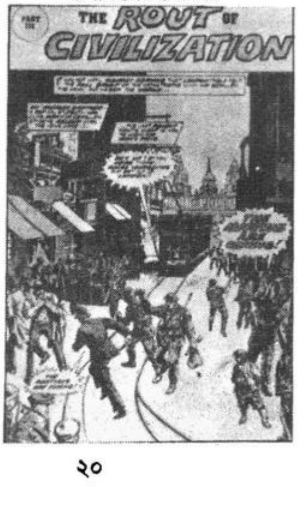

কল্পবিজ্ঞানের আর এক প্রবাদপুরুষ জুলে ভের্ন

ওয়েল্‌সের সদ্যলেখা বইটিকে কেন্দ্র করে চমৎকার এক বিনোদনের কল তৈরি করেছিলেন। দর্শকরা তাদের আসনেই বসে থাকবে, কিন্তু স্থান ও কালের ভেতর দিয়ে যাত্রার অদ্ভুত আনন্দ তারা অনুভব করবে। সদ্যোজাত সিনেমাশিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন রবার্ট। ইতিপূর্বেই এডিসন তাঁর বিখ্যাত যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন। ১৮৯৫ সালে পল সাফল্যের সঙ্গেপ্রথম পরদায় ছবি প্রতিক্ষেপন করে দেখালেন। লেখকের অনুমতি নিয়ে যন্ত্রবিজ্ঞানী তাঁর প্রোজেক্টরের সাহায্যে দর্শকদের খুব সাফল্যের সঙ্গে টাইম মেশিনের রোমহর্ষক পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। টাইম মেশিনকে কেন্দ্র করেই প্রথম 'কাট ব্যাক' (Cut back), 'ক্লোজ আপ' (Close up), 'ফেড ইন' (fade in), 'ফেড আউট' (fade out), ইত্যাদি 'ফিল্ম টেকনিক' প্রয়োগ করা হয়েছিল।

সম্পাদক ও সাংবাদিক ডব্লিউ টি স্টিড-এর কথা বলি। ওয়েল্‌সের প্রতিভাকে তিনি যথার্থই চিনতে পেরেছিলেন। 'নিউ রিভিউ' পত্রিকায় উপন্যাসটি'র প্রথম প্রশংসা ইনিই করেন।

ওয়েল্‌সের আর একটি বিখ্যাত বই দ্য আইল্যান্ড অব ডঃ মোরো প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। এই

বইটিও জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু পত্রপত্রিকায় এর যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা হয়। 'স্যাটারডে রিভিউ' পত্রিকা তৎকালীন বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী সার পিটার মিচেলকে দিয়ে এই বইয়ের একটি আলোচনা করায়, যা অবশ্যই প্রতিকূল। সার মিচেলের মতে যারা টাইম মেশিন পড়ে মুগ্ধ হয়েছে তারা দ্য আইল্যান্ড অব ডঃ মোরো পড়ে অবশ্যই হতাশ হবে। জীবন্ত জন্তু জানোয়ারের ওপর 'প্লাস্টিক সার্জারি' করে তাদের কিছুটা মানবিক অবয়ব দেওয়ার কথা আছে এই উপন্যাসে। নানা প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্ক, রক্ত ইত্যাদির মিলন-মিশ্রণ, গ্রাফটিং এ-সবই বেশ চমৎকারভাবে পরিকল্পিত। কিন্তু শেষপর্যন্ত একটা রক্তাক্ত আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এমনকী অস্ত্রোপচারে তৈরি ওই অদ্ভুত প্রাণীদের দ্বীপে গিয়ে নায়ক প্রথমে ভেবেছিল, এরা আসলে মানুষই ছিল, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কোনও উন্মাদ গবেষক এদের পঙ্গু ও বিকৃত করে দিয়েছে। রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ, ছুরির নীচে যন্ত্রণাকাতর জন্তুর চিৎকার, ডাঃ মোরোর নিষ্ঠুর উদাসীনতা সবকিছুই মনকে বিষিয়ে দেয়। এমনকী, ডাঃ মোরোর মৃত্যুটাও বড় ভয়ঙ্করভাবে হয়েছিল তাঁরই সদ্য তৈরি এক বীভৎস, শক্তিশালী জন্তুমানবের আক্রমণে। একটা পুমা বা পার্বত্যসিংহকে ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে তিনি ওইভাবে তৈরি করে নিয়েছিলেন, এ-সবই ছিল সার মিচেলের বক্তব্য। কিন্তু এত নিন্দা করার পরও এই জীববিজ্ঞানী আসল কথাটা অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, প্লটের ব্যাপারটা শল্যচিকিৎসাবিজ্ঞানে অসম্ভব নয় বলেই গৃহীত হতে পারে।

'পোলক অ্যান্ড দ্য পোরো ম্যান' বইয়ের প্রচ্ছদ

'স্যাটারডে রিভিউ'-এর সম্পাদকের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে ওয়েল্‌স অবশ্য একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন সমকালীন বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে সংকর সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে। মিচেল বলেছিলেন, এটা সম্ভব নয়। একজন মানুষের রক্ত আর-একজন মানুষের রক্তে মেশানো সম্ভব, কিন্তু কোনও জন্তুর রক্ত অন্য জন্তুর রক্তে কখনও নয়। যাই হোক, 'সায়েন্স ফিকশন' হিসেবে দ্য আইল্যান্ড অব ডঃ মোরো কিন্তু কালজয়ী হয়েছে। ১৯৭৭ সালে 'আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল' নামে ফিল্ম কোম্পানি একে চলচ্চিত্রায়িত করে, প্রধান ভূমিকায় ছিলেন বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার এবং মাইকেল ইয়র্ক। ফিল্মের বিজ্ঞাপন 'দ্য টাইম্‌স'-এর বিশ্ববিখ্যাত'অ্যাগোনি কলাম' বা 'পারসোনাল কলাম'-এ ভারী অদ্ভুত ভাষায়, প্রায় হেঁয়ালির মতো, নিয়মিত প্রকাশিত হত। দু-একটা নমুনা দিই, 'হার্ট অব বেবুন, আই অব নি'উট অ্যান্ড আদার স্পেয়ার পার্ট্‌স রিকোয়ার্ড বাই ডাঃ মোরো' ; অথবা 'ডঃ মোরো হ্যাড মেড এ মাঙ্কি আউট অব মি।সি হোয়াট হি ক্যান ডু ফর ইউ'। জেম্‌স এ সুলিভান 'দ্য আইল্যান্ড অব প্রোফেসর মেনু' নামে বইটার একটা মজাদার প্যারডি বের করলেন।

নবীন লেখক ওয়েল্‌স ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিখলেন, তাঁর আর একটি বিপুল জনপ্রিয় উপন্যাস, 'দ্য ইনভিজিব্‌ল ম্যান'। লেখক গল্পের 'আইডিয়া' পেয়েছিলেন একটি সাময়িক পত্রিকায় ; 'ব্যাব' ছদ্মনামে লেখা ডব্লিউ এস গিলবার্টের একটি হাসির কবিতা থেকে। কবিতাটির নাম 'দ্য পেরিলস অব ইনভিজিবিলিটি'। এটা বৃদ্ধ পিটারের গল্প, সে ছিল খুব মোটা আর তার স্ত্রী ছিল ভীষণ ঝগড়ুটে। পিটার তিনটে ইচ্ছাপূরণের বর পেয়েছিল।

তাঁর গোড়ার দিকের বিজ্ঞানভিত্তিক 'রোমান্স'গুলি মানুষের কল্পনাকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে এবং পরবর্তীকালে প্রযুক্তির বিকাশকেও সম্ভবত কিছু প্রভাবিত করেছে। আসলে ওয়েল্‌স বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন সুদূর অথচ চিত্তাকর্ষক কিছু সম্ভাবনার দিকে তাঁদের চোখ খুলে দিয়ে।

চেয়ারিং ক্রশ-এর কর্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর পরিবেশ থেকে কিছু দূরে, ২৩ ইয়ার্ড্‌লে রোড-এ সেভেনোয়াকসের পল্লীভবনে ২৮ বছরের ওয়েল্‌স ছুটি কাটাতে এসে মাত্র দু' সপ্তাহের মধ্যে লিখে ফেললেন ৩৫ হাজার শব্দের যুগান্তকারী বিজ্ঞানকাহিনী 'দ্য টাইম মেশিন'।

'দ্য ওঅর অব দ্য ওয়ার্ল্ড্‌স' কি অনুপ্রাণিত করেছিল ব্রাম স্টোকার-এর 'ড্রাকুলা'কে

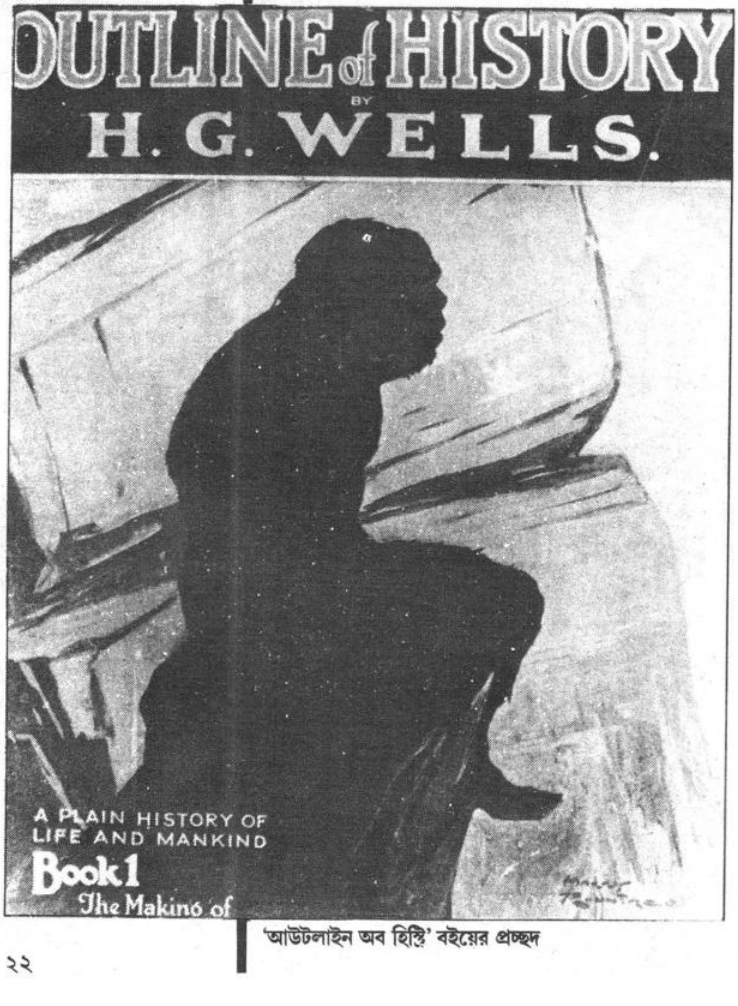

'আউটলাইন অব হিস্ট্রি' বইয়ের প্রচ্ছদ

ধনদৌলত ইত্যাদি চাওয়ার পর সে অদৃশ্য হতে চাইল, কারণ স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচার আর কোনও উপায় ছিল না। শীত এড়াতে অদৃশ্য পিটারকে গরম জামাকাপড় পরতে হয়েছিল, কিন্তু গ্রামের পথেপ্রান্তরে মানুষবিহীন, ঢোলা পোশাককে হাঁটাচলা করতে দেখে গ্রামের সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ ভয়ে চিৎকার করে উঠত, এমনকী অজ্ঞানও হয়ে যেত।

ওয়েল্‌সের 'অদৃশ্য মানুষ' কিন্তু তুলনায় অনেকটাই বাস্তব। সে আসলে এক বৈজ্ঞানিক, তার অদৃশ্য হওয়াও একটি সফল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চূড়ান্ত পরিণতি। স্বভাবে সে ভাঁড় বা কৌতুকপ্রবণ নয়, বরং উলটোটাই ; এক খামখেয়ালি, খিটখিটে, রাগী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। এককথায় গ্রিফিনকে আমরা এক ট্র্যাজিক চরিত্রই বলতে পারি। সে স্বপ্ন দেখেছিল, অসীম ক্ষমতার অধিকারী হবে, কিন্তু সে স্বপ্ন নানা কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। সে চেয়েছিল নির্জন গ্রামাঞ্চলে লুকিয়ে দিন কাটাবে ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। কিন্তু গ্রামবাসীর কৌতূহলের ফলে তার পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হল না। শেষপর্যন্ত অবস্থার চাপে গ্রিফিন হয়ে উঠল এক অমানুষিক মানুষ। চুরি, খুন সবকিছুই তাকে করতে হল, সকলেই হয়ে গেল তার শত্রু। এক সহপাঠী চিকিৎসকের বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়েছিল, তাকে শুনিয়েছিল তার জীবনের অদ্ভুত আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতার গল্প, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করল সেই বন্ধুটি। কর্তৃপক্ষকে সে খবর পাঠাল। অদৃশ্য মানুষ এবার তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। শেষ দৃশ্যটি রীতিমত

শ্বাসরুদ্ধকর। অদৃশ্য মানুষ ডাক্তার বন্ধুটিকে খুন করার জন্য তাঁর বাড়িতে হানা দিলেও তার উদ্দেশ্য সফল হল না। জনতার হিংস্র আক্রমণে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অকালমৃত্যু ঘটল।

এইচ জি ওয়েলসের যে বইটি পাঠকদের কল্পনাকে বিশেষভাবে উসকে দিয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে 'দ্য ওঅর অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' (১৮৯৮)। লেখকের এই বইটি শুধু বিখ্যাতই নয়, আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পঠিত এবং সমালোচিত। এই অসাধারণ বইটিকে কল্পবিজ্ঞানকাহিনীর পথিকৃৎ বলা যায়। বইটি চলচ্চিত্রায়িতও যেমন হয়েছে, তেমনই জুটেছে এর বহু অনুকারকও। পরবর্তীকালে একটি নিবন্ধে ওয়েল্‌স লিখেছিলেন, একটা ছোট্ট ঘটনা থেকে কীভাবে পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। ভাই ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে সার-এর স্নিগ্ধ, শান্ত পল্লী অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক হঠাৎ বলে উঠল, "ধরো গ্রহান্তরের কিছু প্রাণী হঠাৎ যদি আকাশ থেকে নেমে আসে এবং এখানে তাদের বাসা তৈরি করে ফেলে, তা হলে কী হবে?" ব্যস, এই হল কল্পকাহিনীর শুরু। ওয়েল্‌সের কৃতিত্ব, এই বিজ্ঞান-উপন্যাসে কোথাও তিনি সম্ভাব্যতার সূত্র অতিক্রম করেননি, গল্পটার তাৎপর্য এবং অসাধারণত্ব এখানেই।

ওয়েল্‌সের লেখার দুটি প্রধান গুণ, বৈজ্ঞানিক কল্পনাশক্তি এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণনৈপুণ্য। ওঅর অব দ্য ওয়ার্ল্ড্‌সে এই দুটি গুণের সুন্দর পরিচয় ফুটে উঠেছে। মঙ্গল গ্রহ শীতল হয়ে আসছিল, ফলে মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীরা, যারা পৃথিবীর মানুষের আগে এসেছে এবং বিজ্ঞানে বেশি উন্নত, তারা একটা নতুন বাসস্থান, একটা চমৎকার গ্রহ খুঁজছিল মহাকাশে। যন্ত্রবিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সিলিন্ডারের মতো লম্বা ধরনের মহাকাশযান তৈরি করল তারা। তারপর পৃথিবীতে নেমে পড়ল দ্রুত।

ধীরে-ধীরে মহাকাশযান থেকে বের হচ্ছিল একটা বড় ধূসর অবয়ব। এর সারা শরীর আলোয় ভিজে চামড়ার মতো চকচক করছিল। দুটো বড় কালো-কালো চোখ আমাকে স্থিরভাবে লক্ষ করছে। এই বিচিত্র প্রাণীটির চোখের নীচে মুখ, ঠোঁট নেই। মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে লালা। বর্ণনাটা শুধু জীবন্তই নয়, বীভৎস। মঙ্গলের অধিবাসীদের অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো কয়েকটি প্রত্যঙ্গও ছিল।

গল্পকথক মেবেরি হিল-এর বাসিন্দা এক নীতিদর্শনের ছাত্র। পরের চাঞ্চল্যকর নানা ঘটনার সে ছিল প্রত্যক্ষদর্শী। একের পর এক সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। মঙ্গলের বাসিন্দারা তাদের যুদ্ধযানগুলিকে দ্রুত তৈরি করে ফেলল। দল বেঁধে এগিয়ে চলল লণ্ডনের দিকে। পর্যুদস্ত করে ফেলল সামরিকবাহিনীকে। ভয়ে পালাতে লাগল মানুষ, শেষপর্যন্ত দেখা গেল মঙ্গলের বাসিন্দারা সকলে মারা পড়েছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল পৃথিবীর মানুষ। আসলে মঙ্গলে বিবর্তনের ধরন ছিল পৃথিবীর চেয়ে আলাদা। মঙ্গলের অধিবাসীরা ছিল মুণ্ডুসর্বস্ব। এখানে তাদের চলাফেরা করতে অসুবিধে হত, কারণ এখানে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অনেক বেশি। তবে শরীরের সব অক্ষমতা কাটিয়ে উঠেছিল যন্ত্রের সাহায্যে।

'ফেমাস ফ্যান্টাস্টিক মিস্ট্রিজ' বইয়ের প্রচ্ছদ

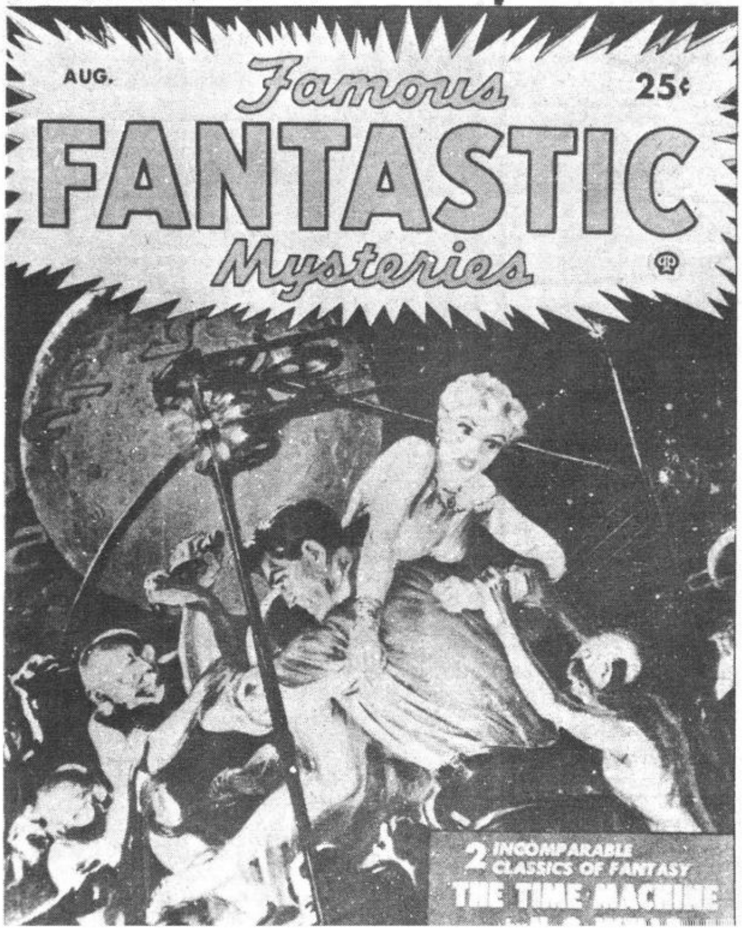

টাইমট্র্যাভেলার যখন ভবিষ্যতে এসে উপস্থিত হল, সেই সময় সুন্দর পুতুলের মতো দেখতে এলয়িরা তাদের 'ব্লন্ড' চুল আর নিখুঁত চেহারা নিয়ে আশ্চর্য টাইম মেশিন ঘিরে ভিড় করল শিশুদের মতো। যন্ত্রপাতির দিকে তারা আগ্রহী হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

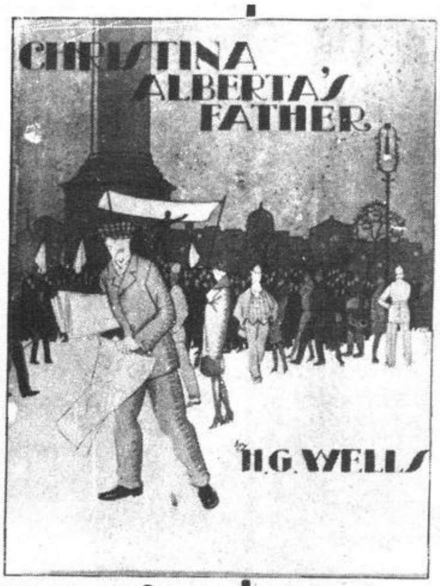

১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ওয়েলস-এর 'ক্রিস্টিনা অ্যালবার্টা'জ ফাদার'

বিশাল যন্ত্রের ভেতর থেকে তারা বেরিয়ে সবকিছু ভেঙেচুরে, ধ্বংস করে এগিয়ে যেত। আগুনের অদ্ভুত রশ্মিঅস্ত্র দিয়ে এরা মুহূর্তে পুড়িয়ে ফেলত সব প্রতিরোধব্যবস্থা। বস্তুত, লেখকের বলবার গুণে গল্পটি হয়ে উঠেছিল বিশ্বাসযোগ্য। সবচেয়ে মজার কথা, পাঠকদের মধ্যে যাঁরা বৈজ্ঞানিক অথবা বিজ্ঞানের ছাত্র, ওয়েল্স তাঁদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ওয়েল্স বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র। বিজ্ঞানের যাবতীয় তথ্য ভালভাবে জেনে-বুঝে লিখতেন বলে সহজেই তিনি নিজেকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী সার পার্সিভাল লোয়েল ১৮৯৪ সালে তাঁর মানমন্দির থেকে মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে যে গবেষণা করেছিলেন, তার সঙ্গে ওঅর অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'র মঙ্গল গ্রহ সংক্রান্ত তথ্যগুলির কোনও মৌলিক বিভেদ ছিল না।

পৃথিবীতে জীবাণুর অতর্কিত আক্রমণে মঙ্গলের অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া খুবই বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। এটা অনেকটা মহামারীর মতো। একালেও মহাকাশ থেকে অভিযাত্রীরা যখন ফিরে আসেন, তখন তাঁদের প্রায় 'কোয়ারেন্টাইন' করে রাখা হয়। এর কারণ তাঁরা যদি মহাকাশ বা চাঁদ থেকে আজানা রোগের জীবা নিয়ে আসেন, তা থেকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যেতে পারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর মানুষ। ওয়েল্সের রচনা যে এত জনপ্রিয়, তার একটা বড় কারণ নির্ভুল তথ্য। পূর্বসুরি জুলে ভের্ন মানুষের গ্রহান্তর যাত্রা নিয়ে যে কল্পকাহিনী লিখেছিলেন, তার জনপ্রিয়তাকে অতিক্রম করেছিলেন ওয়েল্স। ডারউইন-হাক্সলি প্রমুখ খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত নতুন তত্ত্বগুলি ছিল তাঁর লেখার প্রধা উপকরণ।

ওয়েল্সের 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন'ও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ছেলেবেলায় ব্যারন মাঞ্চুসেনের চন্দ্রাভিযানের কাহিনী পড়বার পর থেকে তাঁর ইচ্ছে ছিল, মানুষের চাঁদে যাওয়া নিয়ে একটা গল্পের বই লিখবেন। ১৯০১ সালে লেখা 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন' নামে কল্পকাহিনীটি এত বাস্তবসম্মত যে, বিজ্ঞানীদেরও প্রশংসা পায়। ১৯০২ সালের ৯ জানুয়ারি বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় ওয়েল্সের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় নির্ভুল তথ্য ব্যবহারের জন্য। একজন প্রতিভাবান লেখক কল্পনাশক্তির প্রয়োগে কী অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারেন, বইটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'দ্য আউটলাইন অব হিস্ট্রি' বইয়ের প্রচ্ছদ

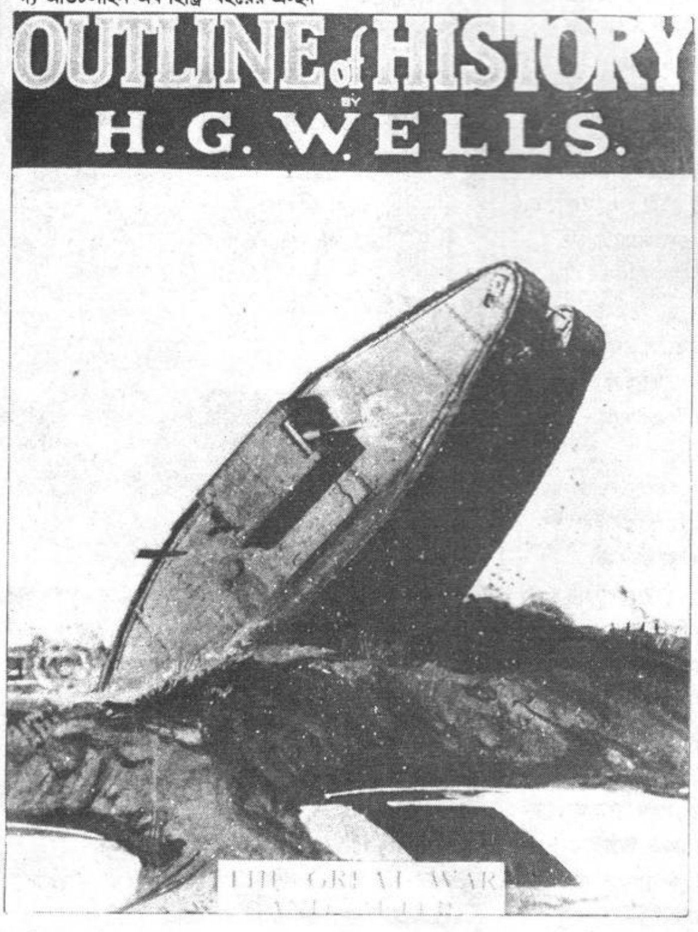

মানুষের চাঁদে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল 'ক্যাভোরাইট' নামে একটি বস্তু আবিষ্কারের ফলে, এ মাধ্যাকর্ষণের টানকে অতিক্রম করতে পারে। এই বিশেষ গুণ ক্যাভোরাইট পেয়েছিল ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে উত্তপ্ত অবস্থায়, এ ছাড়া ব্যবহার করা হয়েছিল 'হিলিয়াম'। আবিষ্কারটা হল হঠাৎই। লেখক এই সূচনাপর্বের চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। একটা কাচের গোলক তৈরি করে তাতে ক্যাভোরাইটের আস্তর বসানো হয়েছিল। জানলার খড়খড়ি খুলে বা আটকে যানটিকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করা যেত। কোনও উদ্দিষ্ট গ্রহ বা তারার দিকে জানলা খুলে দিলে চন্দ্রযান আকর্ষণের টানে সেদিকে ছুটে যাবে, আবার জানলা আটকে দিলেই আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। দু'জন অভিযাত্রী এই আশ্চর্য গোলকে চেপে পাড়ি দিয়েছিল, তারা নেমেছিল জমাট তুষারে, কিন্তু, ওই তুষার আসলে

যন্ত্রটা নাড়াচাড়া করলে বিপদ হতে পারে এটা বুঝতে পেরে যে লিভারগুলির সাহায্যে যন্ত্র চলে সময়পথিক তাড়াতাড়ি 'স্ক্রু-ড্রাইভার' দিয়ে সেগুলি খুলে নিজের পকেটে রেখে দিল। এখানে পাঠকের মনে ভয়ের শিহরন খেলে যায়।

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া বাতাস। সূর্য উঠলে এই বাতাস গলে গিয়ে উড়ে যায়। সময় বুঝে অভিযাত্রীরাও চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করল। এক-এক লাফে তারা চলে যাচ্ছিল ২০ বা ৩০ গজ। তাদের চোখের সামনেই এক ধরনের ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগল। অনুসন্ধানের উত্তেজনায় তারা এক সময় হারিয়ে ফেলল গোলকটাকে। চাঁদের অধিবাসীদেরও দেখা মিলল, তারা বেরিয়ে এল চাঁদের অভ্যন্তর থেকে। কয়েকজন চন্দ্রবাসী বিশাল সব চন্দ্রগোরুদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, এক-একটা জন্তু প্রায় ২০০ ফুট লম্বা। বুদ্ধিমান 'চন্দ্রমানুষ'দের দেখলেও কেমন যেন পতঙ্গের কথা মনে পড়ে যায়। নানা রোমাঞ্চকর অভিযানের পরে শেষপর্যন্ত হারিয়ে যাওয়া চন্দ্রযানটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, একজন এতে চড়ে পৃথিবীতে ফিরে এল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্যাভোর আর ফিরতে পারল না। এর পর পৃথিবীর মানুষ পেয়েছিল চাঁদ থেকে পাঠানো তার নানা বার্তা। এইচ. জি. ওয়েল্‌সের বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পগুলির আকর্ষণ বড় কম নয়। 'দ্য ইনএক্সপিরিয়েন্সড ঘোস্ট'. 'পোলক অ্যান্ড দ্য পোরো ম্যান', 'দ্য ম্যান হু কুড ওয়ার্ক মিরাক্‌ল' ইত্যাদি গল্প বেশ রোমাঞ্চকর। প্রাসঙ্গিকভাবে দু-একটি কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ৩০ অক্টোবর, ১৯৩৮ সালে মার্কিন বেতারে ওঅর অব দ্য ওয়ার্ল্ড্‌স উপন্যাসটির নাট্যরূপ ধারাহিকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। পরের দিন ৩১ অক্টোবর 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স'-এর পাতা ভরে গিয়েছিল অজস্র ভীতসন্ত্রস্ত পাঠকের চিঠিতে। তাঁরা তরুণ অভিনেতা অরসন ওয়েল্‌স-এর অভিনয়কে সত্যি ভেবেছিলেন, এমনই নিখুঁত ও প্রাণবন্ত ছিল সেই অভিনয়। সেই অভিনয় দেখে মঙ্গলের বাসিন্দারা পৃথিবী আক্রমণ করেছে মনে করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন অনেকে। শোনা যায়, অনেকে এই ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আবার অনেকে আশ্রয় চেয়েছিলেন পুলিশের কাছে। আসলে বেতারনাট্যে মর্ত্যে মঙ্গলের অধিবাসীদের আগমনবার্তা 'নিউজ বুলেটিন'-এর মতো প্রচার করা হয়েছিল। এইচ. জি. ওয়েল্‌সের প্রধান উপন্যাসগুলি এবং কোনও-কোনও গল্প চলচ্চিত্রায়িত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ইংরেজি সাহিত্যে এইচ. জি. ওয়েল্‌স বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন। উনিশ শতকের শেষে তিনি কল্পবিজ্ঞানকাহিনী রচনায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ওয়েল্‌স 'কমিক' উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। আবার 'দ্য আউটলাইন অব হিস্ট্রি' বইটিতে মানবসভ্যতা সম্পর্কে মনীষাদীপ্ত চিন্তাভাবনার পরিচয় ফুটে উঠেছে উজ্জ্বলভাবে। বিশাল এই প্রতিভার মৃত্যু হয় ১৯৪৬ সালে।

যৌবনে এইচ. জি. ওয়েল্‌স : ১৮৯২ সালে তোলা ফোটোগ্রাফ

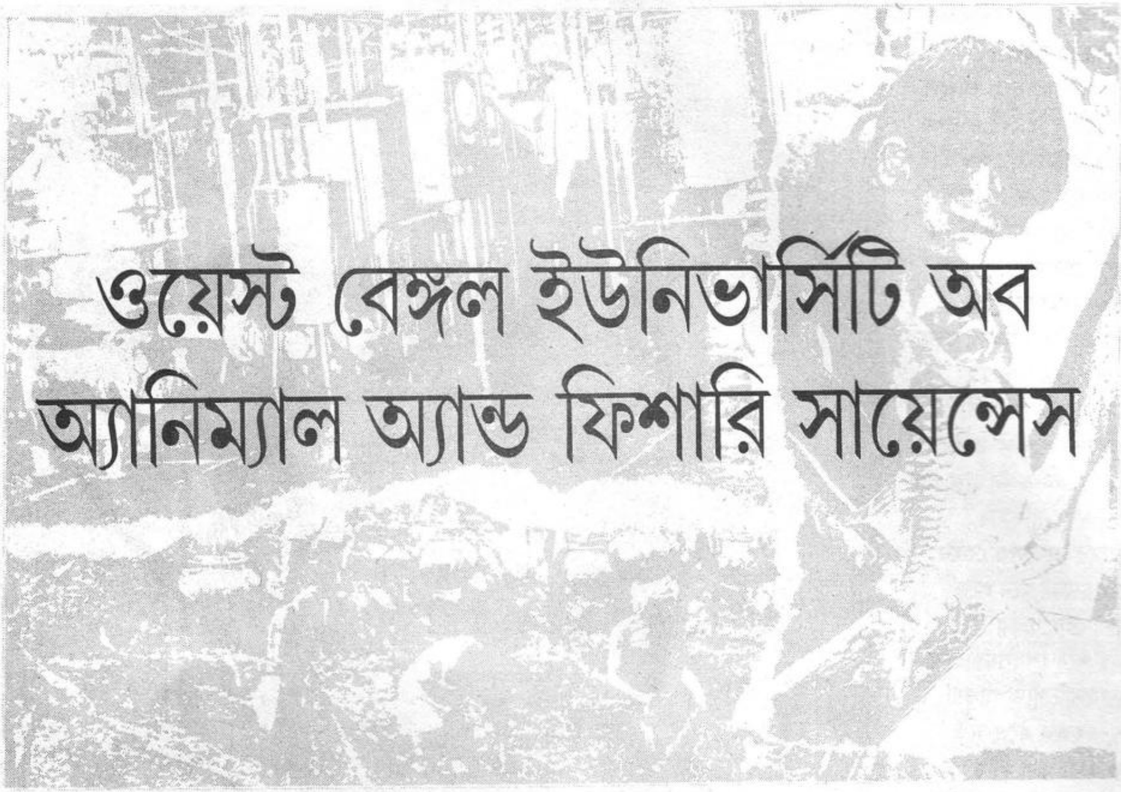

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেস

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যবিজ্ঞান পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে নবতম সংযোজন এই বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা, নিয়মকানুন নিয়ে এবারের আলোচনা।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যবিজ্ঞান বিষয়ে পঠনপাঠন, গবেষণার জন্য একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। সুখের বিষয়, এ-বছর থেকেই এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে পড়াশোনা এবং যাবতীয় পঠনপাঠন সংক্রান্ত কাজকর্ম। এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, এবার বিভিন্ন পাঠক্রমে ভর্তির নিয়ম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছি।

শিক্ষায়তনটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল, 'ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স', 'ফিশারি সায়েন্স', 'ডেয়ারি টেকনোলজি' ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে শিক্ষাদান। এইসব বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজকর্ম সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, যাতে গ্রামীণ অর্থনীতি সমৃদ্ধ হতে পারে।

এইসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি 'ফ্যাকাল্টি' নিয়ে কাজ শুরু করেছে—(১) 'ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস'। এই বিভাগ আপাতত বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনপুর ক্যাম্পাসেই কাজ করবে এবং পরবর্তীকালে বেলগাছিয়া ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হতে পারে। (২) 'ফ্যাকাল্টি অব ডেয়ারি টেকনোলজি'। এখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনপুর ক্যাম্পাসেই চলবে। আর (৩) 'ফ্যাকাল্টি অব ফিশারি সায়েন্সেস' এখন কাজ করবে কল্যাণী কুলিয়ার 'স্টেট ফিশারিজ ট্রেডিং সেন্টার'-এ। 'সেমিস্টার' পদ্ধতিতে পড়াশোনা চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্যালয় থাকছে কলকাতার পুরনো বেলগাছিয়া রোডের ভেটেরিনারি কলেজ ক্যাম্পাসেই, অর্থাৎ ৬৮ ক্ষুদিরাম বসু সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৩৭ ঠিকানায়।

বিভিন্ন পাঠক্রম

আগেই উল্লেখ করেছি, নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি থাকছে তিনটি। ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্সেসের অধীনে পড়ানো হবে (ক) বি ভি এসসি অ্যান্ড এ এইচ— পাঁচ বছরের 'ইন্টিগ্রেটেড কোর্স' ; (খ) এম ভি এসসি—দু' বছরের কোর্স ; (গ) পিএইচ ডি—তিন বছরের কোর্স।

ফ্যাকাল্টি অব ডেয়ারি টেকনোলজির অধীনে পড়ানো হবে—(ক) বি টেক (ডি টি)—চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্স ; (খ) এম টেক—দু' বছরের কোর্স ; (গ) পিএইচ ডি--তিন বছরের কোর্স। বিষয়গুলির মধ্যে আছে—(১) ডেয়ারি ব্যাকটিরিওলজি ; (২) ডেয়ারি কেমিস্ট্রি ; (৩) ডেয়ারি টেকনোলজি ; (৪) ডেয়ারি এঞ্জিনিয়ারিং।

ফ্যাকাল্টি অব ফিশারি সায়েন্সেসের অধীন পড়ানো হবে—বি এফ এসসি। চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্স।

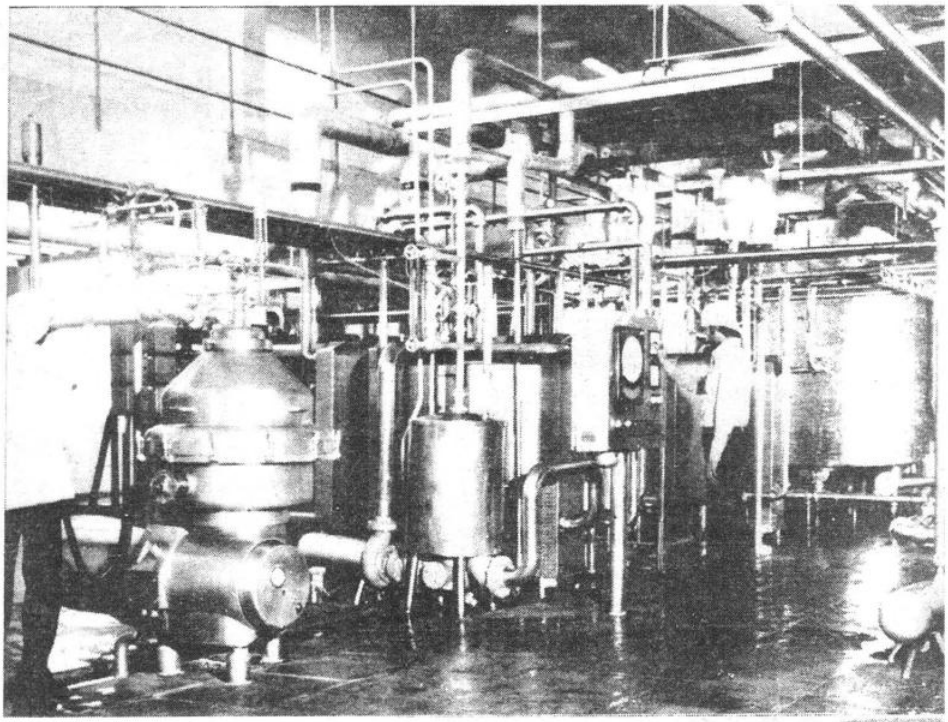

ভর্তির যোগ্যতা

(১) বি ভি এসসি অ্যান্ড এ এইচ অর্থাৎ 'ব্যাচেলর ইন ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি' কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি সহ 'এগ্রিগেট'-এ কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এ ছাড়া যেসব প্রার্থী এই বিষয়গুলি ছাড়াও 'ভোকেশনাল' বিষয় হিসেবে পোলট্রি ও ডেয়ারি নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে এগ্রিগেটে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছেন, তাঁরাও ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। তফসিলি জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে এই নম্বরের ন্যূনতম হার যথাক্রমে শতকরা ৫৫ ও ৫০।

(২) বি টেক (ডি টি) অর্থাৎ 'ব্যাচেলর অব টেকনোলজি ইন ডেয়ারি টেকনোলজি'—এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে বিজ্ঞান শাখায় অর্থাৎ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ্‌মেটিক্স সহ এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে হবে (তফসিলি প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ)। যাঁরা 'ভোকেশনাল স্ট্রিম'-এ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ্‌মেটিক্স 'ইলেকটিভ' বিষয় এবং 'মেকানিক্যাল সার্ভিসিং অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স' বা 'ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসিং অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স' ভোকেশনাল বিষয় নিয়ে এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। তফসিলি প্রার্থীর ক্ষেত্রে নম্বরের হার কমপক্ষে ৫৫ শতাংশ। তফসিলি প্রার্থীরা অবশ্য কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করলেও আবেদন করতে পারবেন।

(৩) বি এফ এসসি অর্থাৎ 'ব্যাচেলর অব ফিশারি সায়েন্স'— যেসব প্রার্থী জেনারেল স্ট্রিমে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বিষয় নিয়ে এগ্রিগেটে কমপেক্ষ ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন, তাঁরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া ভোকেশনাল স্ট্রিমে যাঁদের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি ইলেকটিভ বিষয় ছিল কিন্তু 'পিসিকালচার' (Pisciculture) ভোকেশনাল বিষয় ছিল তাঁরাও ওই নম্বর পেয়ে পাশ করলে আবেদন করতে পারবেন। তফসিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নম্বরের হার যথাক্রমে ৫৫ ও ৫০ শতাংশ।

বয়ঃসীমা

১ জুন তারিখের হিসেবে প্রার্থীদের বয়স ২১ বছরের কম হওয়া দরকার। তফসিলি জাতি, উপজাতি ও পার্বত্য উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমায় পাঁচ বছর ছাড় আছে। এ ছাড়া আই সি এ আর কিংবা এন ই সি স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও একই হারে বয়সের ছাড় আছে।

আসন-সংখ্যা

এবার বিভিন্ন কোর্সে সবচেয়ে বেশি কতজন

ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে সে-বিষয়ে উল্লেখ করছি। যেমন, বি ভি এসসি অ্যান্ড এ এইচ কোর্সে নেওয়া হবে ৮০ জন ; বি টেক (ডি টি) কোর্সে ২০ জন ; বি এফ এসসি কোর্সে নেওয়া হবে ২০ জন। মোট এই আসনের মধ্যে তিনটি কোর্সেই আই সি এ আর এবং এন ই সি কর্তৃপক্ষের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ১০ শতাংশ আসন বরাদ্দ থাকবে। এ ছাড়া বি ভি এসসি অ্যান্ড এ এইচ কোর্সের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার মনোনীত প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ আছে আরও ১৫ শতাংশ সংরক্ষিত আসন। অন্যান্য আসনে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা তফসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য ২২ শতাংশ, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ৬ শতাংশ ও খেলাধুলোয় বিশেষ পারদর্শীদের জন্য ১ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে জানাই, যদি সংরক্ষিত আসনের জন্য কোনও প্রার্থী না থাকেন, তা হলে সেইসব আসন মেধাভিত্তিতেই পূরণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি প্রার্থীদের জন্য বিভিন্ন কোর্সে অতিরিক্ত একটি করে আসনে ছাত্র ভর্তি করতে পারবেন। এ ছাড়া যেসব প্রার্থী জাতীয় কিংবা রাজ্যস্তরে কিংবা প্রথম বিভাগের ক্লাবে খেলাধুলো করছেন, সেইসব কৃতী খেলোয়াড়দের জন্যও অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা হতে পারে। মনে রাখতে হবে, সংরক্ষিত মনোনীত আসনে ভর্তি হতে হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মনোনয়নের ভিত্তিতে আসতে হবে, যেমন পার্বত্য তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের মনোনয়ন করবেন দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল। অন্যান্য সংরক্ষিত আসনে উপযুক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মনোনয়ন নিয়ে আসতে হবে।

খরচ

ভর্তির জন্য মনোনীত প্রার্থীদের নগদে কিংবা 'ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট'-এ ভর্তির 'ফি', 'টিউশন ফি', 'ল্যাবরেটরি' ও 'হস্টেল কশান ডিপোজিট' ইত্যাদি জমা দিতে হবে। যেমন ভর্তি ফি ৩০ টাকা, টিউশন ফি ১২০ টাকা, 'ডিভেলাপমেন্ট ফি' ৫০ টাকা। ল্যাবরেটরি ফি ২৫ টাকা, সেমিস্টার ফি ২৫ টাকা, 'সিট রেন্ট' ৬০ টাকা, লাইব্রেরি ডিপোজিট ১০০ টাকা, 'রেজিস্ট্রেশন ফি' ৫০ টাকা, 'আইডেনটিটি কার্ড' ১৫ টাকা, 'মেস এনট্রান্স ফি' ১০ টাকা, 'হস্টেল কশান মানি' ৫০ টাকা, 'এস্টাবলিশমেন্ট চার্জ' ২০ টাকা, 'হস্টেল এস্টাবলিশমেন্ট চার্জ' ৩০ টাকা, 'মেস কশান মানি' ৩০০ টাকা, 'মেস অ্যাডভান্স' ৫০০ টাকা, 'লাইব্রেরি কার্ড' ৫ টাকা, পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা ইত্যাদি হারে বিভিন্ন ফি ধার্য করা হয়েছে। প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই সব ফি অগ্রিম জমা দিতে হবে।

হস্টেল

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট হস্টেলের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির সময়েই নির্দিষ্ট ফর্মে হস্টেলের আসনের জন্যও আবেদন করতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্যালয়, ৬৮, ক্ষুদিরাম বসু সরণি (পূর্বতন বেলগাছিয়া রোড), কলকাতা-৭০০ ০৩৭ ঠিকানা থেকে।

যে-কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে ৩ টার মধ্যে নগদ ২৫ টাকার বিনিময়ে (সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে) এবং তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫ টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। তফসিলি প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। আর যাঁরা ডাকযোগে ফর্ম পেতে চান তাঁরা নির্দিষ্ট মূল্যের (অর্থাৎ সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে ভর্তির আবেদনপত্র ২৫ টাকা ও তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫ টাকা) পোস্টাল অর্ডার এবং প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা ২৫×১৫ সেন্টিমিটার মাপের পাঁচ টাকার ডাকটিকিট যুক্ত একটি খাম পাঠাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায়। অনুরোধপত্রের ওপর 'অ্যাডমিশন টু বি ভি এসসি অ্যান্ড এ এইচ/বি টেক (ডি টি)/বি এফ এসসি কোর্সে' যেমনটি প্রযোজ্য, উল্লেখ করতে ভুলবেন না। আপাতত ঠিক আছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ২০ দিনের মধ্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে এই তারিখ বাড়াতে পারেন। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ২৫ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে মনোনীত ছাত্রছাত্রীদের নাম জানিয়ে দেওয়া হবে। মেধার ভিত্তিতেই প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। অবশ্য খেলাধুলো, তফসিলি প্রার্থীদের সংরক্ষণ এবং 'স্পনসর্ড' প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম মেনে প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ করা হবে।

জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রার্থীরা নিজের হাতে স্পষ্ট অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করবেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষার মার্কশিট, অ্যাডমিট কার্ড ইত্যাদির প্রত্যয়িত নকল সঙ্গে দেবেন। খেলাধুলোয় পারদর্শী হলে কিংবা বিশেষ কৃতিত্ব থাকলে সেসব প্রশংসাপত্রেরও প্রত্যয়িত নকল সঙ্গে দেবেন। তফসিলি প্রার্থীরা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা জাতিগত সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল অবশ্যই সঙ্গে জমা দেবেন। সবদিক থেকে পূরণ করা ফর্ম (প্রত্যেক কোর্সের জন্য আলাদা ফর্ম) কন্ট্রোলার অব এগজামিনেশন্‌স, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেস, ৬৮ ক্ষুদিরাম বসু সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৩৭ ঠিকানায় ব্যক্তিগতভাবে এসে কিংবা ডাকযোগে জমা দিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে এসে ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া ভাল। ডাকে দেরি হতে পারে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ সংবাদপত্রে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ভোকেশনাল স্ট্রিমের ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ

উচ্চ মাধ্যমিকে যাঁরা ভোকেশনাল স্ট্রিম নিয়ে পাশ করেছেন তাঁদের জন্য সুখবর আছে। বৃত্তিমূলক শাখায় প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা এখন থেকে পলিটেকনিকের মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। অবশ্য বয়স হওয়া চাই ২১ বছরের মধ্যে। আসন-সংখ্যা ২০টি। পড়ানো হবে, জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ; বর্ধমানের এম বি সি ইনস্টিটিউট অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ; ঝাড়গ্রামের আই সি ভি পলিটেকনিক ; আসানসোলের কল্যাণপুর পলিটেকনিক ; হুগলির ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ; কৃষ্ণনগরের বি পি সি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ; বিষ্ণুপুরের কে জি এঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ; বেলঘরিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ ; বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির ; মালদা পলিটেকনিক ; পুরুলিয়া পলিটেকনিক ; নর্থ ক্যালকাটা পলিটেকনিক, সেন্ট্রাল ক্যালকাটা পলিটেকনিক ; জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক এবং এ পি সি রায় পলিটেকনিক প্রভৃতি পলিটেকনিকে। ভর্তির জন্য সাধারণ কাগজে বিভিন্ন তথ্যসহ আবেদন করতে হবে। যোগাযোগের ঠিকানা : ডিরেক্টর অব টেকনিক্যাল এডুকেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ; বিকাশ ভবন, ১২ তল, ইস্ট ব্লক, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১।

অমর দাশ

কার পোস্টার?

বিশ্বের সেরা এক ক্রিকেটারের মূল্যবান আর্ট-পেপারে ছাপা, সংগ্রহে রাখার মতো রঙিন বড় পোস্টার 'আনন্দমেলা'র পাঠক-পাঠিকাদের আমরা বিনামূল্যে দিতে চাই। পোস্টারের ছবিটি আটটি অংশে ভাগ করে এক-একটি অংশ ১০ মে সংখ্যা থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে। ছবির প্রতিটি অংশে নম্বর দেওয়া আছে। এক থেকে আট পর্যন্ত নম্বর মেলালেই পোস্টারের ছবিটি সম্পূর্ণ হবে।

নিয়মাবলী

১ নীচের কুপনটি সম্পূর্ণ পূরণ করে আনন্দমেলা পত্রিকার ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

২ কুপনের জেরক্স কপি বা অন্য কোনও কপি গৃহীত হবে না। মূল কুপনটি শুধু গৃহীত হবে।

৩ পোস্টারের ছবির নম্বর দেওয়া অংশগুলিও (এক থেকে আট নম্বর পর্যন্ত মিলিয়ে) কুপনের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

৪ এক থেকে আট পর্যন্ত প্রতিটি নম্বর মিলিয়ে পোস্টারের মোট আটটি অংশ যারা পাঠাবে, শুধু তাদেরই দেওয়া হবে এই পোস্টার। বিচ্ছিন্নভাবে ছবির অংশগুলি পাঠানো হলে তা গৃহীত হবে না। প্রতিটি অংশের সঙ্গে সম্পূর্ণ পূরণ করা কুপনও পাঠাতে হবে। অর্থাৎ, আটটি অংশের সঙ্গে পাঠাতে হবে আটটি কুপন।

৫ খামের ওপর 'রঙিন পোস্টার' কথাটি অবশ্যই লিখতে হবে।

৬ মোট আটটি অংশ সম্পূর্ণ হলে, তবেই আনন্দমেলার দফতরে পাঠাতে হবে। তার আগে নয়।

কু প ন – ৮

আনন্দমেলা

নাম ....

ঠিকানা ....

....

বয়স ....

স্কুল/কলেজ ....

অভিভাবকের নাম ....

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

ব্যক্তিজীবনে বিজ্ঞান
সন্তোষকুমার ঘোড়ই
নিউ ইন্ডিয়া পাবলিশার্স
কলকাতা-৯
দাম : ২০ টাকা

কারচুপি বিজ্ঞান
সন্তোষকুমার ঘোড়ই
প্রত্যয় প্রকাশনী
কলকাতা-৯
দাম : ২০ টাকা

আমাদের জীবনের বেশির ভাগ চর্চা, অভ্যাস, অভিজ্ঞতার মধ্যে আজ কোনও-না-কোনওভাবে মিশে আছে বিজ্ঞান। যার খোঁজ আমরা কেউ রাখি, কেউ রাখি না। সেই সব খোঁজখবরের কথা বলা হয়েছে বই দুটিতে।

'ব্যক্তিজীবনে বিজ্ঞান' বইটিতে আছে দৈনন্দিন জীবনের হরেক খুঁটিনাটি ঘটনার বৈজ্ঞানিক কারণ। যেমন, গরম দুধ উথলে পড়ে, কিন্তু জল পড়ে না কেন ? ড্রেনের ঢাকনা গোলাকার কেন ? সন্ধের পর রেডিও ভালভাবে শোনা যায় কেন ? ঘোলা জলে ফিটকিরি দিলে কেন জল পরিষ্কার হয়ে যায় ? ক্লাসে দাঁড়িয়ে থাকাটা শাস্তি, বসে থাকাটা নয় কেন ইত্যাদি।

'কারচুপি বিজ্ঞান'-এ আছে অলৌকিকতা, কুসংস্কারের বিজ্ঞানসম্মত সমাধান, যেমন শূন্যমার্গে বিচরণ, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, বিষ ঝাড়া ইত্যাদি।

সুন্দর সাবলীল ভাষা। গল্পের ছলে বলা। আছে বিভিন্ন ঘটনা। তরতর করে পড়ে ফেলা যায়। লেখক নিজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। তাঁর অভিজ্ঞতায় তাই বিষয়গুলি অন্য মাত্রা পেয়েছে। পাতায়-পাতায় ছবি, স্কেচ, সুন্দর প্রচ্ছদ। কারণগুলি বিশ্লেষণের সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়া হয়েছে মূল সূত্রগুলি। বিজ্ঞান যে পাঠ্য বিষয় হিসেবেও মোটেই ভয়ের নয়, বরং রীতিমত আকর্ষক, বইগুলি পড়লে তা বোঝা যায়। পড়তে-পড়তে শেখা। শেখার জন্য পড়া।

অঞ্জন সিকদার

অতল জলের বাসিন্দা

সমুদ্রে আতঙ্ক
জহর মুখোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
কলকাতা-৭০০ ০০৯
দাম : ১৫ টাকা

সাগর তলের বাসিন্দাদের নিয়ে এই বই। সমুদ্রের কয়েকটি প্রাণী সম্পর্কে নানা তথ্য আছে এই বইটিতে। জলের নীচের হিংস্র প্রাণীদের অনেক কথাই অজানা আমাদের কাছে। জানি না শান্ত, নিরীহ প্রাণীদের অনেক মজাদার খবরও। লেখক গল্পের মতো করে শুনিয়েছেন সেসব কথা। 'মানুষখেকো মাছ পিরান্হা' আর 'সাগরের শয়তান জেলিফিশ' পড়তে গিয়ে যেমন রোমাঞ্চ হয়, তেমনই মজা পাওয়া যায় 'ডলফিন'-এর প্রখর বুদ্ধির কথা জেনে।

'ডাইনোসর' লেখাটিতে লকনেস মনস্টারের কাহিনী না থাকলেই ভাল হত। সব মিলিয়ে বইটি পড়তে ভাল লাগে, জানা যায় অনেক কিছু।

জয় সেনগুপ্ত

ইঙ্গ-বঙ্গ শব্দকোষ

লার্নিং ওয়ার্ডস
সংকলন ও সম্পাদনা :
দিলীপকুমার মিত্র
বিচিত্রা প্রকাশনী
কলকাতা-৭০০০০৯
দাম : ৩০ টাকা

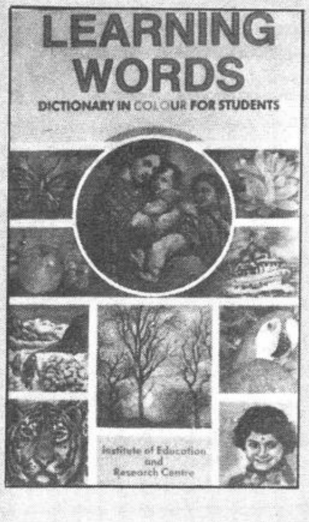

সব ভাষাতেই এমন বিস্তর শব্দ রয়েছে, যা অন্তত সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের কাজে লাগে না। এ-ব্যাপারে ইংরেজি ভাষাও ব্যতিক্রম নয়, সেখানেও আছে এমন হাজার-হাজার শব্দ। দিলীপকুমার মিত্র সেসব শব্দকে তাঁর এই বইয়ের মধ্যে ঢোকাননি। অল্পবয়সী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে এই ইঙ্গ-বঙ্গ শব্দকোষখানি তৈরি করেছেন তিনি, আর তাই খুব সতর্ক হাতে শুধু সেইসব ইংরেজি শব্দ বেছে নিয়ে এখানে ঠাঁই দিয়েছেন, ইংরেজি বইপত্রে আমাদের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা মাঝে-মাঝেই যার দেখা পাবে, এবং যার উচ্চারণ ও অর্থ জেনে নিলে তাদের ভাষাশিক্ষার বনেদটা বেশ পোক্ত হবে। অবশ্য তেমন শব্দও এখানে নেহাত কম দেখছি না। তা অন্তত হাজার সাতেক তো হবেই। কিছু বেশিও হতে পারে।

সেসব শব্দের অর্থ তো এখানে আছেই, সেইসঙ্গে প্রতিটি পৃষ্ঠায় আছে অন্তত চারটে করে ছবি। একে রঙিন ছবি, তায় বেশ যত্ন নিয়ে আঁকা। শব্দের অর্থ তাতে আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। বিশেষ করে বলতে হয় যেসব বিষয় সম্পর্কে ছোটদের অনেকেরই ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, তার ছবির কথা। যেমন, ধরা যাক, অস্ট্রিচ যে উটপাখি, শুধু এইটুকু জানিয়েই এ-বইয়ের কাজ ফুরোচ্ছে না, ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, পাখিটা কেমন দেখতে। ছোটদের ব্যবহার্য এমন সচিত্র শব্দকোষ বিদেশে বিস্তর পাওয়া যায়। এ-দেশের চাহিদা এবারে এ-বইয়ের মাধ্যমে অনেকটা মিটবে। উচ্চারণের কথায় বলি, এক ভাষার শব্দের উচ্চারণ অন্য ভাষার মানুষের পক্ষে একেবারে টায়-টায় ধরতে পারা বড় কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে ধরাই যায় না। ইংরেজরা কি প্রতিটি বাংলা শব্দের একেবারে ষোলোআনা নিখুঁত উচ্চারণ করতে পারে ? ঠিক সেইরকমই, আমাদের মুখেও বিস্তর ইংরেজি শব্দের সেই উচ্চারণ ফোটে না, যা একেবারে নিখুঁত বলে মান্য হবে। তা না-ই হোক, শুদ্ধ উচারণগুলিকে যতটা সম্ভব ধরিয়ে দেওয়ার সৎ ও আন্তরিক চেষ্টা অন্তত এখানে রয়েছে। কয়েকটা শব্দের উচ্চারণ নিয়ে আমার একটু খটকা ছিল। কিন্তু 'কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারি' খুলে দেখতে পাচ্ছি, এ-বইয়ে যা দেওয়া হয়েছে, সেটাই ঠিক। সন্দেহ নেই যে, যারা ইস্কুলের ছাত্র, কিংবা সদ্য যারা ইংরেজি ভাষার চৌহদ্দির মধ্যে পা বাড়িয়ে দিয়েছে, অন্তত তাদের পক্ষে ইংরেজি শব্দের অর্থ জানার ও উচ্চারণ শেখার ব্যাপারে এ একখানি চমৎকার বই।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

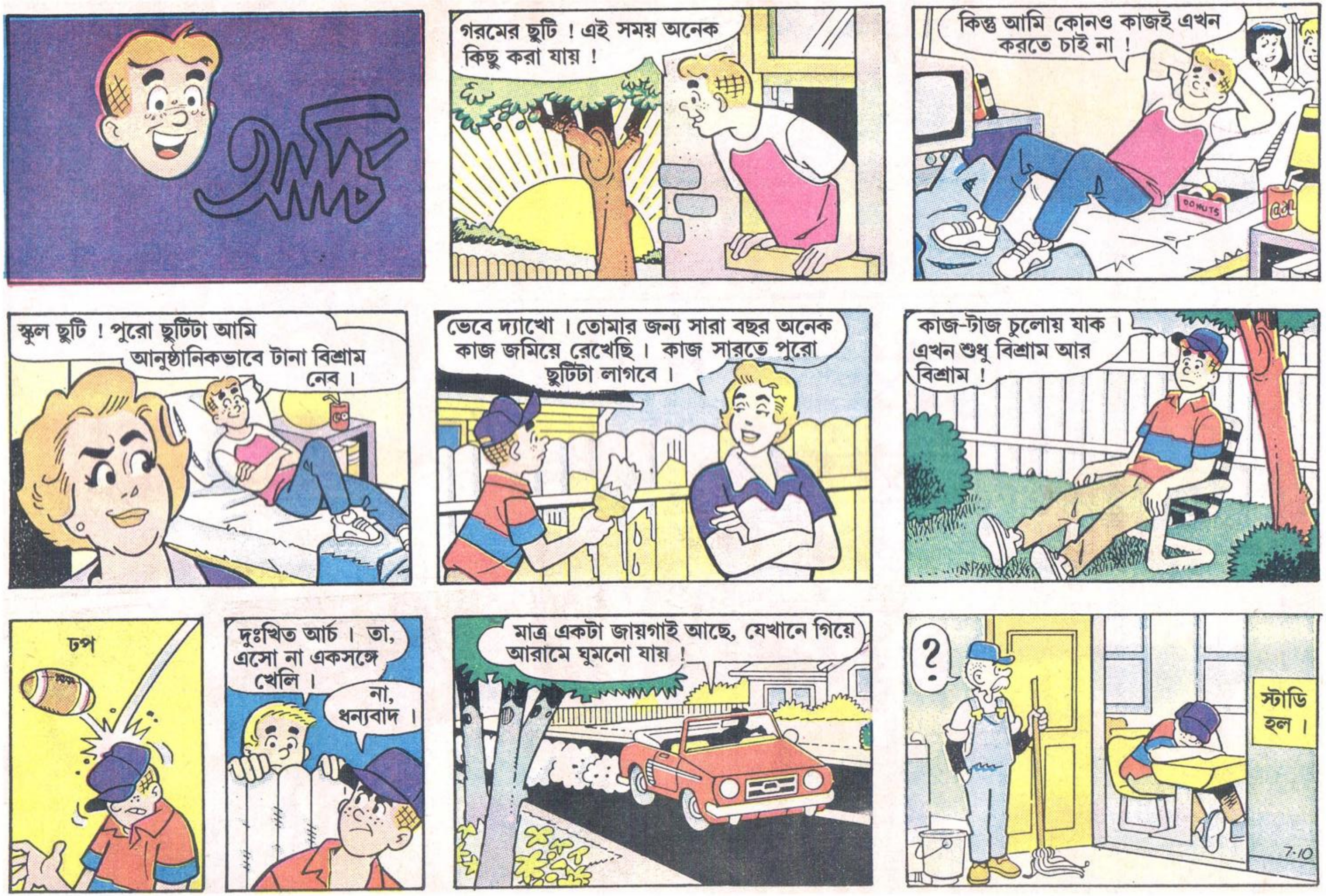
আর্চি
গরমের ছুটি ! এই সময় অনেক কিছু করা যায় !
কিন্তু আমি কোনও কাজই এখন করতে চাই না !
DONUTS
স্কুল ছুটি ! পুরো ছুটিটা আমি আনুষ্ঠানিকভাবে টানা বিশ্রাম নেব ।
ভেবে দ্যাখো । তোমার জন্য সারা বছর অনেক কাজ জমিয়ে রেখেছি । কাজ সারতে পুরো ছুটিটা লাগবে ।
কাজ-টাজ চুলোয় যাক । এখন শুধু বিশ্রাম আর বিশ্রাম !
ঢপ
দুঃখিত আর্চ । তা, এসো না একসঙ্গে খেলি ।
না, ধন্যবাদ ।
মাত্র একটা জায়গাই আছে, যেখানে গিয়ে আরামে ঘুমনো যায় !
?
স্টাডি হল ।
7-10

বিজ্ঞান গবেষণা

জীবন্ত ডি এন এ গণক

এতদিন যেসব বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক সমস্যা যন্ত্রগণকে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব মনে হত, নতুন ডি এন এ কম্পিউটার তৈরির ফলে সেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। লিখেছেন সুব্রত রায়

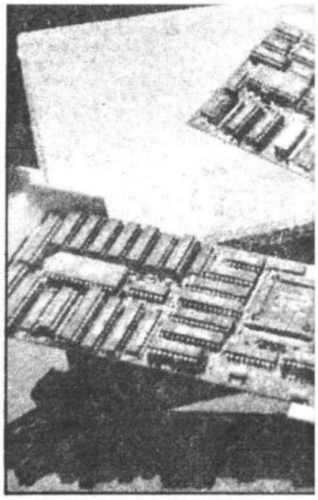

প্রচলিত কম্পিউটার চিপ্‌স

একটা ছোট টেস্ট টিউবের ভেতর এক নয়, একশো নয়, একের পিঠে ২০টি শূন্য বসালে যে বিরাট সংখ্যা হয় তত প্রসেসর। বিজ্ঞানের কল্যাণে এও সম্ভব করেছেন ইউনিভার্সিটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার ডঃ লেনার্ড অ্যাডেলম্যান। জীববিজ্ঞান, গণিত এবং রসায়নশাস্ত্র এবার একসঙ্গে মিশেছে। তাঁর গবেষণাগারে অ্যাডেলম্যান টিটি ১০০ নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কম্পিউটার তৈরি করেছেন। ইলেকট্রনিক মাইক্রোচিপসের বদলে এতে আছে একটি টেস্ট টিউব। তাতে চায়ের চামচের পাঁচ ভাগের একভাগ বা ১০০ মাইক্রোলিটার তরলে চোবানো ডি এন এ অণু। ডি এন এ বা ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড হল জিনের মূল কথা। ক্রোমোজোম,জিন,এসব শব্দগুলি আমরা প্রায় সকলেই জানি। জীবজগতের সৃষ্টিরহস্যের সূত্র লুকিয়ে আছে জিনের প্রোটিনে। অ্যাডেলম্যান সেই জিনকে ব্যবহার করে তৈরি করেছেন ডি এন এ কম্পিউটার। ডি এন এ জীবন্ত। তাই বলা চলে

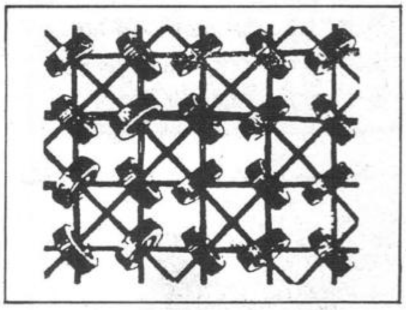

জীবন্ত গণক।

ডি এন এ খালি চোখে দেখা যায় না। ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপে খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাদের চোখে পড়ে। অথচ জীবদেহে ডি এন এ-র উপস্থিতি টের না পেয়ে উপায় নেই। আমাদের শারীরিক গঠন-বৈশিষ্ট্য বেড়ে ওঠা, বুড়িয়ে যাওয়া, এমনকী জীবনকাল সবই নিয়ন্ত্রণ করে ডি এন এ। জীবকোষের যাবতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া খুব দ্রুত এবং সমান্তরালভাবে চালনা করার কাজে ডি এন এ-র জুড়ি নেই। একটি ছোট টেস্ট টিউবের মধ্যে ১০০ লক্ষ কোটি ডি এন এ অণু। মানে একের পিঠে ১৪টি শূন্য। ফলে একসঙ্গে কয়েকশো লক্ষ কোটি কাজ করতে পারে টেস্ট টিউবটি। কাজগুলিকে নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে সম্পন্ন করা গেলে বিজ্ঞানীদের বিরাট সুবিধে। তখন ওই ছোট্ট টেস্ট টিউবের ১০০ মাইক্রোলিটার তরলে জন্ম নেবে মাসিভলি প্যারালাল কম্পিউটার। নতুন টিটি ১০০ কম্পিউটারে একটি পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করে দেখিয়েছেন অ্যাডেলম্যান। সম্প্রতি বিখ্যাত 'সায়েন্স' পত্রিকায় তাঁর অভাবনীয় গবেষণাপত্রটি ছাপা হয়েছে।

জীবন্ত এই গণকটি তৈরি করা কঠিন নয়। এতে শক্তি লাগে খুব কম। অতএব প্রচলিত সুপার কম্পিউটার ও প্যারালাল সুপার কম্পিউটারগুলির তুলনায় রাসায়নিক বিক্রিয়াচালিত ডি এন এ গণকে শতাংশেরও কম বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয়ে অনেকগুণ বেশি কাজ পাওয়া যাবে। ডি এন এ গণক সৃষ্টি করে অ্যাডেলম্যান বিজ্ঞানের জগতে

ডি এন এ কম্পিউটারের জিন

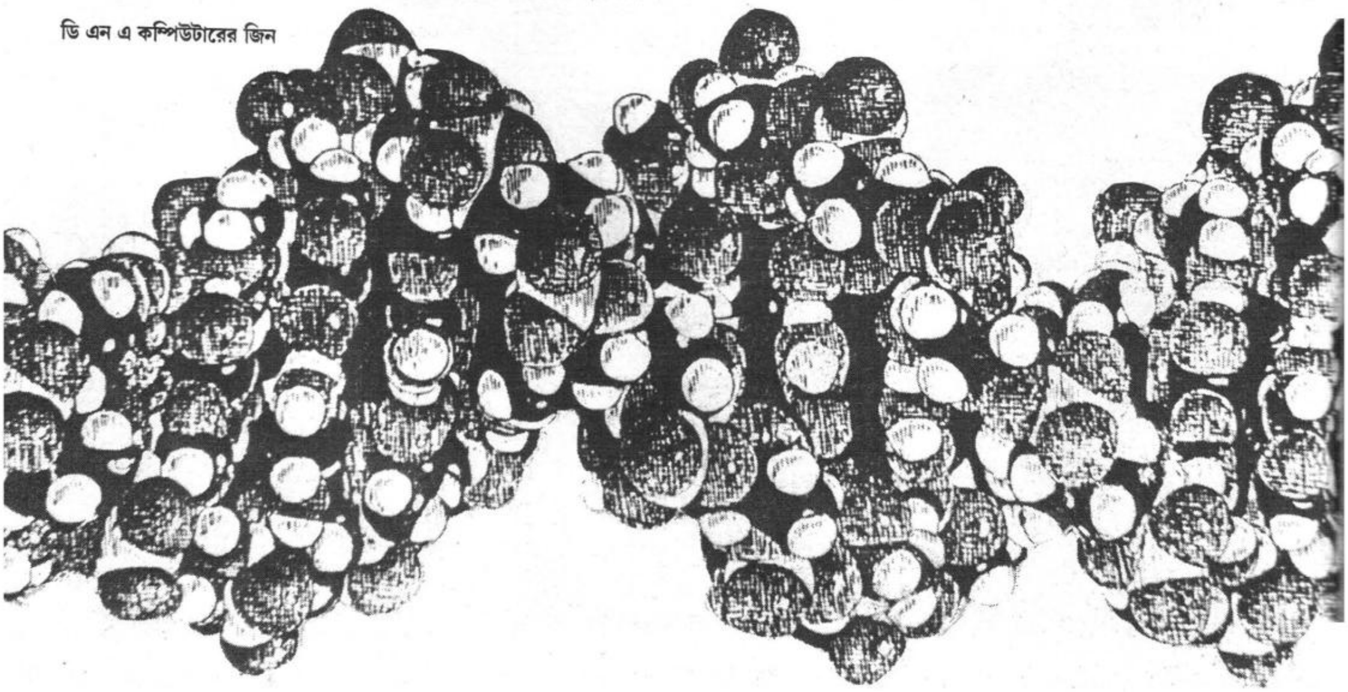

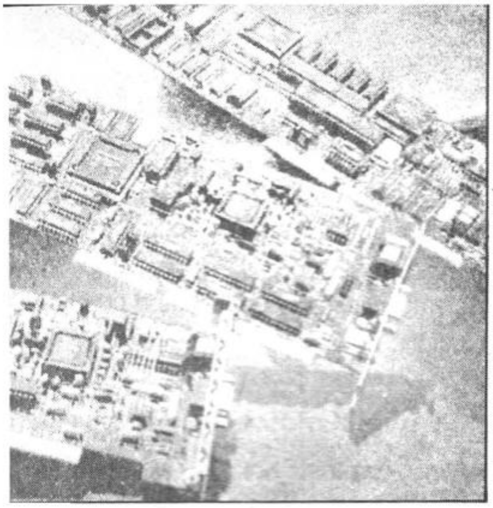

সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্ত মেলে দিয়েছেন। হিসেব কষে দেখা গেছে মাত্র এক পাউন্ড ডি এন এ অণু এক বর্গগজ এলাকা জুড়ে তৈরি একটি চৌবাচ্চায় প্রায় হাজার লিটার তরলে ডুবিয়ে রেখে যে জীবন্ত গণক তৈরি হবে তার স্মৃতিশক্তি ও গণনা করবার ক্ষমতা পৃথিবীর এ-যাবৎ তৈরি সমস্ত প্রচলিত কম্পিউটার এবং সুপার কম্পিউটারের মিলিত শক্তির চেয়ে বেশি। ফলে এতদিন যে সব বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক সমস্যাকে যন্ত্রগণকে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব মনে হত, নতুন ডি এন এ কম্পিউটার সৃষ্টির ফলে সেই সীমা অতিক্রম করা গেছে।

প্রচলিত যন্ত্রগণকে আছে ইলেকট্রনিক চিপ্স। বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের সাহায্যে সেই চিপ্সগুলি যে কোনও সংখ্যাকে বাইনারি কোড ০ এবং ১-এ ভেঙে হিসেব কষে। নতুন গণকে ডি এন এ কোড A.T.C.G নামে চারটি রাসায়নিক এককে সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা হয়। A.T.C.G যথাক্রমে অ্যাডিনিন, থাইমিন, সাইটোসিন এবং গুয়ানিন। এই বিশেষ জৈবরাসায়নিকগুলি জীবকোষে অতি-গুরুত্বপূর্ণ জেনেটিক সঙ্কেত বহন করে। তারপর বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে চলে গণনার কাজ। সাধারণ কম্পিউটারে বোতাম টিপে কি-বোর্ডের সাহায্যে কাজ হয়। ডি এন এ কম্পিউটারে বোতাম টেপার উপায় নেই। তা ছাড়া রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি পরম্পরায় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে গণনাগুলি পূর্বনির্দিষ্ট ক্রমানুসারে হয়। গুণের পর হয়তো যোগ, তারপর ভাগ করে শেষে বিয়োগ। কাজটা সহজ না হলেও সম্ভব। অ্যাডেলম্যানের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রচলিত ধারণাগুলি বদলাতে শুরু করেছে। উদাহরণ হিসেবে প্রচলিত মাইক্রোচিপ্স কম্পিউটারে বাইনারি কোডে যদি কোনও সংখ্যাকে লেখা হয় ১০১, তবে ডি এন এ কোডে

সেই একই সংখ্যা হবে ATTCG TCGGA GATTC. শুনতে খটমট হলেও এই নতুন পদ্ধতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত করা সম্ভব। ফলে সম্ভব একটি টেস্ট টিউবের মধ্যে কয়েকশো কোটি হিসেব কষা। প্রিন্সটনে এন ই সি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডঃ এরিক বমের ভাষায় এখন একটা ছোট টেস্ট টিউবে অনায়াসে ঢুকে যাবে একের পিঠে ১৪টি শূন্য বসালে যত বড় সংখ্যা হয় তত প্রসেসর। এক হাজার লিটার তরলে যে পরিমাণ স্মৃতিশক্তি পাওয়া যাবে, তা মানুষের মাথার কোটি গুণ বেশি। সাধারণ কম্পিউটারের তুলনায় ডি এন এ-গুলিকে সাঙ্কেতিক কোডে সাজাতে অবশ্য সময় লাগবে ঢের বেশি। তার মূল কারণ নতুন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা না থাকা। তবু চার মাসে ডি এন এ কম্পিউটার থেকে যে-ধরনের ইনট্র্যাকটেবল সমস্যার উত্তর পাওয়া যাবে প্রচলিত কম্পিউটারগুলি জড়ো করেও সে-সমস্যার সমাধান আগামী এক লক্ষ বছরে খুঁজে পাওয়ার আশা নেই। ডি এন এ কোড বহুভাবে সাজানো যায়। ২-কে ৫৬ বার গুণ দিলে যে বিরাট সংখ্যা, ততভাবে। ফলে সাধারণ যন্ত্রগণকের সাহায্যে যদি সেকেন্ডে এক লক্ষ কাজ করা সম্ভব হয় তবে কেবল ডি এন এ কোডগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতেই সময় লাগবে ১০ হাজার বছর।

কেবল কম্পিউটারের ভাষাই নয়, তথ্য সাঙ্কেতিক ব্যবস্থা বা DES-কেও বদলাতে হবে। শুনলে অবাক হতে হয় যে, ডি এন এ গণক অন্তত ৯০৭ ভাবে সবচেয়ে জটিল সাঙ্কেতিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে পারে। অন্য কোনও গণকের পক্ষে তা কল্পনাতীত। এত সুবিধে থাকলেও জিন গণকের একটি বড় অসুবিধে আছে। যে-কোনও জৈব পদার্থের মতো ডি এন এ-ও সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশ নষ্ট হয়ে যায়। প্রচলিত কম্পিউটারের তথ্য ডিস্কে ভরে রাখা যায়। ডি এন এ কম্পিউটারে এখনও সেরকম ভাবনা সফল করা যায়নি। তাই নতুন ধরনের জীবন্ত গণকটির ওপরে এখনই কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের ভরসা কম। কিন্তু আশা প্রচুর।

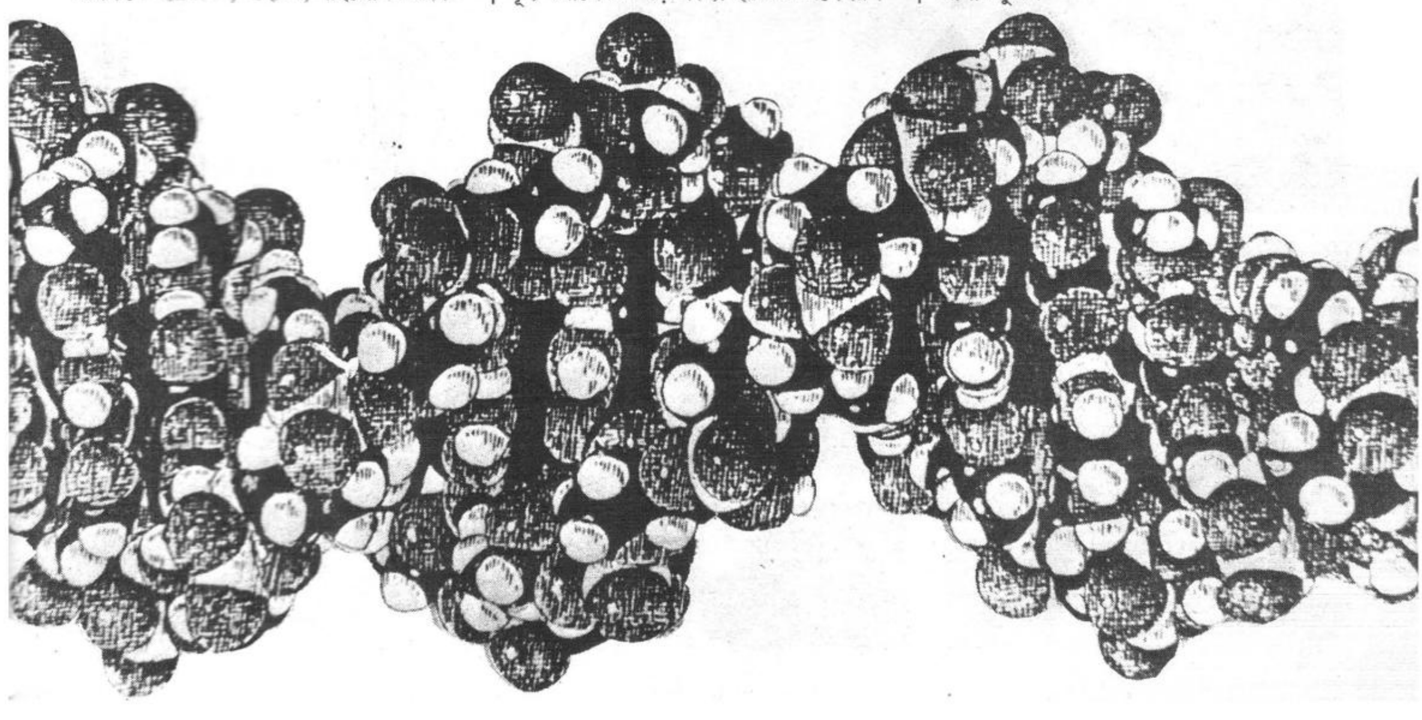

টিনটিন * হার্জে

আশা করি খুব একটা দেরি করে ফেলিনি !
ও, টিনটিন ! জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি, আমাকে সাহায্য করতে এসেছ ?...
আমি... আমি দুঃখিত, ঠিক বুঝতে পারছি না ! মনে হল, আপনি চিৎকার করছিলেন, সাহায্য চাইছিলেন... তাই দৌড়ে এলাম...
সাহায্য চেয়ে চিৎকার করছিলাম ? আমি ? বুঝতে পারছি না !
অদ্ভুত কাণ্ড ! নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিনি... আমি ঠিক শুনেছি ।
পরের দিন সকালে...
আমাকে বিদায় জানাতে এসেছেন, দেখে ভাল লাগল ।
হ্যাঁ, আমরা তো এসেছি...
সত্যি বলতে কী : অবশ্য...
প্রোফেসর এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই । সি.আই.ডি.-র মিঃ টমসন ও মিঃ টমসন... ইনি প্রোফেসর অ্যালেমবিক, সিজিলোগ্রাফার ।
খবর ভাল তো ?
খুব ভাল, ধন্যবাদ ।
বাঃ, নতুন টুপি ?
হ্যাঁ, বেশ স্মার্ট, তাই না ?... খাঁটি ইংলিশ ফেল্ট, হালকা: মাত্র ৩.৯৫ পাউণ্ড । শস্তা !
প্রাগের যাত্রীরা, এদিকে আসুন...
বিদায়, শুভযাত্রা
সিলদাভিয়ায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক !...
ধন্যবাদ
কমপ্রেশন ! পেট্রল অন ! কনটাক্ট !

ওটোকারের রাজদন্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ফুলে বিষের গন্ধ

সমরেশ মজুমদার

ষোলো

মেজর দুলছিলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল খুব, পা শিরশির করছিল। গাছের ডাল বেশ সরু হয়ে এসেছে, আর এগোলে তাঁর ভার রাখতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না। অথচ ফুলটাকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। এতবড় গাছে মাত্র একটি সাদা ফুল ফুটে আছে।

অর্জুনরা চলে যাওয়ার পর কী করে সময় কাটাবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না মেজর। তার ওপর একমাত্র অস্ত্রটি ওকে দিয়ে দেওয়ার পর বেশ অসহায় লাগছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল, ওপরে বেশ রুদ্ধশ্বাস নাটক হচ্ছে এবং তিনি তার সাক্ষী হতে পারলেন না। এইসব ভাবতে-ভাবতে দেখতে পেলেন দুটো লোক পাহাড় থেকে নেমে আসছে গল্প করতে-করতে। ওরা এখানে এসেও বেশ ব্রেকফাস্ট করছে ভাবার পর তাঁর খুব রাগ হল। তবু তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য জঙ্গলের ভেতরে চলে এলেন। খানিকটা হাঁটার পর তাঁর চোখে পড়ল মাটিতে ঘাসের ওপর অনেক মৌমাছি মরে পড়ে আছে। খামোখা এত মৌমাছি দল বেঁধে এক জায়গায় মরতে গেল কেন, বোঝার চেষ্টা করতে তিনি পা মুড়ে বসলেন। আজ পর্যন্ত তিনি কখনওই শোনেননি মৌমাছিরা গণ-আত্মহত্যা করে। এইসব যখন ভাবছেন, ঠিক তখনই তাঁর দাড়িতে কিছু একটা ওপর থেকে পড়ে আটকে গেল। হাত দিয়ে দাড়ির জঙ্গল থেকে যে বস্তুটি টেনে বের করলেন, সেটি একটি মৌমাছির মৃতদেহ। সঙ্গে-সঙ্গে ওপরে তাকালেন তিনি। ঘন পাতা এবং অনেক ডালের ওপরে ঠিক কী আছে তা ঠাহর করতে পারলেন না নীচ থেকে। মৌমাছির চাক থেকে মধু শেষ হয়ে গেলে এরকম হতেও পারে। কিন্তু মেজরের মনে হয়েছিল ব্যাপারটা দেখা উচিত। তাঁর শরীর ভারী, গাছ বেয়ে ওপরে ওঠায় বেশ ঝুঁকি আছে। তবু মেজর উঠতে লাগলেন। তাঁকে বেশ পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। প্রায় ঘোরের মধ্যে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মোটা ডাল সরু হচ্ছে যখন, তখন তিনি দেখতে পেলেন। বেশ বড় গ্ল্যাণ্ডিফ্লোরার মতো একটা সাদা ফুল ফুটে আছে অনেক ওপরে। ফুলটা একদম একা, এই গাছে দ্বিতীয় কোনও ফুল ফোটেনি। তারপর তিনি আবিষ্কার করলেন ওই ডালের কাছাকাছি কোনও পাখি বসেনি, মৌমাছিদের দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। একটা সুন্দর তরতাজা সাদা ফুল, বেশ গম্ভীর ধরনের। হঠাৎ তাঁর মনে হল এই ফুল সেই ফুল হয়তো, যার গল্প তিনি আমেরিকায় বসে শুনেছেন। হওয়া অসম্ভব নয়। মৌমাছিগুলো ঠিক ওর

নীচে মাটিতে মরে পড়বে কেন? নিশ্চয়ই ওই ফুলের গন্ধে বিষ আছে।

মেজর যখন উত্তেজনায় অস্থির, ঠিক তখনই গাছের নীচে এসে দাঁড়াল নীল চ্যাটার্জি। পাহাড়ের ওপর থেকে গাছের ডালে ঝোলা লোকটিকে খুঁজে পেতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। ওপরের দিকে তাকিয়ে মেজরকে তার ভাল্লুকের মতো মনে হল। হাতের অস্ত্রটি উঁচিয়ে সে চিৎকার করল, "অ্যাই? কে তুই?"

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর স্থির হয়ে গেলেন। কোনওমতে মুখটা নীচের দিকে ফেরাতেই তিনি নীলকে দেখতে পেলেন। ওইটুকুনি একটা ছোকরা তাঁকে তুই বলে সম্বোধন করছে শুনেও নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর মনে হল, সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই, অমল সোম বলেছিলেন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে, সেটা ব্যর্থ হল।

মেজরের মুখ দেখামাত্র নীল তাঁকে চিনতে পারল। সে চিৎকার করল, "ঝটপট নেমে এসো, নইলে গুলি চালাব।" অজান্তেই তুই থেকে তুমিতে সরে এল সে।

মেজর বুঝলেন তাঁর আর কিছু করার নেই। ফুলটির দিকে তাকালেন তিনি। এখনও অনেকটা দূরত্বে রয়েছে সেটা। একটা আঁকশি থাকলে টেনে আনা যেত। তিনি ওই অবস্থায় বললেন, "নেমে এলে ফুলটাকে পাওয়া যাবে না।"

"ফুল মানে ? কী ফুল ?" নীচ থেকে নীল চ্যাটার্জি চেঁচাল।

"মনে হচ্ছে ওটা বিষফুল !"

"নেমে না এলে ওই ফুল তোমাকে খাওয়াব চাঁদু।"

"অ্যাই, ওইভাবে কথা বোলো না। তুমি আমার হাঁটুর বয়সী।"

সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাল নীল। একটাই গুলি। সেটা মেজরের ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। মেজরের শরীর কাঁপতে লাগল। ছেলেটা উন্মাদ। তিনি নামার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গাছ বেয়ে ওপরে ওঠা যত সহজ, নামা ঠিক তত কঠিন। দু-দু'বার পড়তে-পড়তে সামলে নিয়ে তিনি আর্তনাদ করলেন, "আমি নামতে পারছি না।"

"ওঠার সময় খেয়াল ছিল না ? ট্রাই, ট্রাই এগেন।" নীল চিৎকার করতেই দুটো লোক ছুটে এল। ওরা গুলির আওয়াজ পেয়েই এসেছে। নীলের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপরের দিকে তাকাতেই দু'জনে হেসে উঠল। নীল বলল, "লোকটাকে নামিয়ে আনো। জলদি।"

অনেক কসরত করে ওরা মেজরকে মাটিতে নামাতে পারল। মেজর তখন থরথর করে কাঁপছিলেন। গাছে চড়া তাঁর অভ্যেস নেই। জামাকাপড়ের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে গেছে।

নীল সামনে এসে দাঁড়াল, "এখানে কেন এসেছ ?"

মেজর হঠাৎ স্মার্ট হয়ে গেলেন, "ফুল, ফুল খুঁজতে।"

"কী ফুল ?"

"বিষফুল।"

প্রচণ্ড জোরে একটা আঘাত এসে পড়ল মেজরের গালে। তিনি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলেন, লোক দুটো ধরে ফেলল।

নীল আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার সেই দুই গোয়েন্দাসঙ্গী কোথায় ?"

মার খাওয়ামাত্র মেজর তাঁর স্বভাব ফিরে পেলেন। প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল তাঁর। তিনি চিৎকার করলেন, "মেরে হাড় ভেঙে দেব বদমাশ ছোকরা। আমার গায়ে হাত তুলেছ ? পাজি, বদমাশ, উল্লুক। বন্দুকটা রেখে খালি হাতে এসো।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুসির ঝড় উঠল। মেজর কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর জামার কলার ধরে টেনে তুলল নীল, "লোক দুটো কোথায় ?"

মেজর কোনওরকমে বললেন, "জানি না।" তাঁর দাড়ি ততক্ষণে রক্তে ভিজে জবজব করছিল।

"জানো না ? আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে।" সে ক্ষিপ্ত হতেই মেজর মিনতি করলেন, "বিশ্বাস করো, আমি ফুলের সন্ধানে এসেছি।"

এবার কী মনে হতে মেজরকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ওপরে তাকাল নীল। তারপর সঙ্গীদের বলল, "লোকটাকে খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখো। হাত

(এর পরে ৪০ পাতায়)

অরণ্যদেব
লি ফক
অরণ্য ওলিম্পিকের প্রধান দৌড় শুরু হল, দর্শকরা চিৎকার করছে...
ওয়াম্বো...লোহান্না... মোরো...কিনিও মির্‌রা... লিসিস্ট্রা
এগোও...
জোরে...
তারপর শুধু অপেক্ষা...
মেয়েদের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে, এটা পুরুষদের পক্ষে ভাল নয়... কেউ-কেউ ফেরে না...
অরণ্য ওলিম্পিক : বিপজ্জনক দশ মাইল দৌড়ে মেয়েরা এই প্রথম যোগ দিল ।
ওয়াম্বো, গত বছর তুমি জিতেছিলে । আমার জন্য তুমি জোরে দৌড়তে পারছ না । এগিয়ে যাও ।
তা হয় না লোহান্না।
আমরা একসঙ্গে দৌড়ব ।
মোরো, দেখতে হবে ওয়াম্বো যেন দৌড় শেষ করতে না পারে ।
ওকে একা পেতে হবে... লোহান্না যেন দেখতে না পায়...
সামনে অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর এক প্রাণী, সে শিকারের গন্ধ পাচ্ছে ।
মোরো একা দৌড়চ্ছে । সে ওয়াম্বোকে ঘৃণা করে, পছন্দ করে লোহান্নাকে । সমস্যা হতে পারে ।
সমস্যা কি ওই একটাই ?
আমি বরং নজর রাখি । আয় ডেভিল ।
সাবধান...
11-21

অরণ্যদেব লি ফক

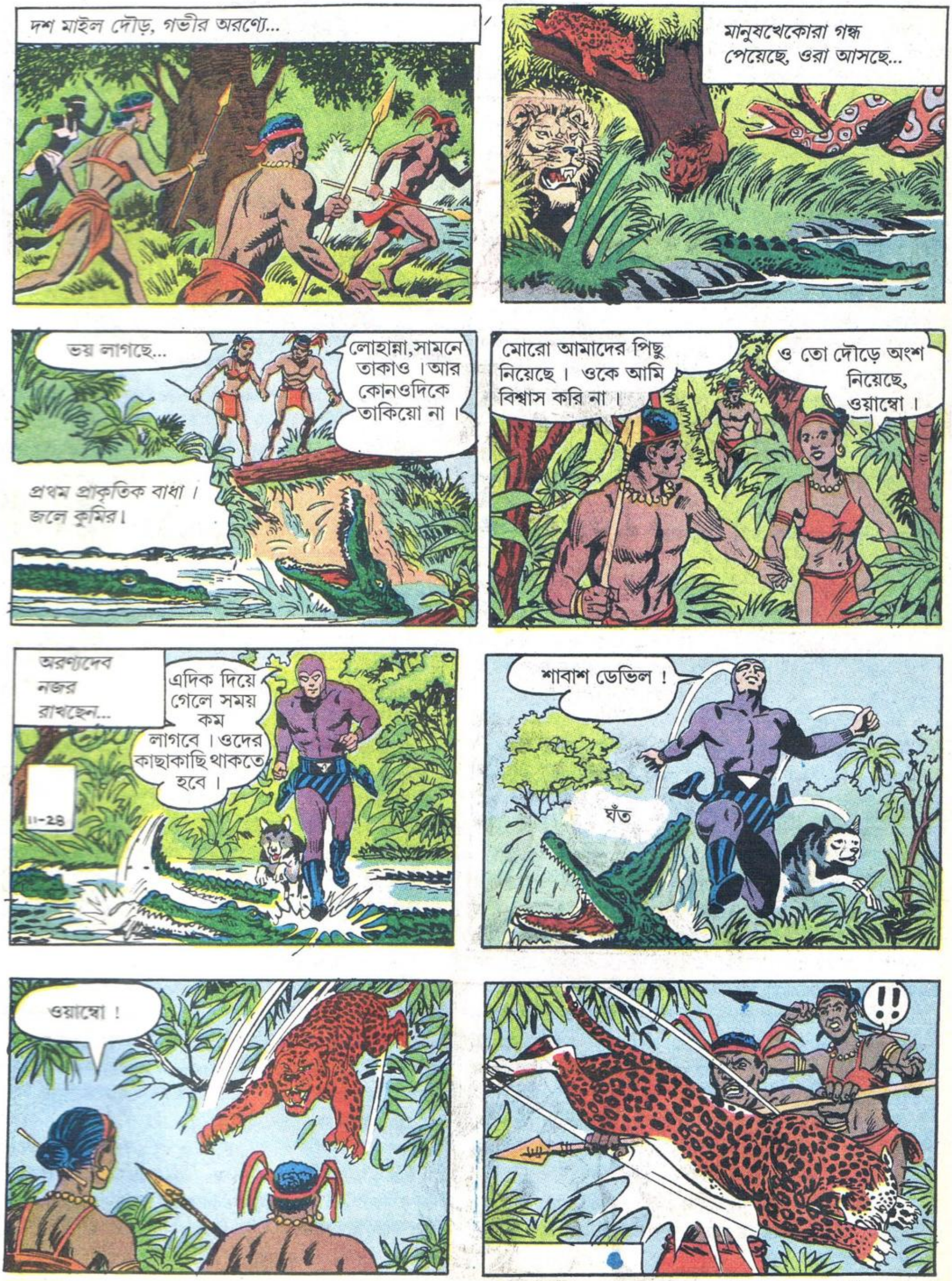

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(৩৭ পাতার পর)

পা বেঁধে রাখবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে লোক দুটো ওঁকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল।

গাছের ডালগুলো লক্ষ করতে-করতে নীল মরা মৌমাছিদের কাছে চলে এসেছিল। ঠিক তখনই ওপর থেকে একটা মৌমাছির মৃত শরীর নীচে নেমে এল। সে মাটিতে তাকাতেই আগের মৃত মৌমাছিদের দেখতে পেল। এতক্ষণে সে অবাক হল। এক লাফে নীচের ডালটা ধরে বন্দুক নিয়ে সে কিছুটা ওপরে উঠতেই পায়ের শব্দ কানে গেল। শব্দটা আচমকা নেমে গেল। গাছের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ওপর থেকে লক্ষ করতে লাগল নীল। তারপর মনে হল ঘোষাল হয়তো নীচে নেমে এসেছে গুলির আওয়াজ শুনে।

অমল সোম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওপর থেকেই তাঁর কানে গুলির আওয়াজ পৌঁছেছিল। কিন্তু নীচের জঙ্গলে এসে মেজর যে গাছটিতে উঠেছিলেন সেই গাছটিকে তিনি চট করে খুঁজে পেলেন না। যখন মনে হল কেউ কাছাকাছি নেই, তখন গাছের আড়াল ছেড়ে পা বাড়ালেন। কিছুটা হেঁটে চাপা গলায় ডাকলেন, "মেজর!"

ডাকটা নীলের কানে পৌঁছল। সে বন্দুক সতর্ক হাতে ধরল। ওপর থেকে অমল সোমকে সে দেখতে পেল। এখন গুলি চালালে লোকটা ঘায়েল হবে। কিন্তু! নীল যা খবর পেয়েছে তাতে অমল সোমকে ভারত এবং ভুটান সরকার পাঠিয়েছেন সারাওদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। এই রকম দায়িত্বশীল লোক মারা গেলে তোলপাড় হবে। মিছিমিছি ঝামেলায় যাওয়া ঠিক হবে না। সে দেখল অমল সোম নিচু হয়ে কিছু কুড়োচ্ছেন। তারপর বোতামটাকে দেখতে পেলেন। লোকটাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে বোতাম নিয়ে। ওটা মেজরের হতে পারে। মার খাওয়ার সময় জামা থেকে ছিঁড়ে যেতে পারে।

অমল সোম এগোচ্ছেন। তারপর চোখের বাইরে চলে গেলেন।

নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে পড়ল নীল। তারপর দ্রুত জঙ্গল পার হয়ে চলে এল তার ডেরায়। মেজরকে তখন খাঁচায় ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করছে তার লোক। সে হুকুম করল, "কালো কাপড়টা দিয়ে খাঁচাটাকে ঢেকে দাও।"

আদেশ মান্য করল ওরা।

একটা ফোল্ডিং চেয়ারে আরাম করে বসল নীল। সে ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। তিন-তিনটে মানুষকে মেরে ফেলা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয় কিন্তু ব্যাপারটা কতদিন চাপা থাকবে সেইটে ভাবার বিষয়। হঠাৎ তার সারাও ধরার ফাঁদটার কথা মনে এল। ওই পাহাড়ের ঠিক নীচে অন্তত কুড়ি ফুট গভীর গর্ত করে ওপরে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। প্রথমবার একটা সারাও ওই গর্তে পড়েছিল। কিন্তু সে-সময় তারা এখানে ছিল না। কয়েকদিন পরে এসে পচা গন্ধ পেয়েছিল। ওপর থেকে নীচে পড়ে ঘাড় মটকে মরে গিয়েছিল জন্তুটা। মরে পচে গিয়েছিল শরীর। ওটা আর কোনও কাজে লাগেনি, আর তারপর থেকে সারাওগুলো যেন ফাঁদটার কথা জেনে গিয়েছিল।

হঠাৎ সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর কণ্ঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক করে একটু তুলে বলল, "মিস্টার সোম, আমি জানি আপনি কাছাকাছি আছেন। আপনার সঙ্গে তো আমার কোনও শত্রুতা নেই। চলে আসুন, কথা বলা যাক।"

অমল সোম প্রায় সেই মুহূর্তেই ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। নীলকে অত স্বাভাবিক গলায় তাঁর উদ্দেশে কথা বলতে শুনে তিনি খুব অবাক হলেন। ওই অল্পবয়সী ছেলেটি এত বুদ্ধিমান?

নীল আবার বলল, "আপনাকে ভাল কফি খাওয়াব। বিদেশি কফি। কই, চলে আসুন। সময় নষ্ট করবেন না। আমি চাইলে আপনার ক্ষতি

করতে পারতাম। এই জঙ্গলটাকে আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি।"

অমল সোম কথাটাকে মেনে নিলেন। তিনি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে-সঙ্গে নীল তাঁকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল, "আসুন, আসুন।"

অমল সোমকে একটা চেয়ার দেওয়া হল। নীল বলল, "কী ব্যাপার? আপনারা সবাই দল বেঁধে এখানে চলে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। আপনি এখানে?"

"পিকনিক করতে। টানা কাজ করে-করে ক্লান্ত। একটু রিল্যাক্স করতে না পারলে আর চলছিল না।" নীল হাসল, "কিন্তু এখানে এলেন কীভাবে?"

"হেঁটে।"

"মাই গড। এতটা পথ হেঁটেছেন?"

"প্রয়োজনে অনেক কিছু করতে হয়।"

"মিস্টার সোম, আপনার প্রয়োজন কি আমার পেছনে লাগা?" হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল নীল। তার গলার স্বর শক্ত হয়ে গেল।

"আমি আমার কাজ নিয়ে এসেছি। সেটা যদি আপনার ক্ষতি করে তা হলে আমার কোনও উপায় নেই। মেজর কোথায়?"

"কে মেজর?"

"যাঁকে গাছে উঠতে দেখে আপনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন।"

"আচ্ছা! দেখুন গিয়ে, গাছে-গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"আমি উত্তরটা আশা করছি।"

"মিস্টার সোম, আশা তো প্রত্যেক মানুষই করে। আশা পূর্ণ হয় কতজনের? আপনাকে আমি অনুরোধ করছি এখনই এই জঙ্গল থেকে চলে যান। আপনাদের যাওয়ার ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।"

"তাই? না ভাই, আগে সারাওদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি, তারপর ফিরে যাওয়ার কথা ভাবব। ওই নিরীহ প্রাণীগুলোকে বিদেশের বাজারে পাঠিয়ে যারা মুনাফা লুটবে, তাদের ছেড়ে দিই কী করে বলুন? মেজর কোথায়?"

প্রায় কুড়ি সেকেন্ড অমল সোমের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে নীল জবাব দিল, "উনি বিষফুল খুঁজতে গিয়েছেন। বিষফুল বলে কিছু আছে বলে বিশ্বাস করেন?"

"আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে কিছু এসে যায় না। কিন্তু মেজরকে আমি এখানকার কোনও গাছে উঠতে দেখেছি। এত তাড়াতাড়ি তিনি কোথাও যেতে পারেন না।"

"আপনি যখন সবই জেনে বসে আছেন, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?"

অমল সোম চারপাশে তাকালেন। তাঁর চোখ সেই খাঁচার দিকে গেল যেটা কালো কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। তিনি হেসে বললেন, "কালো কাপড়ে ঢাকলেই কি আর আড়ালে রাখতে পারবেন নীলবাবু ?"

"চেষ্টা করতে দোষ কী !" নীল উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে হাততালি দিল। সঙ্গে-সঙ্গে দুটো লোক সামনে এসে দাঁড়াল। নীল জিজ্ঞেস করল, "সাহেবকে পৌঁছে দিয়ে এসেছ ?"

"জি সাব।"

"ঠিক আছে, যাও।" নীল ঘুরে দাঁড়াল, "সময় যদি নষ্ট করতে না চান তা হলে আপনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন।"

অমল সোম কালো কাপড়ে ঢাকা খাঁচাটার দিকে তাকালেন। এদের পক্ষে জন্তুটাকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা সহজ, কিন্তু নীল নির্দেশ না দিলে নিশ্চয়ই সেটা করবে না। তাই আগে মেজরের দেখা পাওয়া দরকার। তিনি মাথা নাড়লেন, "বেশ, চলুন।"

নীল বন্দুক হাতেই এগোচ্ছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, "আপনি ওই পথ ধরে আগে চলুন। বুঝতেই পারছেন, এই মুহূর্তে আপনাকে আমি শত্রু ভাবছি। শত্রুকে কেউ পেছনে রাখে না।"

অমল সোম হাসলেন এবং এগিয়ে চললেন।

সরু পথ। এখানে অবশ্যই আগে কোনও পথ ছিল না। হাঁটাহাঁটি করে সরু পথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। অমল সোম ভাবছিলেন, হঠাৎ এই পথ দিয়ে ওরা যাওয়া-আসা করছে কেন ?

নীল বলল, "বিষফুল আছে বলে আপনার বন্ধু এদিকে এসেছেন, আপনি ওঁকে বিশ্বাস করেন ? ওঁর আসার পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই তো ?"

অমল সোম বললেন, "থাকলে সেটা ভবিষ্যতে জানা যাবে।"

কথাটা বলেই অমল সোম দাঁড়িয়ে গেলেন। পথটা নেই। পায়ের দাগ মিলিয়ে গিয়েছে অথচ মরা ঘাস রয়েছে সামনে। এবং তখনই তিনি পেছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। নিজেকে সামলাতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে চলে গেলেন সামনে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘাসের গালিচা দুলতে লাগল। দু'হাতে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেই ব্যর্থ হলেন তিনি। তাঁর শরীরটা সরাসরি নীচে নেমে যেতে লাগল।

মাটিতে আছাড় খেয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে রইলেন তিনি। কোমর এবং গোড়ালিতে আঘাত লাগায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু অনেক ওপরে তাঁর পড়ে যাওয়ার গর্ত দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। নীল চ্যাটার্জির গলা শুনতে পেলেন তিনি, "এখন কয়েকদিন ওখানেই থাকুন। বাতাস যাতে পান তাই ফাঁকটা বন্ধ করছি না। কিন্তু কোনও সারাও যদি আপনার সঙ্গী হয় তা হলে তার থেকে দূরে থাকবেন।"

অমল সোম জবাব দিলেন না। নীলের গলা আর শোনা গেল না। তিনি বুঝতে পারলেন এই ফাঁদ পাতা হয়েছিল সারাও ধরার জন্য। গর্তটা গভীর। একটু নড়াচড়া করতে বুঝতে পারলেন চওড়া বেশি নয়। হাত লাগাতেই মাটি খসে পড়ল কিছুটা। এই দেওয়াল বেয়ে কী করে ওপরে ওঠা যায় ! একবার ভাবলেন, চিৎকার করবেন। জোরে চিৎকার করলে নিশ্চয়ই সেটা অর্জুনদের কানে পৌঁছবে। যদি না পৌঁছয় তা হলে খামোখা পরিশ্রম হবে।

খাঁচার মধ্যে তেমন অন্ধকার ছিল না। বাইরের কালো কাপড়ের আড়াল ঘন ছায়া ফেলেছিল মাত্র। হাঁটু মুড়ে পড়েছিলেন মেজর। জ্ঞান হওয়ামাত্র উঠে বসতে গেলেন। সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা শুরু হতেই বুঝলেন তাঁর হাত-পা এখন বাঁধা। তিনি চিৎকার করলেন, "অ্যাই, কে আছ এখানে ? চটপট চলে এসো। আমাকে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে রাখার মানে কী ? হ্যাঁ ! অ্যাই !"

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। বরং খট খট আওয়াজ কানে এল। তিনি মুখ ফেরাতেই জন্তুটিকে দেখতে পেলেন। খাঁচার অন্য কোণে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা তাঁর দিকে ফেরানো। নিজের দুর্দশায় আর একটি প্রাণীকে পড়তে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছে। মেজর কিছুক্ষণ তাকানোর পর যখন বুঝতে পারলেন প্রাণীটি সারাও, তখন বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বিদেশে এর দাম এখন অনেক। যদিও প্রাণীটির শরীর এখনও রঙে ভেজা, তবু ওর গায়ে হাত বোলাতে খুব ইচ্ছে হল তাঁর। একটু এগোতেই যেভাবে ওটা মাথা নামিয়ে শিং খাড়া করল, তাতে সাহস পেলেন না তিনি।

মেজর জিভ দিয়ে একটা শব্দ করলেন। সেটা শোনামাত্র সারাও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল। একটু অপমানিত হয়ে চোখ বন্ধ করতেই আচমকা ফুলটার কথা মনে এল। বিষফুল। এখনও ফুটে রয়েছে। ওটা নির্ঘাত বিষফুল, নইলে মৌমাছিরা মরবে কেন ? ওই গাছে দ্বিতীয় কোনও ফুল ফোটেনি। বৃষ্টি বা ঝড়ে যদি ফুলটা পড়ে যায়, তা হলে মহামূল্যবান জিনিস তিনি হারাবেন। তা ছাড়া ওই ফুলের আয়ু কতক্ষণ, তাও তো তাঁর জানা নেই।

মেজর চিৎকার শুরু করলেন। দু'বারের পর একটা লোক কাপড় সরিয়ে উঁকি মারল, "অ্যাই চোপ্। পাঁঠার মতো চেঁচাচ্ছে। অথচ পাঁঠাটা চুপ করে আছে।"

কাপড় আবার ঠিক হয়ে গেল। মেজর এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, কয়েক সেকেন্ড তাঁর চিন্তাশক্তিও অসাড় হয়ে গেল। হঠাৎ তাঁর কানে গাড়ির শব্দ ঢুকতে তিনি নিজেকে ফিরে পেলেন। গাড়িটা এসে থামল একেবারে কাছে। দরজা খোলার শব্দ হল। তারপর একটা মহিলাকণ্ঠ কানে এল, "নীল কোথায় ?"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

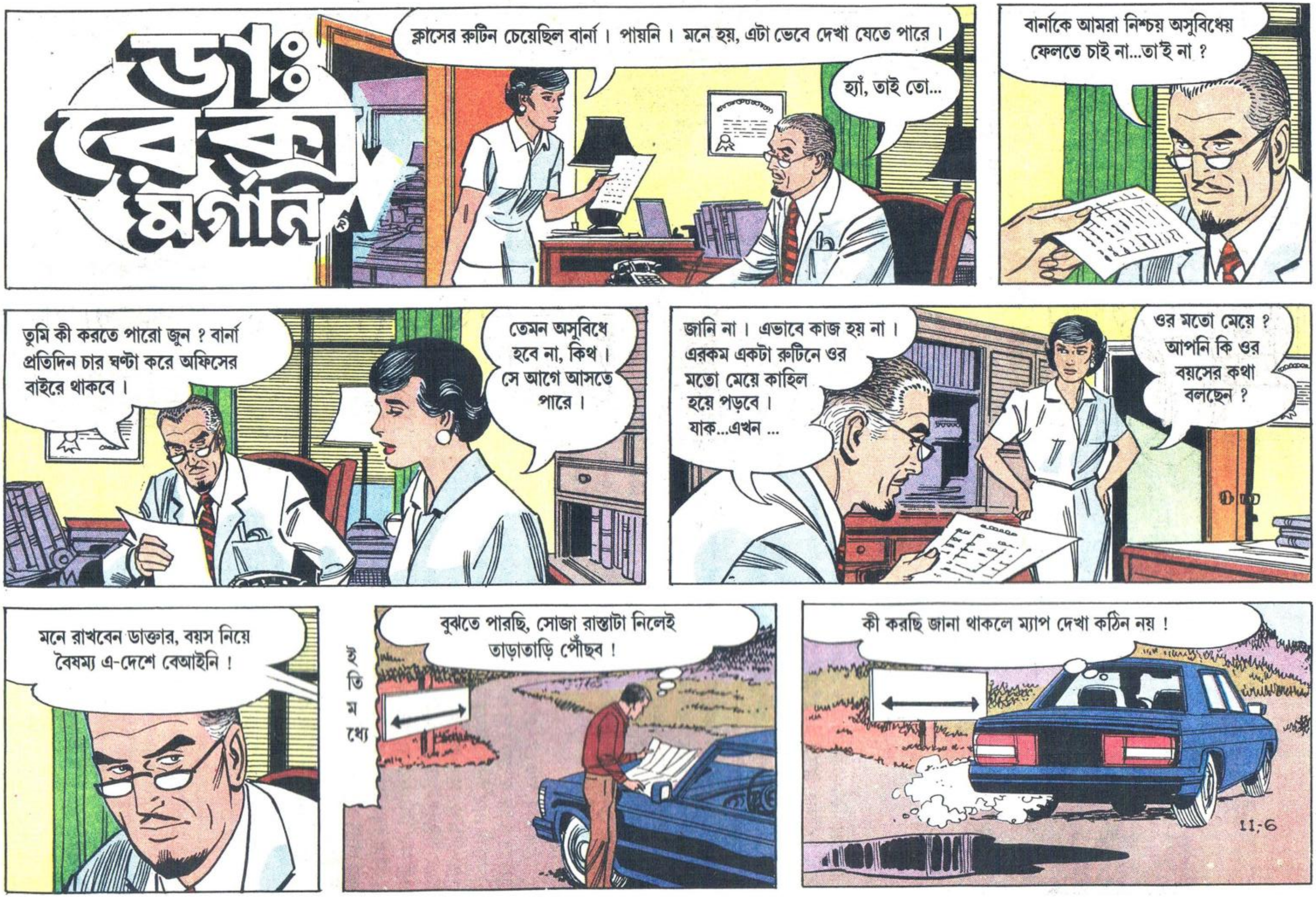
ডাঃ রেক্স মর্গান
ক্লাসের রুটিন চেয়েছিল বার্না । পায়নি । মনে হয়, এটা ভেবে দেখা যেতে পারে ।
হ্যাঁ, তাই তো...
বার্নাকে আমরা নিশ্চয় অসুবিধেয় ফেলতে চাই না...তাই না ?
তুমি কী করতে পারো জুন ? বার্না প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে অফিসের বাইরে থাকবে ।
তেমন অসুবিধে হবে না, কিথ । সে আগে আসতে পারে ।
জানি না । এভাবে কাজ হয় না । এরকম একটা রুটিনে ওর মতো মেয়ে কাহিল হয়ে পড়বে । যাক...এখন ...
ওর মতো মেয়ে ? আপনি কি ওর বয়সের কথা বলছেন ?
মনে রাখবেন ডাক্তার, বয়স নিয়ে বৈষম্য এ-দেশে বেআইনি !
ইতিমধ্যে
বুঝতে পারছি, সোজা রাস্তাটা নিলেই তাড়াতাড়ি পৌঁছব !
কী করছি জানা থাকলে ম্যাপ দেখা কঠিন নয় !
11-6

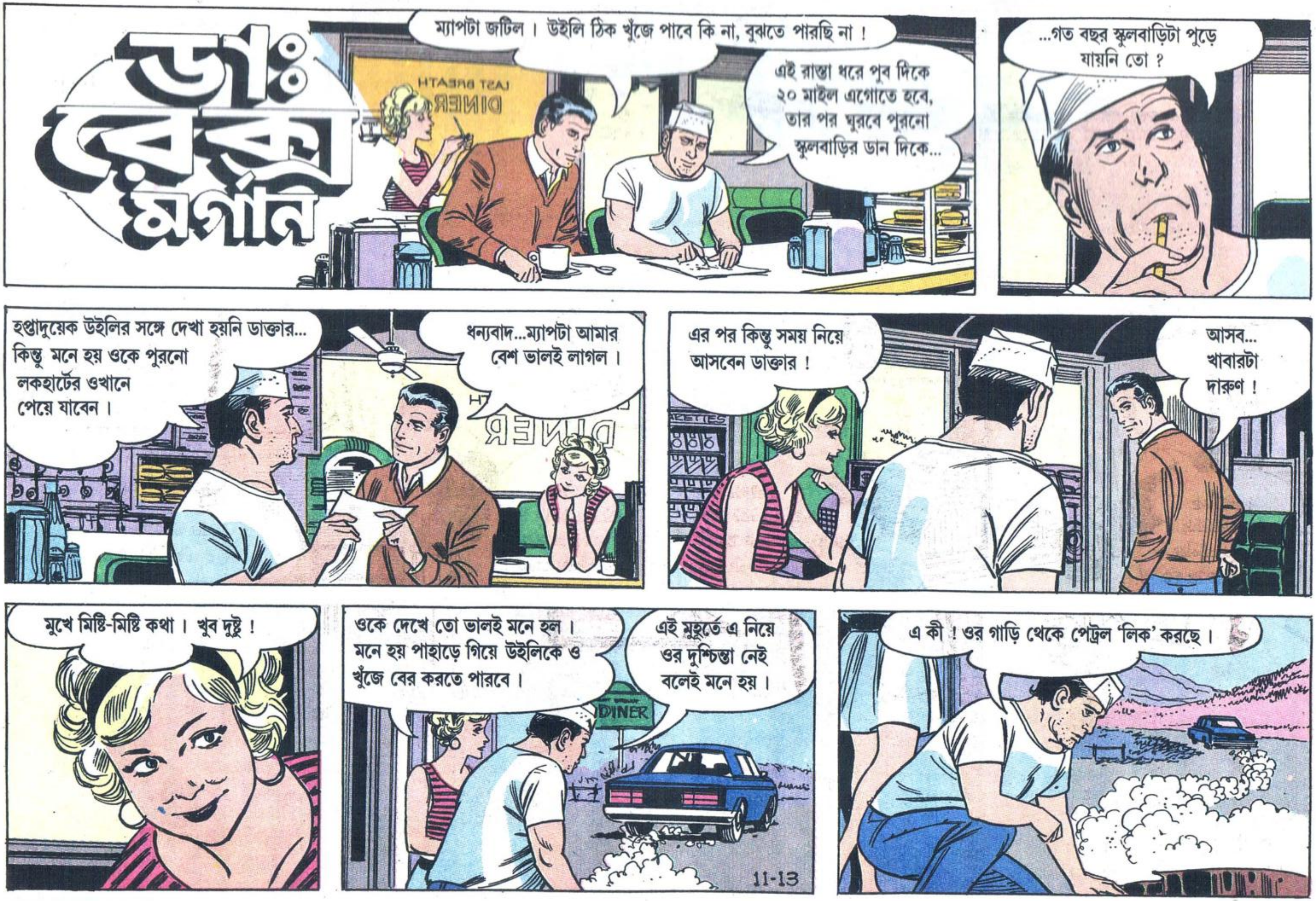
ডাঃ রেক্স মর্গান
ম্যাপটা জটিল। উইলি ঠিক খুঁজে পাবে কি না, বুঝতে পারছি না!
এই রাস্তা ধরে পুব দিকে ২০ মাইল এগোতে হবে, তার পর ঘুরবে পুরনো স্কুলবাড়ির ডান দিকে...
...গত বছর স্কুলবাড়িটা পুড়ে যায়নি তো?
হপ্তাদুয়েক উইলির সঙ্গে দেখা হয়নি ডাক্তার... কিন্তু মনে হয় ওকে পুরনো লকহার্টের ওখানে পেয়ে যাবেন।
ধন্যবাদ...ম্যাপটা আমার বেশ ভালই লাগল।
এর পর কিন্তু সময় নিয়ে আসবেন ডাক্তার!
আসব... খাবারটা দারুণ!
মুখে মিষ্টি-মিষ্টি কথা। খুব দুষ্টু!
ওকে দেখে তো ভালই মনে হল। মনে হয় পাহাড়ে গিয়ে উইলিকে ও খুঁজে বের করতে পারবে।
এই মুহূর্তে এ নিয়ে ওর দুশ্চিন্তা নেই বলেই মনে হয়।
DINER
11-13
এ কী! ওর গাড়ি থেকে পেট্রল 'লিক' করছে।

সরষের মধ্যে ভূত

শিবতোষ ঘোষ

নকুলের সরষে গাছে বেল ফলেছে। তার অভ্যেস খেতের চারপাশে রোজ একবার অন্তত এসে ভালভাবে ঘুরে-ঘুরে দেখা। তেমনই দেখছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা সরষে গাছে দুশো বা আড়াইশো গ্রামের মতো একটা বেল ঝুলছে।

নকুল ঘাবড়ে যায়, সরষে গাছে বেল ! মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ দুটো কচলে নেয়। আলের ওপর থেবড়ে বসে নকুল বেল ও সরষে গাছের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। খেতে নেমে যে বেলের কাছে যাবে সে সাহসও হচ্ছে না, যদি অন্য কিছু হয় ! কী অন্য কিছু ? বলা যায় না আজকাল বোমা-পটকার যুগ !

কিছুদিন আগে শম্ভুর ছাগল তার সরষে খেতে নেমে টপাটপ গাছ মুড়ে-মুড়ে খাচ্ছিল, সে খুব বকেছিল শম্ভুকে, ছাগল টেনে নিয়ে খোঁয়াড়ে ভরে দেবে বলেও তাকে শাসিয়েছিল। নকুল মনে-মনে ঠিক করে নেয়, ও নিশ্চয় শম্ভুরই কাণ্ড, সে রেগে গিয়ে তার পুরো সরষে খেতটাই উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বোমা বেঁধে দিয়েছে। শম্ভুর সঙ্গে খড়্গপুরের অনেক বদমাশ-গুণ্ডার দহরম আছে।

নকুল আর খেতের আলেও দাঁড়াতে সাহস পেল না, বোমার সামনে দাঁড়ানো মানে মৃত্যুর সামনে দাঁড়ানো।

নকুল বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়, কিন্তু কিছু বলার আগেই সে হাউ-হাউ করে একচোট কেঁদে ফেলে। মন্দার বুঝতে পারে না, সকালে খেতে গেছে, ফিরে এসেই হঠাৎ অমন কাঁদছে কেন ? মন্দার রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করে, "আঃ, কী হল কী ? অমন করে কাঁদছ কেন ?"

নকুল বলে, "আমাদের সরষে খেতে কে বোমা বেঁধে রেখে গেছে, গোটা খেতটাই উড়ে যাবে ! আহা, কী ফলন হয়েছিল এবার, বোমায় উড়ে যাওয়ার জন্য ভগবান দিয়েছিলেন, আ-হা-হা ...।"

মন্দার অবাক হয়ে যায়, "সরষে খেতে বোমা বেঁধে দিয়েছে ?"

"ও শম্ভুর কাজ ! সেদিন ছাগলের জন্য তাকে খুব ধমকেছিলাম তো, তাই ! শম্ভু, তুই এভাবে শোধ নিলি রে !"

আবার কাঁদতে যাচ্ছিল নকুল, মন্দার ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়, "চুপ করো, বোমার দাম তো অনেক, শম্ভু এত খরচ করে ... এত টাকা সে পাবেই-বা কোথায় ? চলো তো কোথায় বোমা, আমাকে দেখাবে।"

"তুমি খেপেছ, বোমার কাছে কেউ যায়, না, না !"

"ওটা যে বোমা, তুমি বুঝলে কী করে ?"

"সরষে গাছে তো আর সত্যি-সত্যি বেল হবে না, আর কেউ নিয়ম না মানুক প্রকৃতি নিয়মে চলে। প্রকৃতির নিয়মে বেল গাছে বেল, সরষে গাছে সরষে। বলি দুশো-আড়াইশো গ্রামের সরষে আজ পর্যন্ত হয়েছে কোথায় !"

"কিন্তু সরষে খেত বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতেও তো কেউ দেখেনি। দশ কাঠা সরষে খেত ওড়াতে বোমা লাগে না, পাঁচটা গোরু ছেড়ে দিলেই হল ! রাতের বেলা পাঁচটা গোরু টেনে এনে ছেড়ে না দিয়ে শম্ভু বোমা বাঁধতে গেল ! না, না এ আমার বিশ্বাস হয় না !"

মন্দার শুনল না, সে নকুলের আগে-আগেই হাঁটতে লাগল। নকুল পেছনে-পেছনে আসছে ঝুপঝুপ করে।

নকুল আলের ওপর থেকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাচ্ছে মন্দারকে, "ওই দ্যাখো।"

মন্দার বাচ্চা মেয়ের মতো উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে আর খিলখিল হাসে, বলে, "ও মা সত্যি তো, সরষে গাছে কী সুন্দর পাকা বেল !"

মন্দার খেতে নামছে দেখে নকুল বাধা দেয়, "তুমি যেয়ো না, আমি বরং পুলিশে খবর দিই, পুলিশ এসে যা করার করবে !"

কিন্তু মন্দার শুনল না, "পুলিশ বেল পাড়বে,

যেমন বুদ্ধি !"

বাধ্য হয়ে নকুলকেও খেতে নামতে হল। স্ত্রীকে বিপদের মুখে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বড্ড লজ্জা লাগল তার।

মন্দার সরষে গাছের কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে বাচ্চার দু' গালে সযতনে আদর করার মতো বেলের দু' গালে আদর করতে থাকে।

মন্দার বলে, "এ তো বেল নয়, সরষে !" সে খিলখিল করে হাসতে-হাসতে বলে, "জানো, মনে হচ্ছে, আমি যেন কোনও বাচ্চার কোমল গালে হাত বোলাচ্ছি !"

নকুল মন্দারের হাত ধরে টানাটানি করে, বলে, "পালিয়ে এসো, পালিয়ে এসো, বলেছি না এ অন্য কিছু !"

কিন্তু ওর হাত এত তেল-জবজবে কেন ? নকুল চমকে যায়। নকুল বলে, "তোমার হাত দুটো মেলো তো !" মেলে দেখে তার দু' হাতই ভর্তি সরষে তেলে। দু'জনে নাকে শুঁকেও দেখল, একেবারে খাঁটি সরষে তেলের গন্ধ। সাহস পেয়ে নকুলও সরষের গায়ে হাত বুলোয়, তার হাতও জবজবে হয়ে যায় সরষে তেলে। দু'জনে পরপর হাত বোলাতে থাকে, যত হাত বুলোয় তত তেল ! মন্দার বলে, "বুঝতে পারছি এই তেলের জন্যই মনে হচ্ছিল কোনও বাচ্চার গালে হাত দিয়েছি। আঃ, এখন কী যে ভাল হল না, আর আমাকে বেগুনভাজা, আলুভাজা, পটলভাজা করতে তেল খরচ করতে হবে না, এই সরষের গায়ে দু'বার বুলিয়ে নিয়ে কড়ায় ছেড়ে দেব !"

এত দামি জিনিস খেতের মধ্যে রেখে যেতে তাদের সাহস হল না। নকুল দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে কোদাল নিয়ে এল, শেকড়সুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে একটা বড় টব কিনে এনে সার-জল দিয়ে ঘরের মাঝখানে দেবতার মতো সরষে গাছটাকে বসিয়ে দিল তারা। গাছটার প্রতি তাদের এখন এত ভালবাসা যে, পারলে যেন দু'জনে তালপাতার পাখা এনে গাছটাকে হাওয়া করে।

শুধু ভাজাভুজি নয়, এক সপ্তাহ ধরে রান্নার জন্য একফোঁটা তেল কিনল না নকুল। আশ্চর্য এক যন্ত্র পেয়ে গেছে তারা। সরষের গায়ে সামান্য একটু চাপ দিলেই ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়তে থাকে তেল, নিমেষে বাটি ভর্তি, আর সদ্য ঘানিতে মাড়াই সরষের তেলের মতো স্বাদ ও গন্ধ।

এখন শীতকাল। শীতকালে কাক নাকি মানুষের রূপ কেড়ে নেয়। নকুল মনে-মনে বলে, "নেওয়াচ্ছি ! এতদিন পয়সা খরচ করে তেল কিনতে হত বলে ভেবেচিন্তে তেল মাখতে হত, ছেলেমেয়েকেও ভেবেচিন্তে মাখাতাম।" এখন নকুল তেলেই নিজেকে চুবিয়ে নেয়, ছেলেমেয়েদের তো কথাই নেই, মন্দার মাখালেও তার পছন্দ হয় না, সে দৌড়ে একটা বাটি নিয়ে গিয়ে চেপে ধরে সরষেটাকে, দেখতে-দেখতে বাটি ভর্তি হয়ে যায়, তেলেই স্নান করিয়ে দেয় বাচ্চা দুটোকে। এখন নকুলের পরিবার, মানে তৈলাক্ত পরিবার, তাদের ঘটি-বাটি, এমনকী ঘরের খুঁটিও ধরে রাখা যায় না, তেলতেলে, হড়কে যায়।

॥ ২ ॥

মন্দার একদিন একনাগাড়ে খানিকক্ষণ চেপে ধরল সরষেটাকে, নীচে একটা আড়াই কেজির অ্যালুমিনিয়মের ঘটি পেতে দিয়েছে।

"ও মা গো !"

লাফিয়ে ওঠে মন্দার। এ যে দেখতে-দেখতে অত বড় ঘটি ভর্তি হয়ে গেল !

সেদিন মন্দার দু'বার তেল বের করল আড়াই কেজি করে। কে জানে ভগবান জানে, আরও চেপে থাকলে আরও তেল বেরোত কি না ! বেশি চাপতে ভয় হল ! মনে-মনে বলল, "না বাবা, বেশি লোভ ভাল নয় !"

কিন্তু মানুষের লোভই একমাত্র সত্য। শুধু মানুষ কেন, যার প্রাণ আছে তারই লোভ থাকে, গাছেরও লোভ আছে, শেকড়ে লোভ সঞ্চার করতে না পারলে সে গাছ চট করে বাড়তে পারে না। মাছের গায়ে হড়হড়ে পদার্থটা না থাকলে যেমন মাছ হয় না, তেমনই প্রাণের গায়েও লোভ নামে একটা পদার্থ থাকে।

মন্দার পড়াশোনা-জানা মেয়ে, সে এরকমভাবেই এত ভাবল, এবং পরের দিন নকুলকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসল একটা বিশাল চোদ্দ কেজির জল রাখা প্লাস্টিকের বালতি নিয়ে তেল নিষ্কাশন করতে।

নকুল বলে, "মন্দার, আমি বলি কি, আড়াই কেজি করে দু' বেলায় পাঁচ কেজি যখন বেরোচ্ছে তখন এই থাক, বেশি চাপ না দেওয়াই ভাল ! হিতে বিপরীত হতে পারে !"

মন্দার বলে, "তোমার যেমন বুদ্ধি, যতটা তেল বেরোবে বের করে নিতে হবে, না হলে অত দামি তেলটাই নষ্ট হবে !"

তেল বের করতে বসল দু'জনে। সরষেটাকে ধরে একবার মন্দার চাপ দেয়, চাপ দিতে-দিতে হাত অবশ হয়ে এলে নকুলকে দেয়, নকুলও চেপে-চেপে কেজি পাঁচেক তেল বের করে আবার এগিয়ে দেয় মন্দারকে। এভাবে ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে অত বড় চোদ্দ কেজির বালতি ভরাট হয়ে যায়। এর পর লোভ মানল না, সকালে এক বালতি তো ফের বিকেলে এক বালতি। দেখতে-দেখতে কয়েকদিনের মধ্যেই তেলে থইথই করতে লাগল তাদের সারা ঘর, এমনকী, ডাল-পোস্ত কেনা মুদি দোকানের পলি ব্যাগের মধ্যেও তেল। নকুল তো একদিন বিরক্ত হয়ে গ্লাসভর্তি তেল ফেলে দিল উঠোনে, কী করবে আর খালি গ্লাস নেই, জল তো খেতে হবে !

মন্দার একদিন নকুলকে বলল, "শোনো, তেল বিক্রি করো !"

সে ভয় পায়, "সে কী ! লোকে জিজ্ঞেস করলে কী বলব ?"

"তোমার যেমন বুদ্ধি ! আমাদের তো চুরির তেল নয়, আমাদের খেতের ফসল। লোকে যদি বিশ্বাস না করে তবে দেখে যাক ! আর অত লুকোতে হবে না, তুমি আগামীকাল পাঁচ টিন তেল ঘণ্টুর দোকানে দিয়ে এসো !"

প্রথম দিন নকুলকে ভ্যান-রিকশায় বসিয়ে পাঁচ টিন তেল নিয়ে যেতে দেখে কেউ-কেউ বিস্মিত হয়ে বলাবলি করল, "নকুলের এ-বছর

(এর পরে ৪৮ পাতায়)

অ্যাসটেরিক্সের অভিযান

অ্যাসটেরিক্স ও সোনার কাস্তে

গল্প : গোচিনি
ছবি : ইউদেরজো

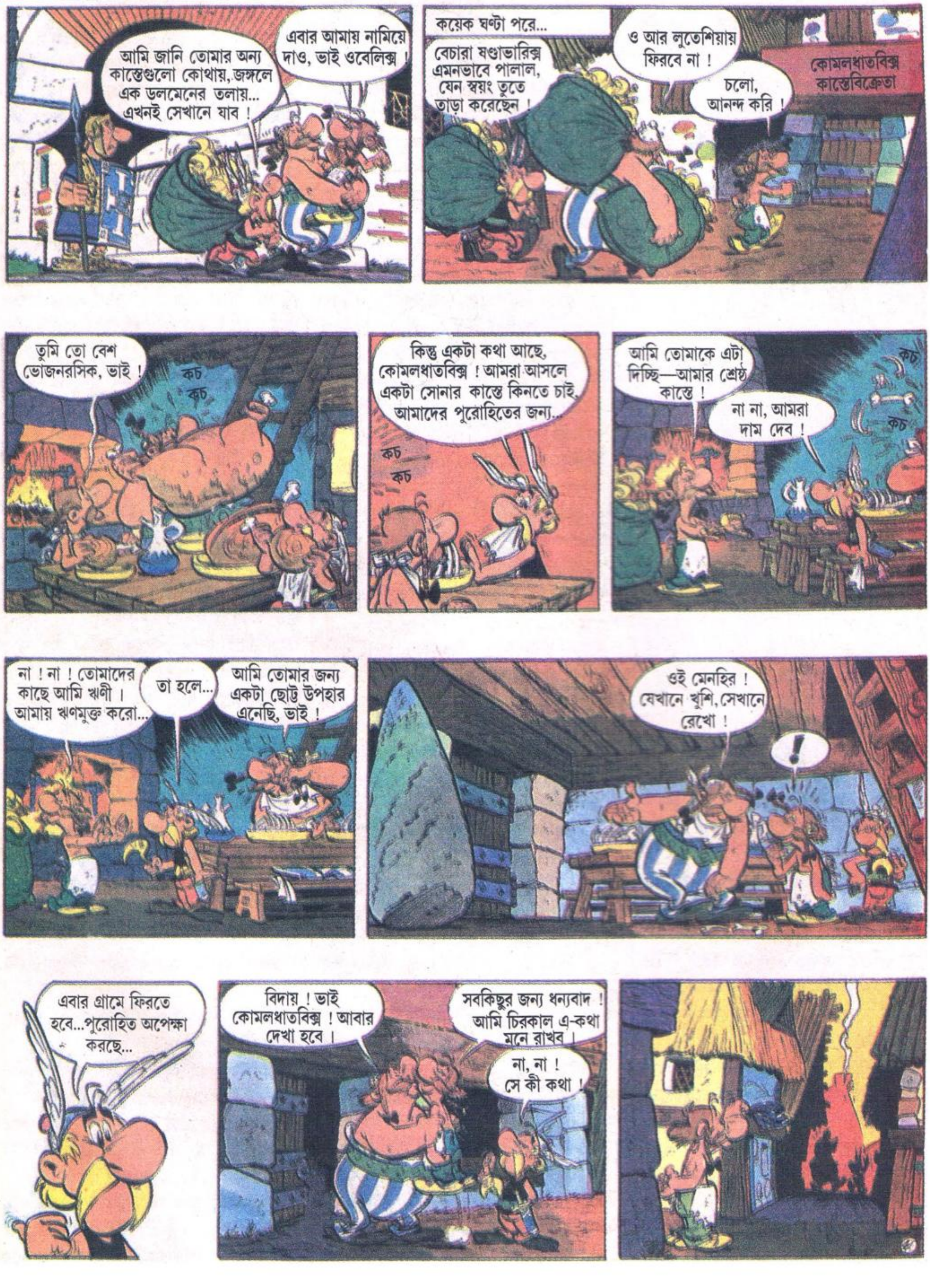

অ্যাসটেরিক্স ও সোনার কাস্তে

কপিরাইট : দারগো এডিশন

(৪৫ পাতার পর)

দারুণ সরষে ফলেছে গো,পাঁচ টিন তেল নিয়ে গেল বেচতে !" ফেরার পথে তাকে ঘিরে ধরে চার-পাঁচজন, "দশ কাঠায় কত ফলন হল গো নকুলদা, পাঁচ টিন তেল নিয়ে গেলে দেখলাম !"

একজন তো সরাসরি বলেই ফেলে, "মনে হচ্ছে আমাদের নকুলেশ্বর তেলের খনিই পেয়ে গেছে !"

নকুলের পাশের সুকান্তের ঠাকুমা উঠোনে তেল-ভিজে দেখে বললেন, "তোদের কি তেলের গাছ আছে নাকি বাছা ? এতখানা তেল মাটিতেই ঢেলে দিলি !"

মন্দার কিছু বলল না। নকুল বলে, "পড়ে গেল কাকিমা !"

বৃদ্ধা হাত নেড়ে বললেন, "মানুষের চার আনার নুন পড়ে গেলে এমন মাতাই করে যে পাড়ার সকলে জেনে যায়, আর তোদের প্রায় চার হাত জায়গা জবজবে হয়ে ভিজে গেল তেল পড়ে গিয়ে, অথচ তোদের কাউকে তো একবারও হা-হুতাশ করতেও দেখলাম না রে !"

দ্বিতীয়বার তেল বেচতে যাওয়ার সময় নকুল আরও ভয় পাচ্ছে, আর এবারই তো শেষ নয়, এর পরও কতবার যে যেতে হবে ... চাপ দিলেই তেল সুতরাং এর তো শেষ নেই ! কিন্তু বলে দিয়েই নকুল জিভ কাটে, বালাই ষাট,বালাই ষাট, তেল তাদের লক্ষ্মী। আর লক্ষ্মী ! লোকের কথা শুনে-শুনে নকুল বিরক্ত।

কিন্তু মন্দার ছাড়ল না, "আমাদের তেল আমরা বেচব, ভয়টা কাকে ? তুমি না গেলে, আমি যাব।"

মন্দার নকুলকে শিখিয়ে দেয়, "তুমি বলবে আমি কার তেল চুরি করেছি আপনারা দেখান ! জানান পুলিশকে, পুলিশের সামনেই আমি দেখিয়ে দেব আমার তেল আছে কি না !"

॥ ৩ ॥

খুনি, চোর, ডাকাত, প্রতারক ঘুরে-ফিরে এই হল অপরাধী। বড় একঘেয়ে লাগে থানার দারোগাবাবুর। তিনি যখনই শুনলেন তেলের কেস, এবং এ কেরোসিন নয়, সরষে তেল, তখন মনে-মনে লাফিয়ে উঠলেন। অভিযোগ, একজন রোজ পাঁচ টিন করে তেল বেচে যাচ্ছে তো বেচেই যাচ্ছে। কেরোসিন হলে না হয় কথা ছিল, অনেক ক্ষেত্রে কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে চিৎকার, 'কেরো বেরিয়েছে, কেরো বেরিয়েছে !' লোকজন নিয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছে ইট দিয়ে ঘিরে দুই কনস্টেবল বসিয়ে তবে ছুটি। কিন্তু তারপর সব ভোঁ-ভাঁ, গর্ত খুঁড়লে শুধু কাদা বেরোয়, চার-পাঁচ মাস কনস্টেবলদের বেতন গোনাই সার। এখানে অন্য কেস, সরষে তেলের কেস।

ছোট কনস্টেবল জিপে উঠতে-উঠতে বললেন, "বড়বাবু, সরষে তেলের কেস শুনলাম, সঙ্গে দু-পাঁচ লিটারের 'জারিকেন' নিয়ে নিলে হত না !"

দারোগাবাবু ধমক দেন, "তেল পাওয়া গেলে জারিকেন ও পাওয়া যাবে, ওঠো !"

সমস্ত গ্রামবাসী আজ নকুলের বাড়িতে, কী করে চাউর হয়ে গেল অতিরিক্ত তেল বেচার জন্য তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। তার এত তেল কারও সহ্য হচ্ছিল না, "কেন, আমরাও তো সরষে চাষ করেছি, কই আমাদের তো সারা বছর সংসারই চলে না, বিক্রি দূরের কথা ! আর নকুল কি না ... ।"

"ওকে তোমরা কেউ কোনওদিন সরষে মাড়াই করতে যেতে দেখেছ ? ওর বাড়িতে সরষে মাড়াইয়েরও কল আছে নাকি ?"

"নকুলকে ভগবান দিচ্ছেন, ওসব কথা বোলো না ! আমাদের বেলায় ভগবান দিলেন না, শুধু ওরই বেলায় ভগবান ... তাও আবার কিঁনা সরষের তেল !"

"পুলিশ জিজ্ঞেস করলে আমি সকলের আগে সাক্ষী দেব, হ্যাঁ দেখেছি, নকুলকে রোজ পাঁচ টিন করে তেল বেচতে যেতে দেখেছি !"

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করেন, "তোমার নাম নকুলেশ্বর সাঁতরা ?"

নকুল ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"তুমি নাকি তেলের খনি পেয়েছ ?"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন !"

"মানে ? সরষে তেলের কোনও খনি হয় না, তুমি আমাকে ভাঁওতা দিচ্ছ !"

"আজ্ঞে না ! আমাদের দেশের কৃষিবিজ্ঞান এখন অনেক উন্নত। আমার খেতে এমন সরষে ফলেছে যা থেকে আমি এই তেল পেয়েছি।"

কনস্টেবল লাফিয়ে উঠে বলেন,"কোথায় সেই সরষে, আমরা দেখতে চাই !"

মন্দার তৈরি হয়েই ছিল, সে টবসমেত গাছটা নিয়ে এসে উঠোনে বসিয়ে দেয়। গোটা গ্রামের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ে সরষের গাছের চারপাশে। বেলের মতো সরষে, সবাই তাজ্জব হয়ে যায়।

দারোগাবাবুও দেখলেন, কনস্টেবল গন্ধ শুঁকলেন সরষে গাছের পাতা ছিঁড়ে। গ্রামের একজন বয়স্ক লোক বলেও ফেললেন, "দারোগাবাবু, সরষের ঢুলি থাকে, এর ঢুলি কোথায় ? নকুল জালিয়াতি করছে !"

"ঢুলি মানে ?"

"ঢুলি মানে মোড়ক। সরষের ওপরে একটা মোড়ক থাকে, এ তো শুধু সরষেটাই ঝুলছে !"

কনস্টেবল বলল, "মোড়ক থাক বা না থাক কিছু এসে যায় না, কিন্তু এর তেল কোথায় ? তুমি যে রোজ পাঁচ টিন করে তেল বিক্রি করো, সে তেল আসে কোত্থেকে ?"

মন্দার একটা টিন এনে বসিয়ে দেয় সরষের তলায়, চাপ দেয়, ঝরঝর করে তেল পড়তে থাকে। খানিকক্ষণ মন্দার চাপ দিল, খানিকক্ষণ নকুল, দেখতে-দেখতে টিন ভর্তি হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে এক আঁজলা করে নিয়ে নাকে নেয়, বয়স্করা যাঁদের চুলের প্রতি এখন আর কদর নেই তাঁরা হাতটা ঘষেই নেন মাথায়। দারোগাবাবুর জিজ্ঞাসাবাদের ফাঁকে কনস্টেবল জারিকেনের খোঁজ করেন।

সে দারোগাবাবুকে জিজ্ঞেস করে, "বড়বাবু, আমি একবার টিপে দেখব ? কী রহস্য জানা দরকার। যদি আমরা ধরেও নিই কৃষিবিজ্ঞানী বেলের মতো সরষে আবিষ্কার করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর ভেতর থেকে রোজ পাঁচ টিন করে তেল বেরোয় কী করে ?"

দারোগাবাবু বললেন, "দ্যাখো !"

কনস্টেবল নকুলকে বললেন,"যাও, একটা বড় দেখে জারিকেন এনে দাও !"

মন্দার পাঁচ লিটারের একটা জারিকেন এনে দেয়।

কনস্টেবল সরষে মুঠো করে চাপ দিচ্ছে, কিন্তু এ কী, এ তো সরষের তেল নয় ! পচা খইল জলে তার দু' হাত ভর্তি হয়ে যায়। এত ভয়ানক দুর্গন্ধ যে, নিজেই লাফিয়ে ওঠেন কনস্টেবল। দৌড়ে যান দারোগাবাবুর কাছে, "দেখুন বড়বাবু, কীর্তিটা দেখুন !"

কিন্তু দেখবেন কী, গন্ধের চোটে দারোগাবাবু তাকে তাড়ান, "আঃ, সরে যাও, গন্ধে দমবন্ধ হয়ে আসছে।"

দারোগাবাবু ডাকলেন নকুলকে, "কী ব্যাপার, এমন হল কেন ?"

"আজ্ঞে, কিছু বুঝতে পারছি না !"

উপস্থিত সকলে বলে, "বড়বাবু, আপনি নিজে একবার দেখুন, হয়তো কনস্টেবলবাবু সরষের গোড়া ধরে চেপে দিয়েছেন, তাই পচা খইল-জল বেরিয়ে পড়েছে। সরষে মাড়াই করলে যেমন তেল বেরোয়, তেমনই খইলও বেরোয়।"

দারোগাবাবু আর গোড়ার দিকে হাত নিয়ে গেলেন না। তবু চাপ দিতেই পিচকিরি দিয়ে পিচের চেয়ে নাছোড় জঘন্য চটচটে ও দুর্গন্ধ কী এক নাম-না-জানা বস্তুতে তাঁর দু' হাত ভর্তি হয়ে যায়। দারোগাবাবু তো হাত দেখে একসময় লজ্জা ভুলে ফুঁপিয়ে কান্নাই জুড়ে দিলেন।

কিন্তু এর পরও গ্রামবাসীদের কেউ-কেউ লোভবশত শিশি-বোতল এনে যেই সরষে চেপে তেল বের করতে গেল, তাদেরই হাত হয়

আলকাতরা, নয় নর্দমার পচা কাদায় ভর্তি হয়ে যায়, একজন তো যেই জোরে চাপ দিয়েছে অমনই পচা দুর্গন্ধের মতো কী একটা জল তার সারা মুখে ছিটনো হয়ে গেছে, সে দৌড়ে গিয়ে পুকুরে ডুব দিয়ে তবে শান্তি পায়।

গ্রামবাসীর মধ্যে কালীপদ ওঝাও ছিল। সে বলল, "আপনারা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ হল ভূতের কাণ্ড।"

"ভূত!"

কনস্টেবলের ভূতে খুব ভয়। তিনি তো ভূত শুনে পড়েই যাচ্ছিলেন, কোনও রকমে রুল-ডাং ঠেক দিয়ে রক্ষে পান।

ওঝা বোঝাল, "দারোগাবাবু, ভূত ছাড়ানোর জন্য আমাদের তো সরষে লাগে। ওঝা মন্ত্রঃপূত সরষে ছড়িয়ে ভূতটাকে প্রথমে বন্দি করে ফেলে, অবশ্য একটা রাস্তা রাখা হয় ভূতের পালানোর জন্য। এক্ষেত্রে ওঝা ভুল করে কোনও রাস্তা রাখেনি, ভূত উপায় না পেয়ে সরষের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। তেল বলুন আর নর্দমার জল বলুন, এ-সবই ভূতের কাণ্ড।"

কালীপদ ওঝার কথায় সকলের বিশ্বাস হয়।

"তার মানে যত তেল নকুল বেচেছে সব ভূতের তেল!"

ভূতের ভয়ে নকুলও কেঁদে ফেলে, "আমরা যে খেয়েছি গো ওই তেল, ছেলেমেয়েকে মাখিয়েছি! কী হবে কালীপদদা, আমরা বাঁচব তো?"

কনস্টেবল কালীপদকে বলেন, "তুমি যদি ওঝা হও তা হলে ভূত ছাড়াও! ভূতের সামনে বসে থাকা কোনও কাজের কথা নয়, যে কোনও সময় সরষে থেকে বেরিয়ে ঘাড় মটকে দিতে পারে!"

"আপনারা যদি অনুমতি দেন ... !"

দারোগাবাবু বললেন, "হাঁ, হাঁ, অনুমতি দিচ্ছি!"

তাঁর দু'হাতে কালো আলকাতরা না কিসের ছোপ, কিছুতেই উঠছে না। এই কালো দাগ কোনওদিনও উঠবে কি না সন্দেহ হচ্ছে, যদি না ওঠে সারাজীবন, এই কালো হাত নিয়ে তাঁকে কাটাতে হবে! তাই তিনি প্রচণ্ড খাপ্পা এই সরষের ওপরে। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছে বুটের তলায় ফেলে পিষে থেঁতলে দেন সরষেটাকে, কিন্তু ভূতের জন্য তাঁর সাহস হচ্ছে না। তিনি উচ্চকণ্ঠে আদেশ দেন, "তাড়াও, তাড়াও ভূত!"

কালীপদ ওঝা একমুঠো সরষে চাইল। ভূতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নকুলই দৌড়ে গিয়ে একমুঠো সরষে এনে দিল। কালীপদ মন্ত্র দিয়ে সরষেগুলো ছড়িয়ে দিল সরষে গাছের চারপাশে।

"দাও, এবার একটা ছুরি বা ব্লেড দাও!

আপনারা এবার দেখতে পাবেন এর ভেতরে কী আছে!"

নকুল আবার ছুরি আনার জন্য পা বাড়াচ্ছিল কিন্তু বাধা দিল দামোদর পালের ছেলে অর্জুন। সে বিজ্ঞান নিয়ে এ-বছর পাশ দিয়েছে। সে বলল, "দেখুন, ভূত বলে বিজ্ঞানের এত বড় আবিষ্কারকে আপনারা নষ্ট করবেন না!"

দারোগাবাবু চোখ পাকিয়ে বলেন, "মানে?"

অর্জুন বলে, "মানে ভূত বলে কিছু নেই। এই সরষেটাকে কোনও কৃষিবিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হোক! ইভলিউশন থিয়োরি অনুযায়ী হয়তো প্রকৃতিতেই সরষের রূপান্তর ঘটেছে!"

"সরষে থেকে তেল বেরোতে পারে, কিন্তু আলকাতরা, নর্দমার পচা জল বেরোতে পারে না!"

"এটা আলকাতরা বা নর্দমার জল নয়, তেলেরই উপাদান, র' মেটিরিয়াল। চেপে বের করতে-করতে তেল শেষ হয়ে গেছে, চাপের ফলে র' মেটিরিয়ালই বেরিয়ে আসছে।"

গ্রামের সকলে হো-হো করে হেসে ওঠে, "দামুর ছেলের বই পড়ে-পড়ে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে!"

কেউ বলে, "আমাদের গ্রামে একজন বিজ্ঞানী জন্মেছে হে, কে, না দামুর ছেলে!"

দামোদর অর্জুনের কাছে গিয়ে তাকে ধমক দেয়, "তোকে এসব ব্যাপারে নাক গলাতে হবে না, তুই বাড়ি যা! এ সরষে না ভূত তা তোকে বিচার করতে হবে না, গ্রামের মান্যগণ্যরা আছেন, স্বয়ং দারোগাবাবু আছেন।"

কালীপদ ওঝা বলে, "ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ!"

কনস্টেবল বলেন, "ছেলেমানুষ বলে তো ভূত ছেড়ে দেবে না, যখন ঘাড় মটকাবে তখন বুঝবে!"

নকুল ছুরি এনে দেয়। কালীপদ ওঝা ছুরিটিকেও মন্ত্রশুদ্ধ করে নেয়। তারপর নিমেষে দু' ফাঁক করে দেয় সরষেটাকে। সকলে দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে, ভেতরে জেলির একটা থলথলে পদার্থ, কেউ চিনতে পারল না।

কনস্টেবল বলল, "এবার এটাকে পুড়িয়ে ফ্যালো, শত্রুর শেষ রাখতে নেই!"

ওঝা বলে, "ভূত কখনও পোড়ে না, তবু আপনারা যখন চাইছেন! নিয়ে এসো, দু' আঁটি খড় নিয়ে এসো!"

আগুন জ্বেলে কাটা সরষেটা ফেলে দিতেই হঠাৎ দেখা গেল অদ্ভুত একটা নীল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সকলে চিৎকার করতে থাকে, "ওই তো, ওই তো ভূত পালাচ্ছে!"

দেখতে-দেখতে বিলীন হয়ে যায় সরষেটা।

পুলিশের কাজ শেষ, পুলিশ চলে গেল। গ্রামবাসীরাও চলে গেল, তারা বলতে-বলতে গেল, "কবে-না-কবে সরষে-ভূত নকুলের ঘাড় মটকাত, তারা বাঁচিয়ে দিল নকুলকে।"

পোড়া জায়গাটার পাশে একা উবু হয়ে বসে আছে মন্দার। পা-পা করে একসময় অর্জুন এসে দাঁড়ায়। মন্দার মুখ তোলে, তার চোখে জল।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

গ্রহের নাম অ্যালফ্লোলল

জে. সি. মেজিয়ারেস ও পি. ক্রিস্টিন

গ্রহের নাম অ্যালফ্লোলল

জে. সি. মেজিয়ারেস ও পি. ক্রিস্টিন

কপিরাইট : দারগো এডিটর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কুইজ

যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন স্টিফেন স্পেন্ডার

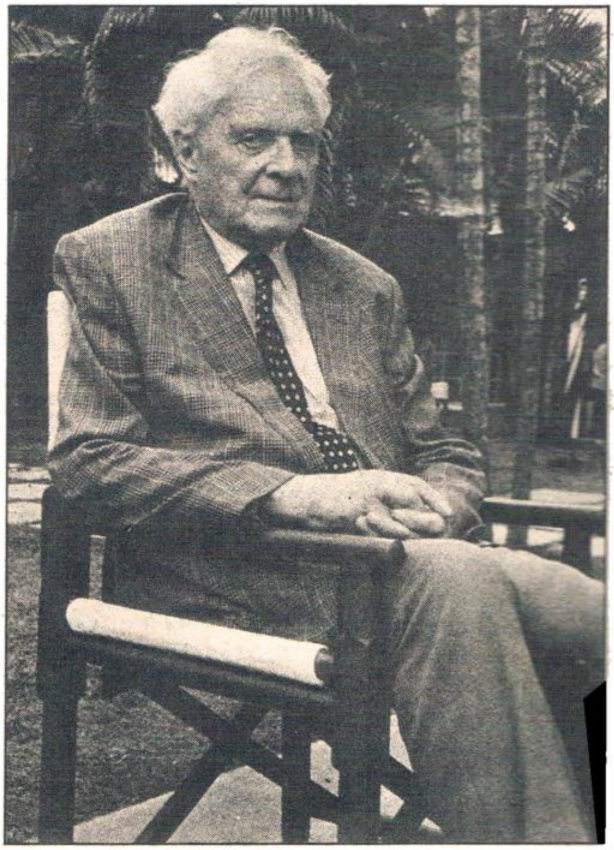

বিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে কবি ও প্রাবন্ধিক স্টিফেন স্পেন্ডার ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতি তিনি মারা গেলেন, ৮৬ বছর বয়সে।

আজ থেকে মাত্র ছ' বছর আগে কলকাতায় এসেছিলেন মানুষটি। বয়স কেড়ে নিয়েছে তাঁর অনেক কিছুই, কেবল কেড়ে নিতে পারেনি চোখের সেই অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্য। ইংরেজিতে একটি কথা চালু আছে, "যদি কারও সত্যিকারের বয়স বুঝতে চাও, তার চোখের দিকে তাকাও।" লম্বা, বয়সের ভারে ঈষৎ ন্যুব্জ, চওড়া কপালে অভিজ্ঞতার আঁকিবুকি আর একমাথা পাকা চুলঅলা সেই মানুষটির চোখের মধ্যেই ছিল তাঁর সত্যিকারের বয়স। সারা ভারতের সবক'টি বড় শহর ঘুরে দেখার পর তিনি ও তাঁর স্ত্রী বলতে ভোলেননি যে, কলকাতাকেই তাঁদের মনে হয়েছে সবচেয়ে প্রাণবন্ত। ৮০ ছুঁই-ছুঁই সেদিনের সেই মানুষটি, বিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব স্টিফেন স্পেন্ডার, মারা গেলেন ১৬ জুলাই, ৮৬ বছর বয়সে।

বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ইংল্যান্ডে কাব্য আন্দোলনের একেবারে কেন্দ্রে ছিলেন কবি স্টিফেন স্পেন্ডার। তিনি ও তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই কবিবন্ধু উইস্তান হিউ অডেন এবং সিসিল ডে লুইস তখন শোরগোল তুলেছিলেন সাহিত্যমহলে। ক্রিস্টোফার ইশারউড ও লুই ম্যাকনিস-এর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল স্টিফেন স্পেন্ডারের।

কবি স্টিফেন স্পেন্ডারের জন্ম হয় ১৯০৯ সালে। বাবা ই এইচ স্পেন্ডার ছিলেন সেকালের উল্লেখযোগ্য উদারপন্থী সাংবাদিক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে স্টিফেন স্পেন্ডার চলে যান জার্মানিতে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় প্রজাতান্ত্রিকদের হয়ে তিনি প্রচারও চালিয়েছিলেন স্পেনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন সমাজ ও রাজনীতিসচেতন এই কবি। তিনি প্রায়ই বলতেন, কবিতা লেখা বা শিল্পচর্চা করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দেশের সেবা করা, সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সত্যি বলতে কী, কবিকে হতে হবে দৈনন্দিন সমাজের বাইরে দাঁড়ানো কোনও নিরাসক্ত ব্যক্তি— এ-জাতীয় মনোভাবকেই ঘৃণা করতেন স্পেন্ডার। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' আন্দোলনের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতার বই, 'টুয়েন্টি পোয়েম্‌স'। তখন থেকেই ইংল্যান্ডের সাহিত্যানুরাগীদের নজরে পড়েন তিনি। এর কিছু পরে অডেন, ডে লুইস ও তাঁর কবিতার একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। বইটির নাম ছিল 'নিউ সিগনেচার্‌স'। স্টিফেন স্পেন্ডারের প্রথমদিকের কবিতায় অনেক সমালোচক শেলি-র প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বীভৎসতা, সাধারণ মানুষের জীবনে যুদ্ধ নিয়ে আসে যে অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগ, স্পেন্ডার তাঁর কবিতায় সে কথাই বলতে চেয়েছেন। এ-কারণে অনেক সাহিত্য সমালোচক তাঁকে 'রুপার্ট ব্রুক অব ডিপ্রেশন' বলে অভিহিত করেছেন। রুপার্ট ব্রুকের কবিতায় যুদ্ধ উঠে আসে তার রণোন্মাদনার রোমান্টিক দিকগুলি নিয়ে, আর স্পেন্ডারের কবিতায় পাই হত্যা ও অত্যাচারের ধূসর ছায়া। কখনও-কখনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার বিষয়, ১৯৩৪ সালে লেখা দীর্ঘ কবিতা 'দ্য ল্যান্ডস্কেপ নিয়ার অ্যান অ্যারোড্রোম'-এ প্রকৃতি তার স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। কেবল কবিতা নয়, অনেক প্রবন্ধ ও নাটকও লিখেছিলেন তিনি। 'বুকস্ অ্যান্ড দ্য ওঅর', 'দ্য ডেসট্রাকটিভ এলিমেন্টস', 'দ্য বার্নিং ক্যাকটাস', 'ফরওয়ার্ড ফ্রম লিবারালিজ্‌ম' প্রভৃতি প্রবন্ধ সঙ্কলনে স্পেন্ডারের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে স্টিফেন স্পেন্ডার ছিলেন একজন 'কাল্ট-ফিগার'। তাঁর মৃত্যুতে সাহিত্যজগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

প্র শ্ন

(১) ব্রাজিলের মুদ্রার নাম কী ?
রথীন্দ্রনাথ দে, কোন্নগর, হুগলি।

(২) বাংলা সাহিত্যের এক বিখ্যাত চরিত্র থাকতেন '২৪ নম্বর, বনমালী নস্কর লেন'-ঠিকানায়। তাঁর নাম বলতে পারো ?
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও চুমকি চট্টোপাধ্যায়, আন্দুল, হাওড়া।

(৩) কার আত্মজীবনীর নাম 'দ্য পাথ টু পাওয়ার' ?
অমিত সরকার, বি. সি. রোড, কোচবিহার।

(৪) কলকাতার প্রথম শেরিফ-এর নাম কী ?
বিভা মাইতি, রানিচক, হলদিয়া।

(৫) প্রথম ভারতীয় মহিলা পাইলট কে ?
উত্তরণ সরকার, তল্লিতলা, কোচবিহার।

(৬) কে লিখেছেন 'মাই এক্সপেরিমেন্ট্স উইথ ট্রুথ' ?
জয়ন্ত সেনগুপ্ত, বিজয়গড়, কলকাতা।

(৭) প্রথম যে জেসুইট মিশনারি ভারতে এসেছিলেন, তাঁর নাম বলতে পারো ?
বিশ্বদেব ভট্টাচার্য, কাঁথি, মেদিনীপুর।

(৮) 'ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড' বইটির লেখক কে ?
কৌশিক রায় বর্মন, আগরতলা, ত্রিপুরা।

(৯) ডেভিস কাপে ভারত প্রথম অংশগ্রহণ করে কত সালে ?
অর্পিতা সেন, কুঁদঘাট, কলকাতা।

(১০) একটি ভারতীয় মাসিক পত্রিকা আছে, যা ছাপা হয় পোস্টকার্ডে। এটির নাম কী ?
অর্পণ লেঙ্কা, বারিপদা, ওড়িশা।

ইনিই ভারতের প্রথম মহিলা পাইলট

এঁর আত্মজীবনীর নাম 'দ্য পাথ টু পাওয়ার'

(১১) ভারতের 'টেব্‌ল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয় কবে ?
তমাল চট্টোপাধ্যায়, লাবণি, সল্ট লেক সিটি।

(১২) কে পরিচালনা করেছেন 'এম্পায়ার অব দ্য সান' ছবিটি ?
দিব্যেন্দু পুরকায়স্থ, শ্রীরামপুর, হুগলি।

(১৩) 'ইয়টিং'-এ ভারত প্রথম এশিয়ান গেম্‌স পদক পায় কত সালে ? কারা এনেছিলেন সেই পদক ?
অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিব্রুগড়, অসম।

(১৪) 'আই.ডি.বি.আই'-এর পুরো কথাটি কী ?
উর্মিলা বসু রহমান, পার্ক সার্কাস, কলকাতা।

(১৫) ভারতের একজন ক্রিকেট অধিনায়ক একটি টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্টেই টসে জিতেছিলেন। কে তিনি ?
ইন্দ্রজিৎ অধিকারী, বারাতলা বাহিরকুঞ্জ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

(১৬) কে লিখেছেন 'টেমিং অব দ্য শ্রু' নাটকটি ?
বিনীতা রায়, টালিগঞ্জ, কলকাতা।

(১৭) কোন মৌলের পরমাণুতে 'নিউট্রন' নেই ?
অর্ণব দত্ত ও অয়ন দে, জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার।

(১৮) ১৯৯৫ সালের 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার কাকে দেওয়া হয়েছে ?
কাকলি মুখোপাধ্যায়, যোধপুর পার্ক, কলকাতা।

(১৯) 'ইন্দ্রজিৎ' ছদ্মনামে লেখেন কে ?
রীতিকা বসু, কসবা, কলকাতা।

(২০) 'ঈশপ'-এর গল্প বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন কে ?
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, উত্তর মানশ্রী, হাওড়া।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

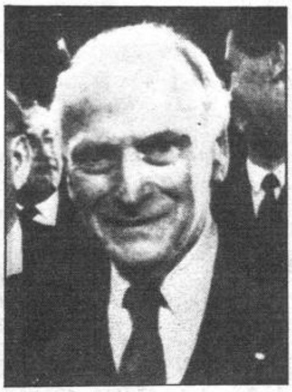

ইহুদি মেনুহিন

(১) ইয়াদেঁ।
(২) দুর্গাবাঈ।
(৩) বিজয়া মেহতা।
(৪) কেরল।
(৫) ইহুদি মেনুহিন।
(৬) অমৃতা প্রীতম।
(৭) অধ্যাপক ই. সি. জি. সুদর্শন।
(৮) রুস্তম জাল উকিল।
(৯) এস. কল্যাণরমন।

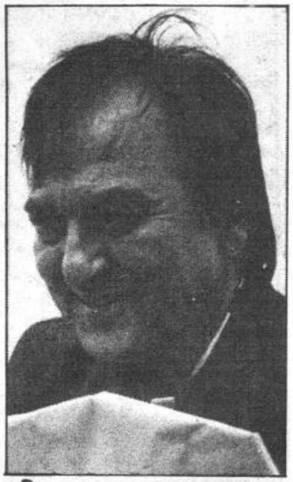

সুনীল দত্ত

(১০) ভি. বি. কেতকর।
(১১) গালান হোইয়ান বিটিয়ান।
(১২) পি. সি. সরকার (সিনিয়ার)।
(১৩) স্টিফেন হকিং।
(১৪) তারকোভস্কি।

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের

জো, জেট ও জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

গন্তব্য নিউ ইয়র্ক

গন্তব্য নিউ ইয়র্ক

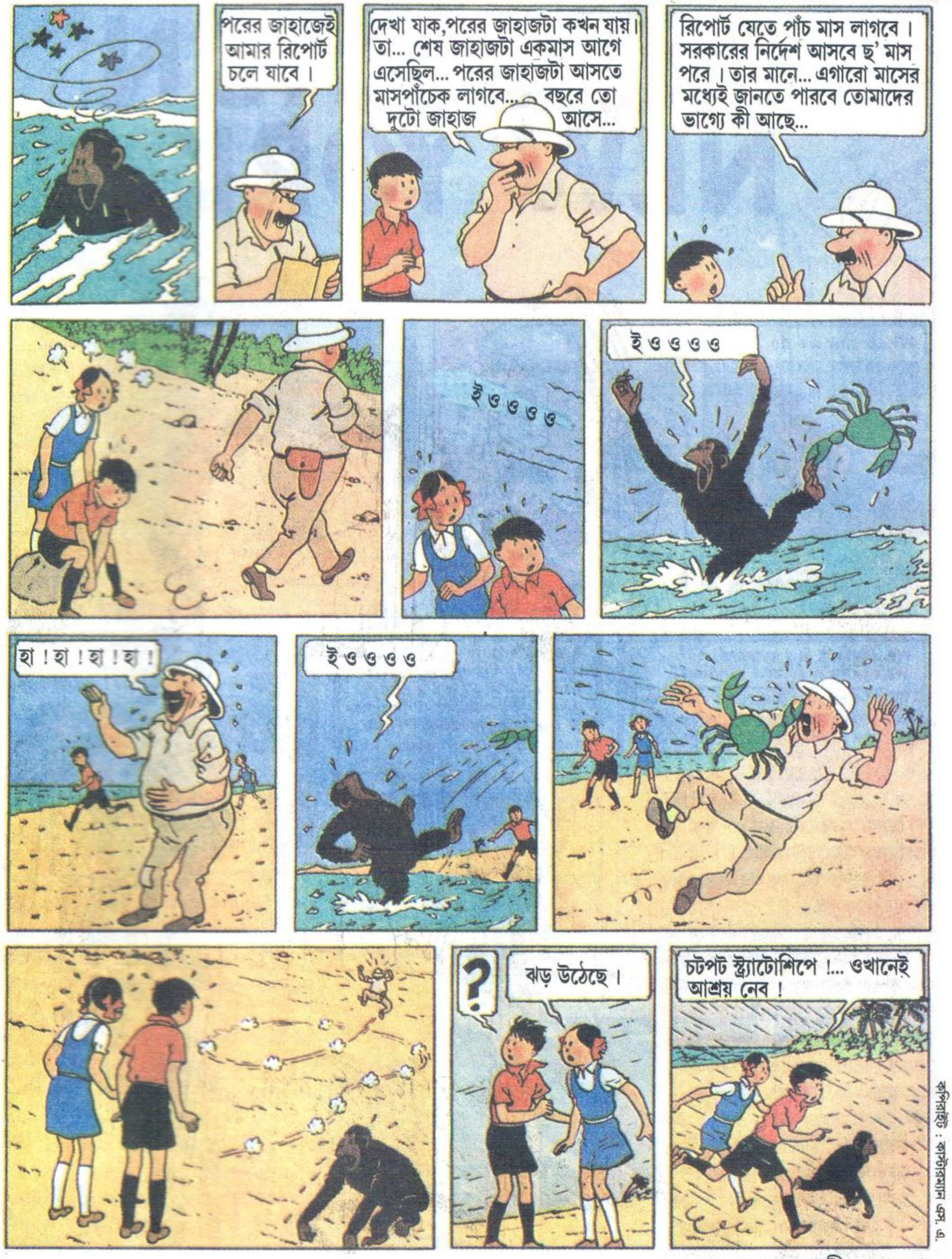

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গল্প

পালিয়ে ফেরা

সুবোধ ভট্টাচার্য

খানিক আগে স্কুল থেকে এসেছে পল্টন। চুল উসকোখুসকো। শরীরে কাদামাটি। যেন ধুলো-কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে এসেছে।

"কী রে, আজ এত দেরি, স্কুল তো কখন ছুটি হয়ে গেছে। আর প্যান্ট-জামায় এত নোংরা লাগল কী করে? কোথাও পড়েটড়ে গিয়েছিলি?"

জুতোর ফিতে খুলে সোজা একটানে পা থেকে আলগা করে নেয়। তারপর ব্যস্তভাবে জুতোজোড়া রান আউট করার কায়দায় দূর থেকে জুতোর শেলফের দিকে ছুড়ে মারে।

"আজ নাইন-বি'র সঙ্গে খেলা ছিল।"

"কিসের খেলা? রোজ-রোজ এসব চলছে। স্কুলের পড়াশোনা কি উঠে গেছে নাকি?"

"তুমি ওসব বুঝবে না। ইন্টার ক্লাস কম্পিটিশন চলছে। আমরা টু-ওয়ানে জিতে গেছি। মঙ্গলবার টেন-এর সঙ্গে ফাইনাল।" গা থেকে ঘেমো জামা, গেঞ্জি খুলে দলা পাকিয়ে সিঁড়ির নীচে রাখা কাচবার গামলায় ছুড়ে দিল। "শচে আর গোবিন্দর যা কম্বিনেশন! একেবারে

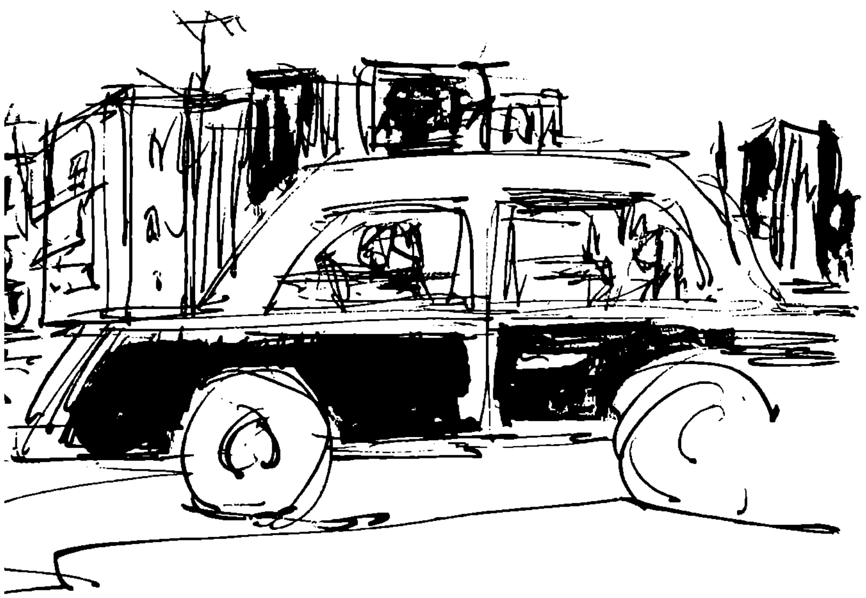

কৃশানু-বিকাশ। দেখবে আমরাই চ্যাম্পিয়ন হব।”

“ওই করো, সারাদিন মাথায় ঘুরছে শুধু খেলা। পড়াশোনা হবে কী করে তোমার ? এর পর তো সন্ধে হতেই ঘুম।” পল্টন আর কথা বাড়ায় না। মায়ের রাগ দেখে বুঝে গেছে এখন ডিফেন্সিভ গেম ছাড়া চলবে না। যা বলবেন শুনে যেতে হবে। খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই। কিন্তু সে-কথা বলা যাবে না। তা হলে মা আরও রেগে যাবেন। তার চেয়ে চুপচাপ পড়ার ঘরে গিয়ে বই নিয়ে পড়া ভাল। পল্টন ভাল ছেলের মতো মুখ করে বাথরুমের দিকে যায় হাত-পা ধুতে।

সন্ধের পর পল্টনের বাবা বাড়ি ফেরেন। মা তাঁর কাছে পল্টনের ব্যাপারে সব কথা বলে দেন। স্কুল থেকে দেরি করে আসা, ফুটবল খেলা, পায়ে গরম চুন-হলুদ লাগানো, মায় নেংচে চলা অবধি কিছুই বাকি রাখেন না।

জীবনরতনবাবু এমনিতে বেশ ঠাণ্ডা মানুষ। টিভিতে খেলাধুলো দেখতে ভালবাসেন। বোঝেনও সব খেলা। অনেক সময় ছুটি নিয়ে ওয়ান-ডে ক্রিকেট কিংবা রাত জেগে ইউরো কাপ, ওয়ার্ল্ড কাপ দেখেন। কিন্তু তাই বলে ক্লাস নাইনের ছেলে সারাদিন শুধু খেলা নিয়ে মেতে থাকবে, তা চলবে না। নাইন মানে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। এখন ফাঁকি দিলে আর মেক-আপ করা সম্ভব নয়। পাঁচজন মাস্টারমশাই সকাল-সন্ধে লেগে আছেন। তবু ছেলের পড়ায় মন নেই। মাথার মধ্যে শুধু ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান।

পড়ার ঘরে ছবির বাহুল্য অসহ্য লাগে জীবনরতনবাবুর। স্ত্রীর কথা শুনে উনি ছেলের ঘরে ঢুকলেন। ছেলে খুব মন দিয়ে পড়ছে। কাছে গিয়ে দেখেন একটা কুইজের বই। 'ইনকুইজিটিভ'। মনোযোগ দিয়ে পল্টন পড়ে যাচ্ছে “কী রে, পড়াশোনা একদম ছেড়ে দিলি ?”

“কেন, আমি তো স্কুল থেকে এসেই পড়তে বসে গেছি।”

“এসব কি পরীক্ষার পড়া ? পঙ্কজসার, দেবীপ্রসাদসার তোমার নামে কমপ্লেন করছেন। তুমি নাকি ঠিকমতো টাস্ক করো না। পড়াশোনায় মন নেই ওঁদের কথা শোনো না। এসব কী ?”

“আমি পড়তে চাই। খেলতেও চাই। কিন্তু খেলতে গেলে তুমি, মা এমন করো, আমার একটুও ভাল লাগে না।”

“খেলার কথা হলে ভাল লাগে, আর পড়ার কথা হলেই রাগ ! ওসব চলবে না। যদি ঠিকমতো পড়াশোনা না করো, তা হলে ... ।” কথা শেষ না করে রাগে গজগজ করতে-করতে বেরিয়ে যান জীবনরতনবাবু।

পল্টনের মনখারাপ হয়ে যায়। রাগও হয়। বাবা সবসময় রেগে আছেন। এমন একটা দিন যায় না, কেউ ওঁর বেত, কানমলা না খেয়েছে !

পল্টনের জেদ চেপে যায়। পড়াশোনা ও করবে ঠিকই। সেইসঙ্গে স্টপারে যেমন খেলছে, খেলে যাবে। বাবা-মাকে দেখিয়ে দেবে, পল্টনও খেলে নাম করতে পারে।

বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে পল্টন। হাতের বইটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে। আবার বন্ধ করে রেখে দেয় যথাস্থানে। চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে বের হয়। চুপচাপ গেট খুলে রাস্তায় নেমে আসে। হাঁটতে থাকে আপন মনে। রাস্তায় হ্যালোজেন আলো জ্বলছে। ফাঁকা রাস্তায় হুসহাস গাড়ি ছুটছে। অনেক মা-বাবা ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘুরছেন। স্টেডিয়ামটার দিকে তাকায় পল্টন। প্রচুর লোকের ভিড় সেখানে। আলোর ঝলমলানি। বড় ব্যানার টাঙানো হয়েছে। সারা ভারত প্রতিবন্ধী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। কোনও কিছু হলে এখানে চারদিক ঘিরে মেলা বসে যায়। অন্যদিন হলে পল্টন এখানে দাঁড়াত। পুতুলের দোকানে দাঁড়িয়ে বাঘ, ভালুক, জন্তু-জানোয়ারের দাম করত। পোস্টারের দোকান খুঁজে নিয়ে খেলোয়াড়দের ছবির খোঁজ করত। কিন্তু আজ সে কিছুই করল না। এমনকী একটু দাঁড়ালও না। শুধু দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল। দখিনা বাতাসে হালকা হিমের ছোঁয়া। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় পথটা এগিয়ে যেতে থাকে।

তিন নম্বর সেক্টরে এসে ওর মনে হয় রাত বেড়ে গেছে। বাড়িও অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। এখন কী করবে ও ?

বাড়িতে ফিরে গেলে মায়ের বকাঝকা তো আছেই, সেইসঙ্গে বাবার মারধরও। হেডসারের মতো বাবা একবার ধরলে ছাড়েন না। সে দৃশ্যের কথা মনে পড়তে পল্টন ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। মেসোর বাড়ি গড়িয়ায় চলে যাবে কি না ভাবে। তাতেও বিপদ। বাবা কাল সকালে খবর পেয়ে যাবেন। সকলের সামনে কান ধরে হিড়হিড় করে ট্যাক্সিতে তুলবেন, “এত বড় স্পর্ধা ? বাড়ি চলো। তারপর মজা দেখাচ্ছি !”

সেই কখন দুটো ভাত খেয়ে স্কুলে গেছে। বাড়ির দেওয়া টিফিন একা কোনওদিন খেতে পারে না। মদন, অতনু, জয় কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নিয়েছে। ওর জন্য পড়ে ছিল দু' টুকরো পাউরুটি আর একটা মিষ্টি। পেয়ারাটাও জয় অর্ধেক খেয়েছে। রাগ করলে ওরা হিহি হাসবে। “ক্যাপ্টেন, তুমি তো টিমের আদর্শ। ঠিকমতো পাস না পেলে খেলব কী করে ?” পল্টন একটা কথাও বলেনি। পেয়ারার অর্ধেকটা না খেয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ওরা অবশ্য নিজেদের টিফিনের ভাগ দিতে এসেছিল। পল্টন রাগ দেখিয়ে তাও নেয়নি। বাড়ি এসেও কিছু খেল না। এখন তো খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছে।

ফাঁকা রাস্তার দু'পাশে গাছের ছায়া ঘন হয়ে এসেছে। পুটুসের ঝাড় আর কামিনীর গন্ধে

(এর পরে ৬০ পাতায়)

লেডি গ্রেস্টোক, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই ।
টারজান
এডগার রাইস বারোজ
আমি লেডি গ্রেস্টোক ।
আমি জেন ।
গ্রেস্টোক এস্টেটের এক সংবর্ধনাসভায় গ্যাব্রিয়েল নামে এক তরুণীর সঙ্গে জেনের আলাপ করিয়ে দেয় ।
লেডি গ্রেস্টোক...মানে 'জেন'...অ্যাডমিরাল ডারনট আপনার ও লর্ড গ্রেস্টোকের কথা আমাকে বলেছেন... মানে আমি বলছি টারজানের কথা ।
গ্যাব্রিয়েল, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল লাগছে । তোমাকে দেখে একজনের কথা মনে পড়ছে ।
আফ্রিকায় এলে কেন গ্যাবি ?
অ্যাডমিরাল ডারনট বলেছেন, আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারব ।
তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার মাকে তুমি চেনো না ।
আমার তখন বয়স কম । সেই তখন থেকে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি । টারজান আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবেন ।
আমি কি ভুল বললাম ?
তা'ই কি ?
না, গ্যাবি ভুল বলে না ।
গ্যাবি, এখন সবে সন্ধে । তোমাকে ভোরবেলা রওনা হতে হবে ।
শুভরাত্রি গ্যাবি । সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করব ?
কে ওর মা ?
আর কেই-বা ওর বাবা ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(৫৭ পাতার পর)

থমকে হাওয়া ম'-ম' করছে। ছাতার মতো চারধারে ছড়ানো মস্ত এক কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে পল্টন এসে দাঁড়ায়। গাছের তলায় অজস্র লাল পাপড়ি আর ফুল ঝরে পড়ে আছে। ফুল দিয়ে কারা বুঝি আলপনা এঁকে রেখেছে। পল্টন নিচু হয়ে একটা-দুটো করে ফুল কুড়োতে থাকে। অল্প সময়ে হাত ফুলে ভরে ওঠে। আবার হাঁটতে থাকে।

খানিকক্ষণ হেঁটে মুখ উঁচু করে আকাশ দেখল। রুপোর বাসনের মতো চাঁদ চকচক করছে। কী করবে, কিছু ভেবে না পেয়ে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। পরপর সব বাড়ি। দোতলা, একতলা, তিনতলা। ওদের এ ডি এক নম্বর সেক্টরের মতো।

প্রথম বাড়িটাতে গিয়ে বেল বাজাতে এক ভদ্রলোক দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাই? কাউকে খুঁজছ?"

"না, মানে ..."

ভদ্রলোক কোনও কথা না বলে দুম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দুটো বাড়ি ছেড়ে পল্টন আবার বেল টিপল। একটা ছোট মেয়ে জানলার পরদা সরিয়ে বলল, "বাবা বাড়ি নেই। তুমি পরে এসো।"

ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে একটু মুচকি হেসে পল্টন ওখান থেকে সরে এল। আবার হাঁটতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা একতলা নিঝুম বাড়ি দেখে দাঁড়াল। কী ভেবে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল। বারান্দায় উঠে ডোর-বেলে হাত রাখল। চারদিকটা এমন অন্ধকার আর নিস্তব্ধ যে, ওর নিজের গা ছমছম করতে থাকে। বেলের শব্দের সঙ্গে বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে ওঠে। ঘরের অল্প আলোয় কাদের কথাবার্তার টুকরো-টাকরা ভেসে আসে। তারপর হঠাৎ সব চুপচাপ। অন্ধকার চিরে শুধু একটানা ঝিঁঝির ডাক। এই ভুতুড়ে পরিবেশে পল্টনের কেমন ভয় ভয় করে। তবু কী ভেবে আবার বেলে চাপ দিল।

"কে?" বলে দরজা খুলে দাঁড়ালেন এক ভদ্রলোক।

ওর বাবার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। মাথায় চুল নেই। বিশাল বড় চকচকে টাক। ঘাড়ের কাছে যাও-বা কিছু চুল আছে তার সবক'টি কাশফুলের মতো ধবধব করছে।

"কী চাইছ?" ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করেন।

"কাজ আছে?" পল্টন ঢোক গেলে, "আপনারা কাজের লোক নেবেন?"

"তা বাপু, তুমি কোথায় থাকো? তোমার বাবা-মা আছে তো?"

"আমার কেউ নেই। আমি এখানে নতুন এসেছি।"

"বুঝেছি।"

পল্টন কোনও কথা বলে না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কথার ফাঁকে পল্টনকে ভাল করে নিরীক্ষণ করেন। চোর-ছ্যাঁচড়ের মতো নয়। ছেলেটার চেহারা দেখলে মায়া হয়। "শোনো, আমাদের বাড়িতে কাজের লোক মাসখানেক নেই। বেশি মাইনেতে অন্য কোথাও ঢুকেছে হয়তো। আমরা বুড়ো-বুড়ি থাকি। দু'জনের সংসার। তা তুমি কত টাকা মাইনে চাও?"

পল্টন হাতে বুঝি চাঁদ পায়। একটু আগের ভয় আর নেই। তবু মাথা নিচু করে উত্তর দিল, "সে আপনি যা ভাল বুঝবেন, দেবেন।"

"ঠিক আছে, আগে তোমার কাজ তো দেখি। কাজ দেখে পরে মাইনে ঠিক হবে।"

পল্টনকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কাজ দেখান ভদ্রলোক। পল্টন কোনও কথা বলে না। যা শোনে তাতেই ঘাড় কাত করে সায় দেয়। বিছানায় শোওয়া দিদাকে দেখে। বেশ অসুস্থ মনে হয়। মাথার কাছে ছোট টেবিলে অনেকরকম ওষুধের শিশি। চোখ বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে আস্তে। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

খানিক পরে রুটি, ডাল আর তরকারি খেয়ে সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরে পল্টন শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না। এই প্রথম বাবা-মাকে ছেড়ে আসা। একটা কষ্ট টের পায়। গলার কাছে দলা পাকিয়ে কান্না উঠে আসে। সুনসান নিশুতি রাত। পাতা খসে পড়ার ঝুপঝাপ শব্দ। হঠাৎ-হঠাৎ বাদুড়ের ডানার ঝটপট আওয়াজ। রাত-পাখির ডাক। ওর ভয় আরও বেড়ে যায়। উপুড় হয়ে শুয়ে মাথার বালিশ ধরে মুখ ঢাকে। তারপর কখন একসময় ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে, জানে না।

সকালে ঘুম ভাঙে দাদুর ডাকে, "কী রে, শুধু ঘুমোলেই চলবে? ওঠ, কত বেলা হল।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পল্টন। মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, "স্কুলের একটা পড়াও তৈরি হয়নি। পঙ্কজস্যার এসেই তো ফিজিক্স নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটাবেন। 'স্থিতি' ও 'গতি' নিয়ে টানা লেকচার দেবেন। কিন্তু না। পল্টন নিজেকে সামলে নেয়।

"চুপচাপ বসে আছিস যে!" দাদু তাড়া দেন,

"যা, দ্যাখ, দিদা কী বলছে।"

ঘর মুছতে হিমশিম খেয়ে যায় পল্টন। এত কঠিন কাজ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। সারা ঘর জলে থইথই। প্যান্ট-জামা ভিজে একশা। একখানা ঘর মুছতে একবেলা। দিদা ওর কাণ্ড দেখে হেসে খুন।

"পল্টন, তুমি এর আগে কোথায় কাজ করতে? এত সুন্দর ঘর মুছতে পারো যে, তোমাকে দিয়ে আর দু'খানা ঘর মুছিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।"

পল্টনের রোখ চেপে যায়। "খারাপ হয়েছে বলছেন? তা খারাপ তো হবেই। মেয়েদের কাজ ছেলেরা করলে ভাল হয় কখনও?"

"ঠিক আছে, ওটা যখন মেয়েদের কাজ, আমি করব। কিন্তু ছেলেদের কোন কাজটা তুমি করবে?"

"কেন, বাজারে যাব। রেশন ধরব, কেরোসিন তেল নেব। পাম্প খুলব, বন্ধ করব। লাইট খারাপ হলে সারিয়ে দেব। আর ..."

"আর সময় পেলে একটু পড়াশোনা, তাই না?" পল্টনের মুখের কথা কেড়ে নেন দিদা।

পল্টন ভয় পায়। এই বুঝি ধরা পড়ে গেল! সঙ্গে-সঙ্গে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, "পড়াশোনা নয়, খেলাধুলো যদি বলো আমি আছি।"

"তাই বুঝি? বেশ তো। কিন্তু কাজকর্ম ঠিকমতো করা চাই। ঘরের কাজের জন্য লোক নিয়েছি। তোমার দাদুর বয়স হয়েছে। আমি তো বুড়ি। এত বড় বাড়ি কে দেখে? আমাদের দুটো ছেলেই বিদেশে। দু-চার বছর পরপর

আসে। কিছুদিন থাকে। আবার চলে যায়।"

"আমি কিন্তু আর যাব না। তোমার কাছে থাকব।"

"তুমি কোনও কাজ করতে পারো না। খালি মুখ দেখার জন্যে পয়সা দিয়ে লোক রাখে কেউ?"

"পয়সা দিয়ে আমি কী করব? আমার টাকাপয়সা লাগবে না। কাজও আমি সব শিখে নিতে পারব। দেখো তুমি।"

"তা নয় হল। কিন্তু পড়াশোনা? কোন ক্লাস অবধি পড়েছ?"

পল্টন কোনও জবাব দেয় না। একটুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বালতি নিয়ে কলের দিকে এগিয়ে যায়।

সন্ধ্যায় টিভির সামনে স্টেফি, সেলেসের খেলা দেখতে-দেখতে দাদুকে বলে, "খেলাধুলোর উন্নতি মানে দেশের উন্নতি, তাই না দাদু? এই কথাটা লোকে স্বীকার করে। কিন্তু কাজের সময় করতে চায় না।"

"যেমন?" দাদু ব্রজকিশোর উসকে দেন।

সঙ্গে-সঙ্গে পল্টন ক্রিকেট, ফুটবল, হকি নিয়ে বিস্তর কথা বলে ফেলে তুলনা দেয় লাতিন আমেরিকা, ইউরোপ আর অস্ট্রেলিয়ার। খেলোয়াড়রা ওদেশের মাথার মুকুট। আর এখানে ঠিক তার উলটো। দিদা পল্টনকে পরীক্ষা করার জন্য বলেন, "কীসব ছাইপাঁশ খেলা। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না। বাংলাদেশ দাও তো। ওখানে ভাল নাটক আছে।"

পল্টন লাফ দিয়ে ওঠে, "উইম্বলডন ফাইনাল না দেখে নাটক? এ জিনিস দু'বার দেখার সুযোগ হবে না দিদা। না বুঝলে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

ওর পাগলামি দেখে ব্রজকিশোর আর তরুবালা হাসেন। ওঁদের সন্দেহ হয়, "আহা রে! ছেলেটা না জানি কার! বাড়ি থেকে পালিয়ে আসেনি তো? তরুবালার চোখ দুটি ভিজে ওঠে নিজের ছেলের কথা ভেবে। বড় মায়ায় ফেলেছে পল্টন। কাজ পারে না। না পারুক। তবু বাড়িটা যেন মাথায় নিয়ে আছে। অনেকদিন পর কিসের আনন্দে ওঁরাও যেন মেতে গেছেন।

খবরের একটু আগে। রোজ যেমন হয়। নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত ঘোষণা। অসিত রায় ওরফে পল্টন। বয়স চোদ্দ বছর। রং ফরসা, কপালের বাঁ দিকে হালকা কাটা দাগের চিহ্ন। গত তেরোই জুলাই থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে পল্টনের পাশপোর্ট সাইজের একমুখ হাসিভরানো ছবি। টিভির সামনে বসে ব্রজকিশোর আর তরুবালা। চমকে উঠে একে অন্যের দিকে তাকান। পল্টন এ-ঘরে নেই। বোধ হয় পাশের ঘরে। ব্রজকিশোর তরুবালার দিকে তাকিয়ে তর্জনী মুখে ঠেকান। আস্তে করে উঠে যান— পল্টন কী করছে দেখার জন্য। পল্টন দাদুর ঘরে বসে সত্যজিৎ রায়ের একটা বই পড়ছে।

সেদিন রাতে ব্রজকিশোর আর তরুবালা ঠিক করলেন, কাল সকালে পল্টনকে ওর বাবার কাছে ফেরত দিয়ে আসবেন। জানতে পারলে পল্টন হয়তো যেতে চাইবে না। তাই গোয়েন্দা কাহিনীর মতো ব্যাপারটা ওঁরা দু'জনে ছকে নিলেন।

সকালে চা-পর্ব শেষ হলে ব্রজকিশোর বললেন, "পল্টন, আজ সকালে আমার সঙ্গে তোমাকে বাইরে যেতে হবে।"

"সকালেই?"

"তা কাজ থাকলে যেতে হবে না?"

"ছেলেদের কাজ তো তুই খুব পছন্দ করিস। তা যা না দাদুর সঙ্গে।" তরুবালা জলখাবার এগিয়ে দেন পল্টনকে।

ব্রজকিশোর খেতে-খেতে বলেন, "এক্ষুনি বের হব। দেরি করব না। তুই চটপট রেডি হয়ে নে। ভীষণ জরুরি কাজ।"

ভীষণ জরুরি কাজ। পল্টন কেমন হকচকিয়ে যায়। কিছু বুঝতে পারে না। তরুবালা ওকে খাইয়েদাইয়ে, সুন্দর করে গুঁজে জামা পরিয়ে দেন। মুখ উঁচু করে ধরে মাথার চুল আঁচড়িয়ে দেন। পল্টন ঘাড় বাঁকায়। "তোমার সবটাতে বেশি-বেশি। আমি এত বড় একটা ছেলে, মাথা আঁচড়াতে পারি না?"

"দিদা দিচ্ছে যখন, দিক না। তোর অত রাগের কী আছে?"

তরুবালা বড়-বড় চোখ করে বার-বার পল্টনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন পল্টন দুখুর দেশ ছেড়ে এবার সুখুর দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। তরুবালার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলেন, "ভাল হয়ে থাকবি।"

"ভাল থাকাথাকির কী আছে। সবসময়ই তো আছি।"

পল্টন হাসে। তরুবালার চোখের ছায়া ঘন হয়। ফ্লোরিডা থেকে বড় ছেলে নীতিশ আর চেস্টারফিল্ড থেকে ছোট ছেলে প্রীতিশের বাড়ি এসে ফিরে যাওয়ার ছবিটা আর সেই পুরনো কষ্টটা এই মুহূর্তে কেমন যেন এক হয়ে যায়। ছেলেটা চলে যাচ্ছে। আর কি আসবে না কোনওদিন? একটা অদ্ভুত দুঃখ তরুবালাকে জড়িয়ে ধরে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি জুটে গেল নেহাত বরাতজোরে। পল্টন জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাবে দাদু?"

"সবচেয়ে ভাল জায়গায়।"

"তার মানে?"

"এই কাছেই, আমার এক বন্ধুর বাড়ি। সেখান থেকে বেরিয়ে দেখি কোথায় যাওয়া যায়।"

পল্টন কিছু বুঝবার আগেই ওদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে যায়। ট্যাক্সির হর্ন শুনে ওর বাবা-মা দু'জনেই বেরিয়ে আসেন। পল্টনও। ওর চোখেমুখে যেন খেলায় জিতে যাওয়া হাসির ঝিলিক। কিন্তু মুখে কোনও কথা বলে না। যেন বিজয়ী দলের ক্যাপ্টেন। যা বলার, কোচ বলবে।

"ভেতরে আসুন। এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয়!"

পল্টনের মা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। "আপনাকে যে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব! এ-ক'দিন আমাদের ঘুম নেই, খাওয়া নেই, কী যে অবস্থা গেছে, তা ভগবানই জানেন। পল্টনের একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বলেন, "তুমি ওঁকে ভেতরে নিয়ে এসো।"

"আজ নয়, অন্য একদিন। আমরা দু'জনে, মানে পল্টনের দিদাও আসবে। একটু জরুরি কাজ আছে। এখন চলি।" ওই কালো-হলদে ট্যাক্সিতে ব্রজকিশোর ফিরে যান।

ঘরে ঢুকে কেউ কিছু বলার আগে পল্টন মাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে। যেন কত বছর পর মাকে সে ফিরে পেয়েছে। আনন্দ আর কষ্টে ওর চোখে জল এসে গেল।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

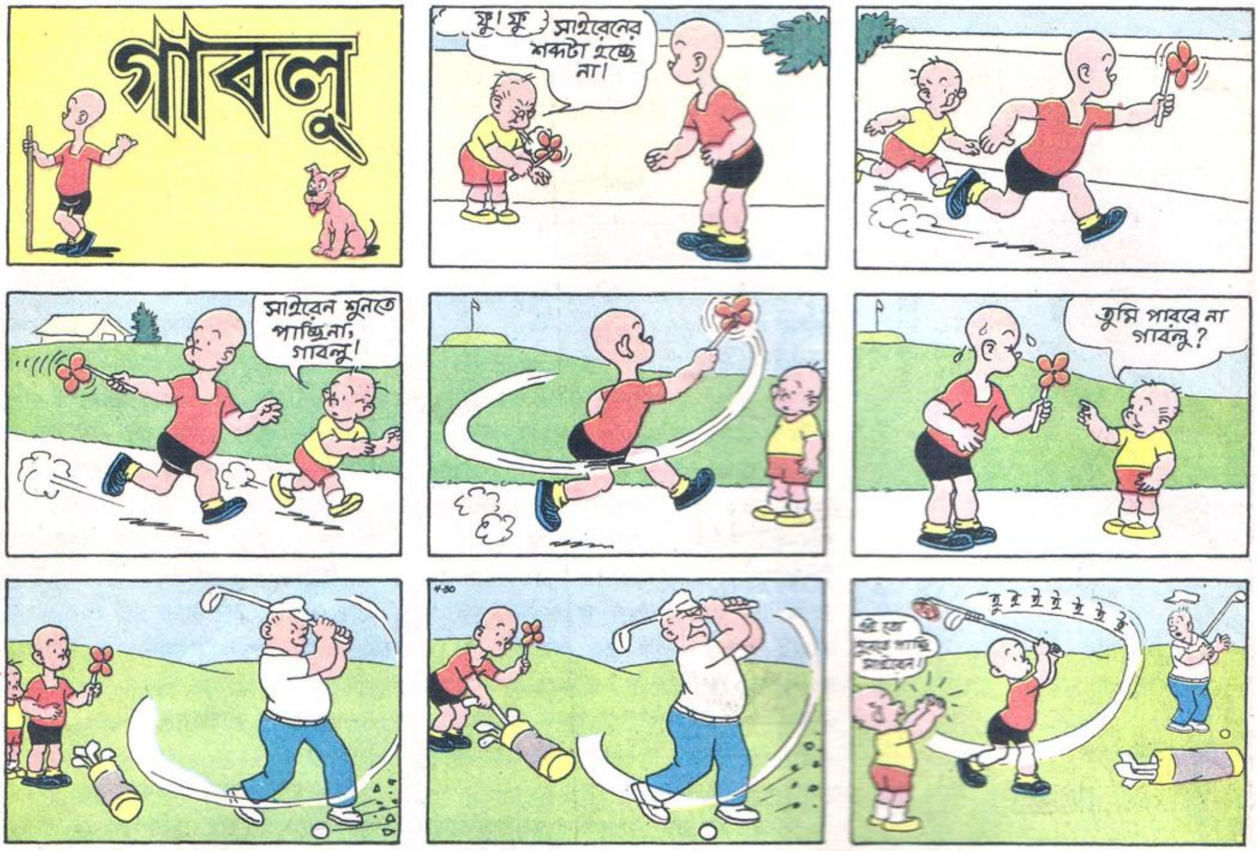
গাবলু
ফু! ফু
সাইরেনের শব্দটা হচ্ছে না।
সাইরেন শুনতে পাচ্ছি না, গাবলু!
তুমি পারবে না গাবলু?

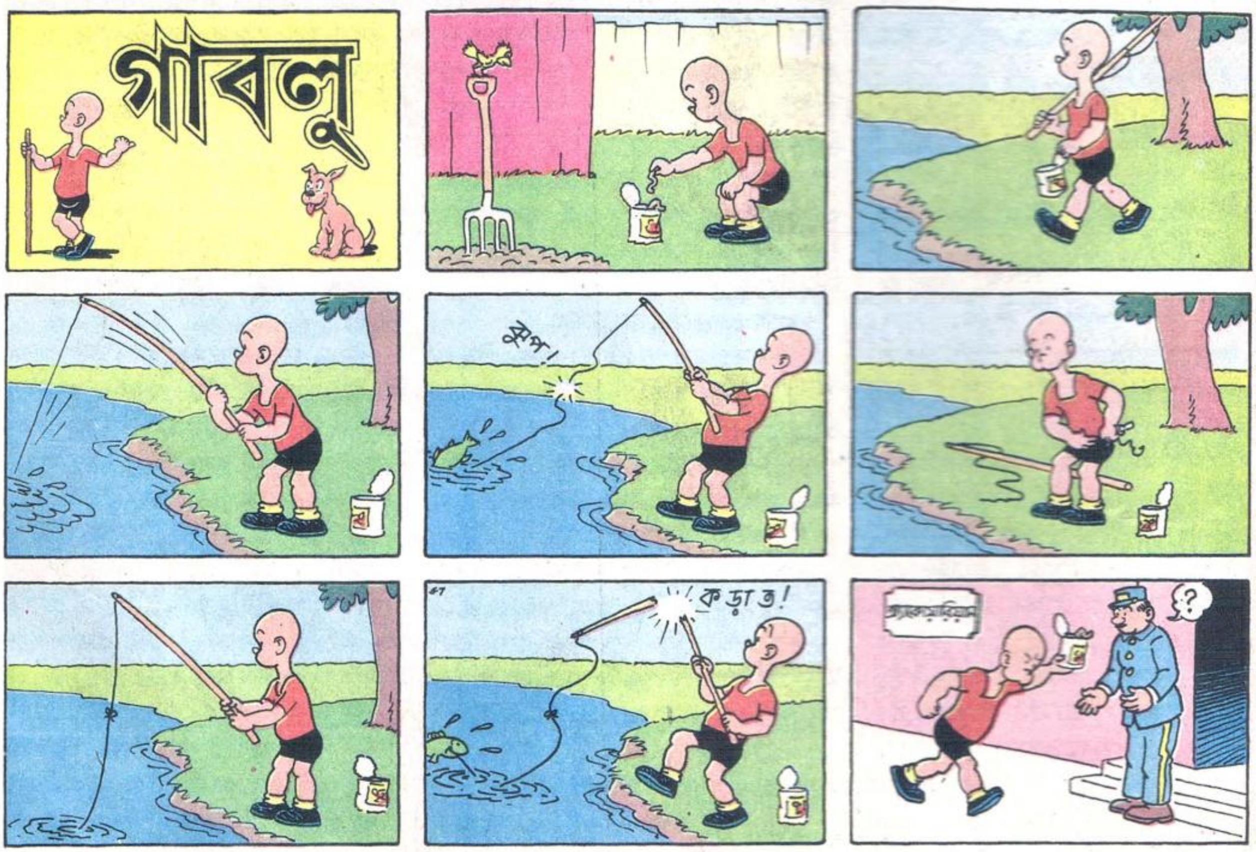
গাবলু
ঝুপ!
কড়াত!
?

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পাণ্ডব গোয়েন্দা

তেত্রিশ

বিকেলবেলা পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিত্তিরদের বাগানে বসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ডোরার জন্য। ডোরা এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত ওদের উত্তেজনার শেষ নেই। সত্যি, কী নেশা যে ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটা! স্কুটার নিয়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘুরে বেড়ানোর স্বাদই যে আলাদা, তা এখন ওরা বুঝছে।

ভোম্বল বলল, "বাবাকে আমি বলেই দিয়েছি এই মাসে আর কিছু না হোক, স্কুটার আমার চাই।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। সাইকেল আর চলে না। স্কুটারে যে কী মজা, তা যে পেয়েছে সে-ই জানে। প্যাডেল করতে হয় না, কিছু না, শুধু চেপে বসে থাকো আর হাওয়ার গতিতে উড়ে যাও।"

বাচ্চু বলল, "আমরাও কিনব। আমাদের অবশ্য একটা কিনলেই দু'জনের হয়ে যাবে।"

বাবলু এতক্ষণ পরে মুখ খুলল, "নাঃ, ডোরা মেয়েটা সত্যিই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের স্কুটার থাকবে না, তারা মোটর ড্রাইভিং জানবে না, এটা ঠিক নয়।"

পঞ্চু একপাশে শুয়ে থেকে ওদের দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে লেজ নাড়ছিল। সেও এবার ওদের কথায় সায় দিয়ে বলল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।" তার মানে, ঠিকই তো।

এমন সময় ডোরা এল। ওর স্কুটারে চেপে ডবল ক্যারি করে চায়নাকে সঙ্গে নিয়েই এল। ঝড়ের গতিতে এসে ওদের সামনে সজোরে ব্রেক কষে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "হোয়াট নিউজ?"

বাবলু বলল, "গুড নিউজ।"

"টিকেট কনফার্মড্?"

"ও ইয়েস।"

"হোয়েন ইউ আর গোয়িং? হুইচ ট্রেন?"

"থ্রি জিরো জিরো সেভেন আপ তুফান এক্সপ্রেস।"

ডোরা আশ্বস্ত হয়ে একটু কী যেন ভেবে বলল, "আমার ইনফরমেশনটা রং হয়ে গেছে বাবলু। তোমরা চম্বল এক্সপ্রেসেই গোয়ালিয়রের টিকিটটা কাটলে ভাল করতে। কেননা ভিন্দ ওখান থেকে খুবই কাছে।"

বাবলু বলল, "এখন আর কোনও উপায় নেই। টিকিট হয়ে গেছে। তা ছাড়া কোনটা কাছের কোনটা দূরের, এ নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না। ভিন্দ কোনও টুরিস্ট স্পট নয়, শুধুমাত্র সারদা নামের ওই মহিলার সঙ্গে একটু দেখা করবার জন্যই আমাদের ওখানে যাওয়া। সেখানে কোনও হোটেল নেই, লজ নেই। বহিরাগতদের জন্য রাত্রিবাসের কোনও ব্যবস্থাও নেই। থাকবেই বা কেন? ভারতে এত দেখবার জায়গা থাকতে

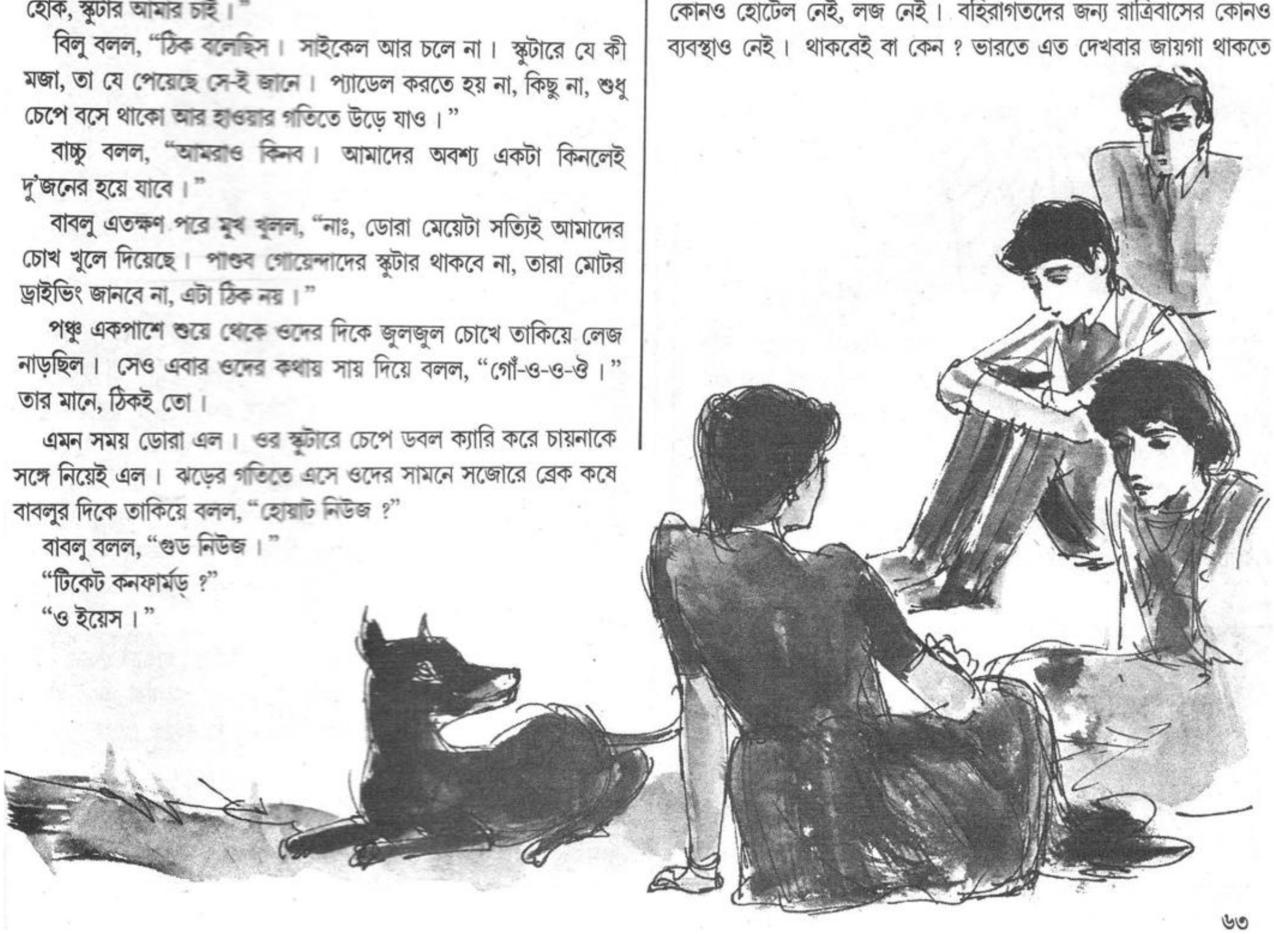

হাসিখুশি

অশেষবাবুর ক'দিন ধরেই জ্বর। কিছুতেই কমছে না। দুপুরবেলা জ্বর বেশ বেড়ে যাওয়ায় অশেষবাবুর স্ত্রী ডাক্তারবাবুর কাছে দৌড়ে গেলেন, "ডাক্তারবাবু, এক্ষুনি চলুন, ওঁর ভয়ানক জ্বর।"

ডাক্তারবাবু সব শুনেটুনে বললেন, "এখন জ্বর কত?"

অশেষবাবুর স্ত্রী বললেন, "মেপে দেখিনি। তবে একশো পঞ্চাশ-ষাট তো হবেই।"

বিস্মিত ডাক্তারবাবু মজা করে বললেন, "আপনি একটা কাজ করুন। ফায়ার ব্রিগেডে একটা খবর দিয়ে দিন।"

ঠাকুমার খুব মনখারাপ। 'ছোটদের রবিনহুড' বইটা তিনি পড়ছিলেন, কিন্তু কাল রাত্রে কোথায় রেখেছেন কিছুতেই মনে করতে পারছেন না।

দাদু বললেন, "অত চিন্তার কী আছে? ভাল করে খোঁজো, ঠিক পেয়ে যাবে।"

ঠাকুমা বিরক্ত হয়ে বললেন, "খোঁজার কি বাকি রেখেছি কিছু? সব আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছি। কোথাও নেই।"

"বিছানার তলাটা দেখেছ?"

ঠাকুমার মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল, "না, ওখানটায় দেখিনি। ওখানে যদি থাকে, তা হলে তো শেষ আশাটাও নষ্ট হয়ে যাবে।"

লোহার কারবারি ভবেনবাবু সিঙ্গাপুর যাওয়ার আগে তাঁর উকিলকে বললেন, "হাইকোর্টে যে কেসটা চলছে, তার রায় বেরনোমাত্র আমাকে জানাবেন। আমি চিন্তায় থাকব।"

দু' মাস পরে এক গভীর রাত্রে ভবেনবাবুর কাছে উকিলবাবুর ফোন, "আমরা হেরে গেছি। সত্যের জয় হয়েছে।"

ভবেনবাবু ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, "আমি অত সহজে ছাড়ব না মিঃ চ্যাটার্জি। এক্ষুনি সত্যের বিরুদ্ধে আপিল করুন।"

বিনয়বাবু তাঁর সহকর্মী অখিলবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা অখিল, তুমি সারাক্ষণ কী এত চিন্তা করো বলো তো?"

অখিলবাবু বললেন, "আমি কী ভাবি জানো বিনয়? ভাবি যে, পৃথিবী থেকে যদি একদিন সব বোকা লোক ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়, তার পরিণাম কী হবে।"

"তুমি ভয়ানক স্বার্থপর অখিল। সারাজীবন শুধু নিজের চিন্তা করেই মরলে!"

ছবি : দেবাশিস দেব

ভিন্দে মানুষ যাবে কোন দুঃখে? তাই গোয়ালিয়রেই আমরা থাকব। সেখান থেকেই যোগাযোগ রাখব ভিন্দের সঙ্গে।"

ডোরা বলল, "তোমার এ-যুক্তিটা অবশ্য মন্দ নয়। ওই সুযোগে তাজমহলটাও দেখা হয়ে যাবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "তাজমহল আমাদের দেখা। কিন্তু তবুও তাজমহল তো পুরনো হয় না। তাজমহল একবার দেখার পর কত রাত যে তাজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থেকেছি তার ঠিক নেই। এখনও চোখ বুজলেই মানসপটে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য। তবে সেবারে এমন এক বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলাম যে, দেখে মন ভরেনি। এখন আমরা সম্পূর্ণ ভারমুক্ত, তাই দু' চোখ ভরে তাজমহল দেখব।"

চায়না বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। আমারও অনেকদিনের সাধ ছিল তাজমহল দেখবার। এতদিনে সেই সাধ হয়তো মিটবে।"

ডোরা বাগানের ঘাসের ওপরই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল, "হয়তো কেন? টিকিট যখন কাটা হয়েছে তখন মিটবেই।"

বাবলু বলল, "চায়না মুখ ফসকে বলে ফেলেছে কথাটা। কিন্তু এটা তো ঠিক, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে গ্যারান্টি দিয়ে কোনও কিছুই বলা যায় না। এই মুহূর্তে এমন একটা কিছু ঘটে যেতে পারে যাতে আগাগোড়া সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে আমাদের। অতএব গিয়ে না পৌঁছনো পর্যন্ত সবই কিন্তু অনিশ্চয়তায়।"

ডোরা হাসল। হেসে বলল, "বুঝলাম। আর এও জেনে রাখো, যাওয়া আমাদের হচ্ছেই। কেননা যেখানে পাণ্ডব গোয়েন্দা সেখানেই সাফল্য।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল বাবলুর মুখের দিকে। এখন কথাবার্তা শোনার পর উল্লসিত হয়ে উঠল সকলেই।

বিলু বলল, "তুই যে টিকিট কেটে এনেছিস, সে-কথা একবারও বলিসনি তো আমাদের?"

"কেন বলব? তোরা কি জানতে চেয়েছিস? স্কুটার নিয়ে এমন মেতে রয়েছিস যে, তোদের মনপ্রাণ সবই এখন স্কুটারের দিকে। তোরা কি জানতিস না আমি টিকিট কাটতে যাব?"

ভোম্বল বলল, "সত্যি, আমাদেরই দোষ। আমাদের মনের মধ্যে এখন ডোরা আর স্কুটার। এই দুইয়ের চিন্তা ছাড়া আমাদের আর কোনও চিন্তাই নেই। তা যাকগে, আমরা যাচ্ছি কবে?"

"কাল বাদে পরশু।"

বাচ্চু আর বিচ্চু "হুররে" করে লাফিয়ে উঠল। আনন্দে কী যে করবে ওরা কিছু ভেবে পেল না। পঞ্চুও লাফিয়ে উঠল, "ভৌ ভো-উ-উ-উ" করে। বিলু নির্বিকার। ওর প্রকৃতিতে উচ্ছ্বাস একটু কম। ভোম্বল মুখ দিয়ে "ইয়াহা" করে একটা চিৎকার দিয়েই ডোরার স্কুটারটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল। যেই না যাওয়া, পঞ্চু অমনই তীরবেগে পিছু নিল ওর। স্কুটারের পেছনে এইভাবে ছুটে যাওয়াতেই আনন্দ ওর।

চায়না আর ডোরা বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গেই বলল, "পরশু যদি যাওয়া হয়, তা হলে তো আর সময় নেই। আমরা তা হলে..."

বাবলু বলল, "তৈরি হও। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়বে। 'এস ফোর' কোচের সামনে যথাসময়ে তোমরা এসে দেখা কোরো। সঙ্গে এমন কোনও জিনিস নিয়ো না, যা বইতে তোমাদের কষ্ট হবে।"

"কাল কি তা হলে আমরা আসব?"

"কোনও দরকার নেই। ইচ্ছে হলে আসতে পারো, না হলে একেবারেই দেখা হবে স্টেশনে, কেমন?"

ভোম্বল স্কুটার নিয়ে ফিরে এল একটু পরেই। বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলেই একবার করে চেপে নিল পরপর। এর পরে ডোরার স্কুটার ফিরিয়ে দেওয়া হল ডোরাকে।

ডোরা আর চায়না যেমন এসেছিল, তেমনই উধাও হয়ে গেল।

॥ ১৪ ॥

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা এসে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। অফিস টাইমের ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে তখন জমজমাট হাওড়া স্টেশন। অনবরত লোকাল ট্রেনগুলো আসছে, যাচ্ছে। কিন্তু সবাই এলেও ডোরা আর চায়না কই ? ওরা আসছে না কেন ?

একটু পরেই ট্রেন এল প্ল্যাটফর্মে।

ওরা আর অপেক্ষা না করে ওদের জন্য নির্দিষ্ট বার্থে গিয়ে বসল। পঞ্চুও ম্যানেজ করল একটু নিরাপদ জায়গা। বাচ্চু, বিচ্ছুকে সিটে বসিয়ে বাবলু,বিলু আর ভোম্বল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কড়া নজর রাখতে লাগল যদি মেয়ে দুটোকে দেখতে পায়, তাই। কিন্তু কত লোক যাচ্ছে-আসছে, শুধু ডোরা ও চায়নার পাত্তা নেই।

উৎকণ্ঠিত বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো ? এমন তো হওয়ার কথা নয়। ওদের না আসার কারণটা কী ?"

ভোম্বল বলল, "তোরা যাই বলিস না কেন ভাই, ডোরা হচ্ছে পুরোপুরি খামখেয়ালি মেয়ে। বরং তার চেয়েও এক ধাপ বেশি, তবু কম নয়। আর চায়নাটা ভিজে বেড়াল। ওরা নিশ্চয়ই কোনও মতলব এঁটেছে, তাই ইচ্ছে করেই আসেনি।"

বিলু বলল, "না না। ডোরার যেরকম আগ্রহ তাতে কিন্তু সেরকম বলে মনে হয় না।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "ট্রেন ভুল করেনি তো ?"

বাবলু বলল, "অত কাঁচা মেয়ে ডোরা নয়।"

এমন সময় হঠাৎ নড়ে উঠল ট্রেন। ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগে কখন যে সিগন্যাল হয়ে গিয়েছিল, তা কেউ খেয়াল করেনি। ট্রেন নড়ে উঠতেই বাচ্চু, বিচ্ছুর ডাকে সচকিত হল ওরা। কোনওরকমে হাতল ধরে চলন্ত ট্রেনেই উঠে পড়ল। ওদের এই প্রথম নিরানন্দ যাত্রা।

একমাত্র চা-কফি ছাড়া ট্রেন জার্নিতে কোনওরকম পানীয় ব্যবহার করে না পাণ্ডব গোয়েন্দারা। এবারের ভ্রমণে খাদ্য-তালিকাতেও বিশেষ কিছু নেই। শুধু কেক, বিস্কুট আর সন্দেশ ছাড়া। সিটে বসে বাবলু প্রত্যেকের জন্য এক কাপ করে কফি নিল। সাড়ে ন'টায় ট্রেন। তাই আটটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়েছে বলে ভাতও খাওয়া হয়নি কারও। বাবলু রেলের খাবারের অর্ডার দিয়ে চুমুক দিল কফির কাপে। চায়না আর ডোরার বার্থটা ফাঁকা যাচ্ছে বলে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল ওর। শুধু ওর নয়, ওদের সকলের।

বাবলুর একটাই চিন্তা, কী হল মেয়ে দুটোর ? কোনও দুর্ঘটনায় পড়ল না তো ? তবু বলল, "ব্যান্ডেল আর বর্ধমানে ট্রেন থামলে বাইরে একটু নজর রাখতে হবে আমাদের। কেননা যদি ওরা কোচ ভুল করে থাকে অথবা শেষ মুহূর্তে এসে পড়ায় পেছনের বগিতে ওঠে, তা হলে নিশ্চয়ই ওরা আসবে। আমরা তখন ওদের সাহায্য করতে পারব।"

বিলু বলল, "যদি না আসে ?"

"তা হলেই তো ভয়ের ব্যাপার।"

ভোম্বল বলল, "ভয় কিসের ? এখন তো কোনও দুষ্কৃতীর আমাদের পিছু নেওয়ার আশঙ্কা নেই। কেননা আমাদের প্রধান শত্রু পেশোয়ারির খেল খতম। অজিত সিংও মৃত। বাকি রইল হীরালাল। সে আমাদের শত্রু নয়। এমনকী সে জানেও না আমাদের ব্যাপারস্যাপার।"

বাবলু বলল, "ঠিকই। তবুও নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ নেই। পেশোয়ারির কোনও লোকের সঙ্গে হীরালালের গোপন আঁতাত না থাকলে সে কখনও চম্বলের উপত্যকা থেকে বৈশালীর একটি গ্রামে এসে অজিত সিংকে মার্ডার করতে পারত না। কাজেই সেই লোক যে আমাদের ব্যাপারে, ডোরার ব্যাপারে কিছু বলেনি তাকে, তাই-বা কে জানে ? আমরা পরম নিশ্চিন্তে, যেভাবে ঘোরাফেরা করছি বা প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলছি, তা যে আড়ি পেতে শোনেনি কেউ, তাও তো হলফ করে বলা যায় না। অতএব ক্রাইম নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কোনও ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। থাকলেই সেই একচক্ষু হরিণের অবস্থা হবে।"

সকলেই সবিস্ময়ে বলল, "তোর কথাই ঠিক বাবলু। এখন থেকে সব সময় আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। না হলেই বিপদ।"

ট্রেন ব্যান্ডেল, বর্ধমান পার হল। কিন্তু চায়না, ডোরা এল না। রেলের বার্থ তো ফাঁকা যায় না। তাই কোচ অ্যাটেনডেন্ট ওদের বার্থ-দুটি অন্য যাত্রীদের দিয়ে দিলেন। ওরা মনখারাপ করেই ট্রেনে বসে থাকল।

দেখতে-দেখতে ঘড়ির কাঁটায় বেলাও গড়িয়ে চলল। আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডি, শিমুলতলা, ঝাঁঝা, কত স্টেশন। রাত প্রায় ন'টা নাগাদ ওরা পটনায় এল। ওরা রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল যে যার বার্থে। ট্রেনের দোলায় সহজেই ঘুম আসে। শোওয়ামাত্রই ঘুম। তবে সকলে ঘুমোলেও সদাসতর্ক অতন্দ্র প্রহরী পঞ্চু কিন্তু একভাবে সিটের তলায় আত্মগোপন করে কেক-বিস্কুট খেতে-খেতে নজর রাখতে লাগল চারদিকে।

ভোর হল ইলাহাবাদে। আর তখনই ওদের চমকে দিয়ে ডোরা ও চায়না এমনভাবে এসে হাজির হল যে, পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। ওরা বলল, "হাউ ফ্যান্টাস্টিক ! ব্যাপারটা কী ! কাল কোথায় ছিলে তোমরা ?"

ডোরা বলল, "আর বোলো না আমাদের দুঃখের কথা। কাল সারারাত ইলাহাবাদ স্টেশনে বসে মশার কামড় খেয়েছি আর ছটফট করেছি। এখন তোমাদের বার্থগুলো ছেড়ে আমাদের একটু শুতে দাও।"

"ইলাহাবাদ স্টেশনে ! কাল রাতে ? তোমরা কি প্লেনে এলে ? না ভূতের ঘাড়ে চেপে ? আমাদের আগে এখানে তোমরা এলে কী করে ?"

ডোরা বলল, "তা হলে শোনো। এই চায়নাটার জন্যই স্টেশনে আসতে দেরি হয়ে গেল কাল। তবুও সাড়ে ন'টায় ট্রেন, আমরা ন'টা পনেরোয় এসেছি। তুফান আর পূর্বা এক্সপ্রেস পাশাপাশি লাইনে ছিল। আমরা যখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছি তখন সবে পূর্বা এক্সপ্রেস ছেড়ে যাচ্ছে। আমরা ভুল করে তুফান ভেবে ছুটে গিয়ে সেই গাড়িতেই উঠে পড়ি। উঃ, সে কী প্রচণ্ড ভিড় ট্রেনে ! ট্রেনে ওঠার পরই অবশ্য ভুল ভাঙল আমাদের। তবু ভেবেছিলাম বর্ধমানে নেমে গাড়ি বদল করে নেব। কিন্তু ইতিমধ্যে চেকারের হাতে পড়ে গেছি আমরা। তাঁর মুখে শুনলাম এই গাড়িতে নাকি বর্ধমানের টিকিট হয় না। অনেক দূরের স্টেশনের টিকিট কাটতে হয়। তাই ফাইন দিয়ে ইলাহাবাদের টিকিটই কেটে নিলাম।"

"ইলাহাবাদে কখন নামলে তোমরা ?"

"রাত সাড়ে দশটায়। তখন থেকেই ফড়িংয়ের মতো বড়-বড় মশার কামড় খেয়ে সারারাত জেগে তোমাদের জন্য ভোরের প্রতীক্ষা করেছি। এখন আমরা বড় ক্লান্ত বাবলু, ঘুমে দু' চোখ বুজে আসছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চায়না ও ডোরাকে বার্থ ছেড়ে দিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করতে লাগল। ওদের রেলযাত্রায় এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

(ক্রমশ)

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস

(শে ষাং শ)

গোয়েন্দা সব্যসাচী

মণিশঙ্কর দেবনাথ

চৌধুরীবাড়ির দেওয়ালে ঝাপসা ফলকে এই অট্টালিকা তৈরির সালতারিখ লেখা আছে। সিমেন্টের আস্তরণ খসে পড়েছে, বটগাছের ঝুরির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ফলকটা। সব্যসাচীদা টর্চ জ্বেলে রোহিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "চার পুরুষ আগে তৈরি বাড়ি। কী মজবুত, এখনও ভেঙে পড়বার কোনও চান্স নেই।"

গোপীমোহন গ্রেফতার হওয়ার পরে চৌধুরীবাড়ি এবং দুর্গামণ্ডপে কীরকম থমথমে একটা ভাব। এই বাড়িতে আজন্ম লালিতপালিত মানুষটা শেষপর্যন্ত এই অনুচিত কাজটি করবে, কেউই ভাবতে পারেনি। দুর্গামোহনবাবুর প্রতিবেশী নয়নবাবু বয়স্ক মানুষ। তিনি খুব ব্যথিত গলায় বলে উঠলেন, "মানুষকে আজকাল বিশ্বাস করা শক্ত। আমি তো গোপীকে দেখে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি ও এইসব কাজে জড়িয়ে পড়বে।"

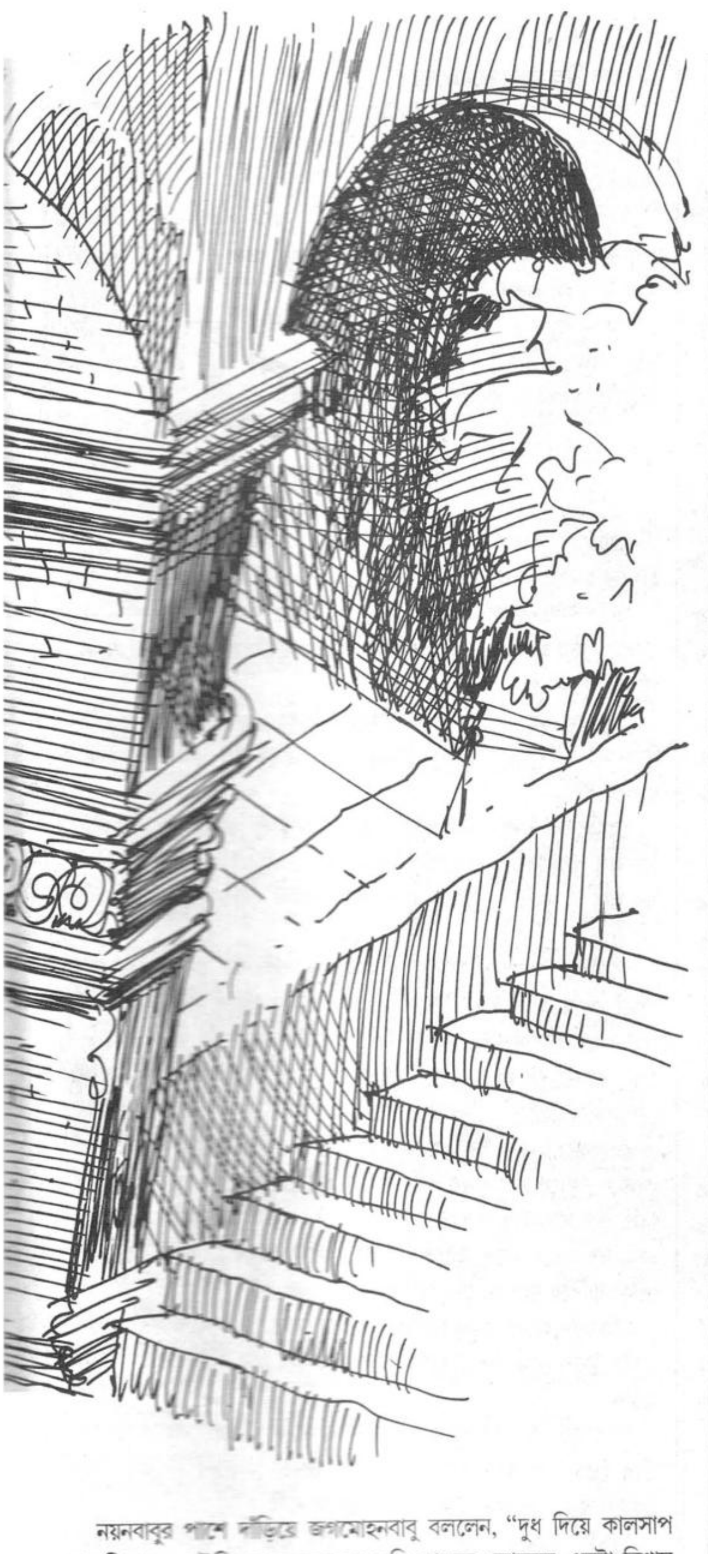

নয়নবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে জগমোহনবাবু বললেন, "দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম। বউদিকে হাজারবার বলেছি কাজের লোককে এতটা বিশ্বাস কোরো না। দেখলে তো, হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে গেল। চোর, জোচ্চোর। দ্যাখো গিয়ে কোথায় মূর্তি হাপিস করে দিয়েছে।"

জগমোহনবাবুকে সমর্থন করে নয়নবাবু বললেন, "মশাই, দিনেদুপুরে ডাকাতি। জেলে দিলেও এ চুরির অন্যায় ক্ষমা করা যাবে না।"

মণ্ডপের মাঝখানের চেয়ারে বসে ছিলেন দুর্গামোহনবাবু। সব্যসাচীদা এগিয়ে গিয়ে বলল, "তা হলে আমাদের ছুটি দিচ্ছেন তো ?"

সব্যসাচীদার প্রশ্ন শুনে দুর্গামোহনবাবু বললেন, "এখনও তো গোপী স্বীকার করেনি। তবে..."

"পুলিশের মারধোরে স্বীকার করবে, তাই তো।" উলটো দিকে চেয়ার টেনে নিয়ে সব্যসাচীদা বসতে-বসতে বলল, "গোপীমোহন কি একাই এই কাজটা করেছে ?"

"তা আমি কী করে বলব ? ওটা তো পুলিশের ব্যাপার।" অন্তত একজনকে পুলিশ ধরতে পেরেছে দেখে দুর্গামোহনবাবু যেন নিশ্চিন্ত বোধ করছেন।

"দুর্গামোহনবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?" সব্যসাচীদাকে দেখে মনে হল প্রশ্নটা করবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল।

"করুন।"

"আপনাদের ওই সোনার দুর্গামূর্তি সম্পর্কেই কয়েকটা কথা জানতে চাই।" দেখলাম, সব্যসাচীদার প্রশ্ন শুনে দুর্গামোহনবাবু মোটেই বিরক্ত হননি। বরং মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "আমাদের বংশের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ ত্রিগুণামোহনের সঙ্গে কাল কথা বলিয়ে দেব। কানে একটু কম শোনেন বটে, তবে ধৈর্য ধরলে অনেক ঘটনা জানতে পারবেন। তবে কয়েকটা কথা আমি বলতে পারি, সেটা হচ্ছে এই মূর্তিটা পেয়েছিলেন আমার প্রপিতামহ। উনিই এই পুজো চালু করেছিলেন।"

"আর-একটা কথা, গত ক'দিন কি আপনারা গোপীমোহনের আচার আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছিলেন ?"

"কই, না তো। রোজকার মতোই স্বাভাবিক।" দুর্গামোহনবাবু বললেন, "ছোট থেকেই তো দেখছি। কোনও গোলমাল নেই। তবে অসৎসঙ্গে পড়লে ভাল ছেলেও খারাপ হয়ে যায়।" দুর্গামোহনবাবুকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাল। তিনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। মনে হল, গোপীমোহনের গ্রেফতার তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।

দুর্গামোহনবাবু বললেন, "আপনিই বলুন, ওর বাবা কৃষ্ণলাল ছিল একেবারেই সাত্ত্বিক মানুষ। সারাদিন ধর্মকর্ম নিয়েই থাকত। এ-বাড়ির রাধামাধবের পুজো আজীবন সে করে এসেছে। তার ছেলে এইরকম একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে, তা কি কল্পনা করা যায় ? পুলিশ যখন তাকে ধরেছে, তখন খামোখা তো ধরেনি। নিশ্চয় কোনও সূত্র পেয়েছে।"

সব্যসাচীদা তার কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে, "গৌতমমোহনবাবুকে কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ?"

"দুপুর থেকেই। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। দুপুরবেলায় খাওয়ার জন্য ওকে ডাকতে গিয়ে দ্যাখে, ঘরে গৌতমমোহন নেই। প্রথমে ভেবেছিলাম ছাতে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু সন্ধে পর্যন্ত তার হদিস পাওয়া যায়নি।"

"এমন তো হতে পারে, গৌতমবাবু কোথাও গেছেন, এই ধরুন কোনও বন্ধুর বাড়ি।"

"না, না। ওর কোনও বন্ধুর বাড়ি নেই। আসলে গৌতমমোহনের কোনও বন্ধু আছে বলে তো শুনিনি। তা ছাড়া অমন বায়ুগ্রস্ত লোকের বন্ধু থাকতে পারে না। দিনের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই বেচারা ঘুমিয়ে কাটায়। ওর না আছে কেউ, দু-তিন বছর বয়স থেকেই আমাদের এখানে আছে। কাজকর্ম কিছুই করতে চায় না, বড় অলস প্রকৃতির লোক।"

"এই ঘটনার ব্যাপারে আর কাউকে সন্দেহ হয় ?" সব্যসাচীদা প্রশ্নটা করেই দুর্গামোহনবাবুর দিকে সরাসরি তাকাল।

"এখন তো সকলকেই সন্দেহ হয়। মনে হচ্ছে প্ল্যানটা দীর্ঘদিন ধরেই করা হয়েছিল, কিন্তু ঠাকুরঘরের চাবি যেহেতু আমার কাছে থাকে, তাই সেখান থেকে গায়েব করতে পারেনি।"

দুর্গামোহনবাবু চেয়ার থেকে উঠে যাওয়ার জন্য উসখুস করতে লাগলেন। সব্যসাচীদা না হয়ে অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলে সম্ভবত জবাব দিতেন না। সব্যসাচীদাকে দেখলাম আঙুল তুলে কী একটা দেখাতে। তারপর দুর্গামোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "গৌতমবাবুর ঘরটা একটু দেখতে চাই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। ওই যে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি, সিঁড়ির বাঁ দিকে ছোটমতো ঘরেই ও থাকত। দাঁড়ান, প্রহ্লাদকে ডাকছি।"

"প্রহ্লাদকে ডাকতে হবে না। আমরা নিজেরাই যাচ্ছি।" তারপর আমাদের ইশারা করল বারান্দার দিকে যেতে।

রোহিত বলল, "সব্যসাচীদা, গৌতমবাবুও কি এই ব্যাপারে জড়িত ?"

"সবসময় প্রশ্ন করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।" রোহিতের পিঠে হাত রেখে সব্যসাচীদা বলল, "ওয়েট অ্যান্ড সি।"

বারান্দাতে ঢুকে সোজা হেঁটে সিঁড়ি। পুরনো আমলের কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির বাঁ দিকে ছোট একটা দরজা। দরজা ভেজানো ছিল। অল্প ধাক্কাতেই দরজাটা খুলে গেল। আমরা প্রায় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লাম। ছোট ঘরে একটা খাট। খাটের ওপর অপরিষ্কার একটা চাদর। সারা ঘরে তেমন কিছু আসবাবপত্র নেই। জানলার দিকে তাকিয়ে সব্যসাচীদা বলল, "জানলায় কোনও শিক নেই। টোটালি ওপেন উইন্ডো।"

জানলার দিকে এগোতেই নজরে পড়ল একটা শিশি ভেঙে পড়ে আছে। শিশির ভেতরে হলুদ রঙের কয়েকটি বড়ি। শিশিটা হাতে তুলে নিয়ে সব্যসাচীদা রোহিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঘুমের আয়ুর্বেদ বটিকা। কী, খাবে নাকি হে ?"

রোহিত হেসে মাথা নাড়ল।

গরাদেহীন জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে সব্যসাচীদা দুঃখপ্রকাশের ভঙ্গিতে বলল, "বেচারা ! ওষুধগুলো নিয়ে যেতে পারেনি।" জানলা থেকে ঘোরানো লোহার একটা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িটার দূরত্ব জানলা থেকে ফুটদশেক। সিঁড়ির নীচে অনেক ঝোপঝাড়। সিঁড়িটা সোজা উঠে গেছে তিনতলায়। তবে এই সিঁড়ি দীর্ঘদিন ব্যবহার করা হয় না, সিঁড়ির গায়ে লতানো গাছ অনেকটাই উঠে গেছে। সব্যসাচীদাকে দেখলাম, সিঁড়িটা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে।

রোহিত বলল, "খুব বাজে একটা ঘরে থাকেন গৌতমমোহনবাবু।"

ঘরটা শুধু বাজে নয়, বিপজ্জনকও বটে। সব্যসাচীদা টর্চ জ্বেলে জ্বেলে সিঁড়ির চারপাশটা দেখছে, সাপখোপ অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে। ওঁদের পূর্বপুরুষরা কেন যে এই ঘরের জানলায় শিক বা গ্রিল জাতীয় কিছু লাগাননি,বুঝতে পারছি না। তখন চোর-ছ্যাঁচড়ের উৎপাত না থাকলেও বিষধর সাপের উৎপাত নিশ্চয় ছিল। সাপেরা চিরকালই ভয়ঙ্কর। গৌতমমোহনের ঘরটা কী এত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছেন, রোহিত কিংবা আমি বুঝতে পারছি না। ভীষণ অগোছালো একটা ঘর, এ-ঘরে মানুষের থাকা অসাধ্য !

"গৌতমবাবুর জন্য এই ঘর বরাদ্দ করেছে , ইস, কী নিষ্ঠুর ওরা।"

আমি বললাম, "ওদের তো আরও ঘর ছিল !"

"ছিল। কিন্তু লোকটা সংসারের বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়।" সব্যসাচীদা খাটের নীচে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে বলল, "এসব লোকের জন্য এই ঘরই উপযুক্ত বলে মনে করেছেন দুর্গামোহনবাবুরা। রোহিত, নিরাশ্রয় লোকের জন্য এই ঘরই যথেষ্ট।"

রোহিত বলল, "অন্তত জানলাটায় গ্রিল দিয়ে দিতে পারত।"

"রাজারাজড়াদের খেয়াল। আর দুর্গামোহনবাবুরা বাড়তি খরচ করতে চাননি।" খাটের নীচে টর্চ জ্বেলে সব্যসাচীদা কী যেন খুঁজছে। মিনিট দুয়েক খোঁজাখুঁজির পর একটা খাতা বের করে আনল। "কাব্য চর্চার বাতিকও ছিল গৌতমমোহনের।"

খাতার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে সব্যসাচীদার ভুরু কুঁচকে উঠল, "গৌতমবাবু কিন্তু বদ্ধ পাগল নন। কী মৈনাক, সেদিন তো কথা বললে, পাগল মনে হল ?"

"পুরো নয়। তবে সম্পূর্ণ সুস্থও নন। কথাবার্তায় কীরকম অস্বাভাবিকতা ছিল।" আমার হয়ে রোহিতই বলল, "সময়ের ব্যাপারটা নিয়ে কীরকম অদ্ভুত উত্তর দিলেন, মনে আছে ?"

"মনে আছে। তবে ভদ্রলোক কবিতা লেখার চেষ্টায় ছিলেন, যদিও ওল্ড এজের লেখা। আই মিন, আজকাল চলবে না। এই দ্যাখো, এই খাতাটায় দু-চারটে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন।—

বাতাস হইয়াছে ধূমায়িত
শমীবৃক্ষে কী লুক্কায়িত ?
আমি নহি ভীত—"

রোহিত আর আমি হেহো করে হেসে উঠলাম। রোহিত হাসতে-হাসতে বলল, "একেবারেই পাগল। এটা কি কবিতা ?"

সব্যসাচীদা বলল, "আমি এক দার্শনিকের কথা জানি, যিনি দিনের বেলায় লণ্ঠন হাতে সত্যিকারের মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। বলো, তিনি পাগল ছিলেন ?"

"না, মোটেই না। তবে গৌতমমোহনবাবুর এসব পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু নয়। রোহিত বলল, "বলুন তো এসব কি কোনও ম্যাগাজিন ছাপবে ?"

রোহিতের কথার জবাব না দিয়ে সব্যসাচীদা খাতার পাতা ওলটাতে লাগল। বেশিরভাগ পাতাতেই হিজিবিজি লেখা, আঁকিবুকি কাটা। বিচিত্র সব ছবি। খাতাটা পকেটে পুরে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে লাগল সে।

"রোহিত, আজ রাত্তিরে আমি একটা অভিযান করব, তোমরা কি আমার সঙ্গে আসবে ?" টর্চটা জানলার বাইরে জ্বেলে সব্যসাচীদা বলল, "গৌতমমোহন নিখোঁজ হয়েছে কি না সেটা ভালভাবে জানা দরকার। এখন আমরা যে যার বাড়িতে চলে যাব, রাত বারোটা নাগাদ মিট করব কেয়াতলার মোড়ে। ঠিক রাত বারোটায়।"

গৌতমমোহনের ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। দুর্গামোহনবাবুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মণ্ডপের সামনে আসতেই দেখি জগমোহনবাবু চেয়ারে শরীর এলিয়ে একমনে চুরুট টেনে চলেছেন। আমাদের দেখে বলে উঠলেন, "কী গোয়েন্দাপ্রবর। পুলিশ তোমাদের বোকা বানিয়ে অপরাধীদের পাকড়াও করে নিল ?"

"জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে মাত্র।" সব্যসাচীদাও পালটা একটা উত্তর ছুড়ে দিল, "যাকে ভালভাবে বলা যায়, সন্দেহভাজন হিসেবে আটক।"

"তোমরা কি পুলিশেরও ওপরে যাও নাকি ?" জগমোহনবাবুর গলায় তীব্র শ্লেষ, "বাহাদুর ছেলে বটে ! তা গৌতমমোহনের নিখোঁজ হওয়ার পেছনে নতুন কোনও রহস্যের খোঁজ পেলে নাকি ?"

"চেষ্টা চলছে। তবে কারণ ছাড়া কার্য ঘটে না, আমি এই লজিকেই বিশ্বাসী।" সব্যসাচীদা কথাটা বলেই জগমোহনবাবুর দিকে সরাসরি তাকাল, "আপনিও নিশ্চয় এই লজিকে বিশ্বাস করেন ?"

সব্যসাচীদার প্রশ্ন শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন অভিজ্ঞ উকিল জগমোহনবাবু, "ও, শিওর। আমরা তো ওই পলিসিতেই চলি। আজগুবি সব গল্প তো জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা বিশ্বাস করবেন না।... যাক, তুমি রাগ করোনি তো ? আমি কিন্তু রসিকতা করলাম। এই দ্যাখো না, দাদা-বউদির কী অঘটনটাই না ঘটে গেল !"

"কোন অঘটনটা ?"

"সে কী ! তুমি দেখছি আকাশ থেকে পড়লে। আরে বাপু, গোপীর কাণ্ড দেখলে তো ? দুধকলা দিয়ে সাপ পুষছিলাম, দাঁত গজাতেই ছোবল চালিয়ে দিল।"... গোপীমোহন গ্রেফতার হওয়াতে জগমোহনবাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন, "ওফ ! কী টেনশনই না হয়েছিল ! না, না, মানুষকে আর বিশ্বাস নেই।"

"গোপীমোহনবাবুকে কবে থেকে দেখছেন ?" সব্যসাচীদা চট করে রেগে যায় না, এ-ক'দিনে খুব লক্ষ করছি।

"সে এই বাড়িতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে। তবে গত কুড়ি বছর আমার তো নিয়মিত এ-বাড়িতে আসা হয় না—এই হয়তো বছরে একবার এলাম, তাও দিন তিন-চারেকের জন্য, ঝটিকা সফর বলতে পারো। মন পড়ে থাকে মক্কেলদের কাছে। বিস্তর সমস্যা। তা ছাড়া..." একটু থেমে জগমোহনবাবু বললেন, "ওদের লক্ষ করা তো আমার কাজ নয়।"

"কাজটা যে-ই করে থাকুক না কেন, একা করেনি কিন্তু।" প্রশ্নটা করেই সব্যসাচীদা ঘড়ির দিকে তাকাল। অর্থাৎ আর বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। কারণ নৈশ অভিযানে যেতে হবে, সম্ভবত সেই ব্যাপারটাকেই গুরুত্ব দিতে চাইছে সব্যসাচীদা।

"হতে পারে। আজকাল সংগঠিত অপরাধের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। সেদিন কোনও একটা কাগজে এ-সম্পর্কে একটা 'আর্টিকল' পড়ছিলাম। খুব নির্ভরযোগ্য লেখা। জগমোহনবাবু বললেন, "আরে বাপু, এই 'অর্গানাইজড' ব্যাপারটা ভাল কাজে দেখালে দেশ কত এগিয়ে যেতে পারত। তা নয়, যত মনোযোগ ওই ক্রাইমে।"

দেখলাম, গোড়ার দিকে জগমোহনবাবু যতটা শ্লেষ-বিদ্রূপ দেখাচ্ছিলেন, সব্যসাচীদার সুচলো কথাবার্তায় নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন।

"তবে একটা ব্যাপার আমাকে খুব ভাবাচ্ছে।" সব্যসাচীদা বেশ চিন্তিত মুখেই বলল, "অপরাধী বা অপরাধীরা খুব নিষ্ঠুর মনের লোক, সাদামাঠা মানুষের পক্ষে এ-ধরনের দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। কী বলেন জগমোহনবাবু ? আপনি কি আমার সঙ্গে একমত ? সংগঠিত অপরাধের নমুনা দেখে অপরাধীদের চালচলনও বোঝা যায়।"

জগমোহনবাবু 'ওসব কাজের লোকের কাণ্ড' বলে চালালেও সব্যসাচীদা তা মানতে নারাজ। সব্যসাচীদার যুক্তি শুনে ভদ্রলোক কেমন যেন থম মেরে গেলেন। মাথা নেড়ে 'হুম' বলে ফের পাইপ টানায় মন দিলেন।

মণ্ডপের বাইরে এসে সব্যসাচীদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখলে তো, অভিজ্ঞ উকিলমশাই চিন্তায় কীরকম পড়ে গেলেন। শমীবৃক্ষে কী লুক্কায়িত, আমি নহি ভীত।...গৌতমমোহনবাবুর কবিতার রসিক পাঠক হয়ে উঠেছি আমি।"

রাত্রিবেলায় আমি কী করে বেরোলাম, তা একমাত্র আমিই জানি। চিরগম্ভীর পিতৃদেব আজ কেন জানি না, ঘুমোবার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। বাবা বিছানায় মশারি টাঙিয়ে দিলেও যে জেগে আছেন, বিলকুল বুঝতে পারছি। এগারোটা তিরিশ নাগাদ মাকে ডাকলেন, "তুমি তখন অত জোর করলে, জানো তো ঘি আমার সহ্য হয় না। একটা অ্যান্টাসিড দাও দেখি," বলে মশারিটা তুললেন, "উফ, এখন কী যে অস্বস্তি হচ্ছে।...দাও-দাও—অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। বড্ড অম্বল হচ্ছে। এ বয়সে..."

জ্যাঠাকেও অকুস্থলে দেখতে পেলাম। অর্থাৎ এবার লড়াইটা ত্রিমুখী হবে, অতএব আমার সামনে ফাঁকা মাঠ। এখন বাড়ি থেকে 'ভ্যানিশ' হয়ে গেলে কাল সকালের আগে আমার খোঁজ পড়বে না, আমি এ ব্যাপারে হানড্রেড-টেন পার্সেন্ট নিশ্চিত।

জ্যাঠা বললেন, "তোকে সাধাসাধি করলেই তুই গ্রোগ্রাসে গিলবি ? না, না, এটা কোনও কাজের কথা নয়। এ- বয়সে লোভ হচ্ছে মৃত্যুর সমান।"

বাবা গ্লাসে করে জল দিয়ে ওষুধ খাচ্ছেন, "কিন্তু ও অত করে বলল, পুজোর দিন....। ধুত ! জল কেন, চুষে-চুষে খেতে হবে।"

আমি কখন বিছানা থেকে নেমে গেছি, কেউ টের পায়নি। যাওয়ার আগে মায়ের বিছানায় চিরকুট রেখে গেলাম,'কাল সকালে ফিরব। চিন্তা কোরো না।' বাইরে বেরিয়েই দেখি গাছতলাতে লাইট জ্বলছে। রোহিত। আমি দেরি করছি দেখে রোহিত বেচারা বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। কথা ছিল, যে-ই আগে বাড়ি থেকে বেরোবে, সে গাছতলায় এসে টর্চের আলো জ্বালবে।

রোহিত বলল, "এনি প্রব্লেম ?"

"অ্যান্টাসিড প্রবলেম। অ্যান্টাসিডের জন্য লেট..."

প্রশংসা করলে রোহিত একটু খুশিই হয়। আবছা অন্ধকার-আলোয় রোহিতের মুখে যেন একটু হাসি ফুটতে দেখলাম।

"এখন কোথায় যাব ?"

"রিকশা স্ট্যান্ড। রিকশা করে পোস্ট অফিস। তারপরের অপারেশন সব্যসাচীদা জানেন।"

"রাত্রিতে আমার কিন্তু বাড়ি ফেরা যাবে না !"

"ঠিক আছে।"

"ক'টা বাজে ?"

"এগারোটা পঁয়তাল্লিশ।"

এখন চারদিকে বেশ অন্ধকার। দশমীতেই নন্দনপুর যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলে একমাত্র পুজো ওই চৌধুরীদের। উঁচু রাস্তার দু'ধারে মাইলের পর মাইল ধানখেত। হিম-হিম হাওয়া গায়ে লাগছে। রিকশা বেশ জোরেই ছুটছে।

রোহিত বলল, "সব্যসাচীদা কী চাইছে, বুঝে উঠতে পারছি না।"

আমি জবাব দিচ্ছি না। হিম-হিম হাওয়া গায়ে লাগতে বেশ ঘুম পাচ্ছে। পোস্ট অফিসের সামনে আসতেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোক বলে উঠল, "অ্যাই রোককে।"

রোহিত আর আমি চমকে উঠেছি।

"চিনতে পারছ ?"

"মানে..."

"আমি সব্যসাচীদা।"

এমন নিখুঁতভাবে বৃদ্ধ লোকের মেক-আপ নিয়েছে যে, তাকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না।

রোহিতের বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি, "অবিশ্বাস্য !"

"অবাক হওয়ার কিছু নেই হে। ছদ্মবেশ তোমাদেরও নিতে হবে। ফাইনাল পয়েন্টে পৌঁছবার আগে অপরাধীদের বুঝতে দেব না।"

"এত নিখুঁত মেক-আপ কীভাবে নিলেন ?" রোহিত যথারীতি নিজের মতো করে প্রশ্ন করা শুরু করে দিয়েছে।

"এখন প্রশ্ন নয়। খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে। যাও—পোস্ট অফিসের পাশের গলিতে ছদ্মবেশ রাখা হয়েছে, তোমরা চট করে পরে নাও। জামাপ্যান্টগুলো রিকশার সিটের নীচে রাখবে। গো, স্টার্ট—"

ছদ্মবেশ নিয়ে সব্যসাচীদার সামনে দাঁড়াতেই 'ওয়েল ডান' শব্দটা শুনতে পেলাম। সব্যসাচীদা বলল, এখন আয়নায় নিজেদের দেখলে নাকি চিনতেই পারব না। আমাদের চেহারায় নাকি 'আমূল পরিবর্তন' ঘটে গেছে। দু'জনের মধ্যে কার ছদ্মবেশটা ভাল হয়েছে, আমাদের গোয়েন্দাদার ভোট অবশ্য আমার পক্ষেই গেল। এবারও প্রশ্নটা করেছিল রোহিত, উত্তরটা শুনে বেচারা একটু চুপসেই গেছে।

কবিতা

রং-বেরং

রত্নেশ্বর হাজরা

সন্ধে হয়ে যেমনি আসে অমনি করে চুরি
সব ক'টা রং লুকোয় যেন কোথায় !
দু-একটা দিন হয়তো দেখে দিন-কানা চাঁদ বুড়ি।
এই চুরিকে সত্যি কি আর চৌর্য বলা যায় !

লুকোয়, আবার লুকোচুরির খেলাতে রোজ ফেরায়
সবক'টা রং, সুয্যিকে তাই ক্যাম্‌নে দেব দুয়ো,
এইখানে সব ঘুমোও যখন ওইখানে হয় খেলা,
তার কাছে নও কেউ দুয়ো কেউ সুয়ো।

ওই গোলার্ধে সন্ধে যখন, সেইখানে হয় চুরি
তখন আবার এই গোলার্ধে পাচ্ছ সকালবেলায়,
সাতরঙা রোদ মুঠোয় নিয়ে ডোবাও তুলি তাতে
যতক্ষণ না আবার লুকোয় লুকোচুরির খেলায়।

লালের মধ্যে লাল ভাসন্ত আর গেছে সব চুরি,
সবুজ পাতায় জাগছে সবুজ, আর জেগে নেই কেহ,
কালোর কাছে কেউ থাকে না, সাদায় খেলে সবাই
তা-ও তোমাদের যাচ্ছে না সন্দেহ !

রোদের কী রং বলতে পারো ? পারলে না তো ! শোনো
রোদ মেখেছে সবক'টা রং, তাই হয়েছে সাদা,
রাতের গায়ে রং মাখা নেই তাই দেখাচ্ছে কালো,
রং-মাখা রাত হয় না, হলে লাগত চোখে ধাঁধা।

হঠাৎ যদি তা-ও কিছু হয় ওলটপালট করা
সুয্যি নামক তারার দেহে হৈ হৈ রৈ কাণ্ড,
কী হবে কেউ ভাবতে পারো ! ছাই যদি হয় সূর্য
হয়তো বেবাক বরফ, নয়তো ভস্ম এ-ব্রহ্মাণ্ড।

সন্ধে হলে সবক'টা রং সূর্য করে চুরি
কিন্তু ফেরায় ভোরবেলা, তাই ক্যামনে দেব দুয়ো,
সবাইকে দেয় রঙের তুলি, সবাই আঁকো চিত্র—
তার কাছে নও কেউ দুয়ো কেউ সুয়ো।

ছবি : দেবাশিস দেব

রোহিত বলল, "এবার কী করতে হবে ?"

"ধীরে বৎস।" সব্যসাচীদা বলল, "কাল যেখানে লোহার সিঁড়িটা দেখতে পেয়েছিলে, সেই সিঁড়ির নীচে রোহিত দাঁড়াবে। আমি আর মৈনাক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠব। আমরা না আসা পর্যন্ত তুমি নড়বে না। তোমার এক হাতে থাকবে টর্চ, অন্য হাতে এই হকি স্টিক। কেউ আক্রমণ করলে—"

"সপাটে চার।" রোহিত হকি স্টিকটা হাতে নিয়ে চালিয়ে দিতে-দিতে বলল, "একেবারে সদর হাসপাতালে।"

"কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ো। থিয়োরি এবং প্র্যাকটিস, দুটোই আলাদা জিনিস।" রোহিত এবার চুপ করে গেল।

"মৈনাক, তুমি আমার সঙ্গে এসো। চৌধুরীবাড়িতে এখন আমরা চোরের ভূমিকায়।"

সব্যসাচীদার হাবভাব বেশ রহস্যময় লাগছে। দুর্গামোহনবাবুরা নিশ্চিত যে, অপরাধী ধরা পড়েছে। কিন্তু আমাদের গোয়েন্দাপ্রবর বলছেন খেল এখন সবে শুরু। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তিনজনে চোরের মতো চৌধুরীবাবুদের বাড়ির পাঁচিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। প্রথমে রোহিত, তারপরে আমি, সকলের শেষে সব্যসাচীদা। পাঁচিল ঘেঁষেই নিমগাছ। সুতরাং নামতে খুব একটা অসুবিধে হল না। বিশাল উঠোন পেরিয়ে আমরা একেবারে দুর্গামোহনবাবুদের বাড়ির পেছনদিকটায় পৌঁছে গেছি। দূরের মণ্ডপে দু'জন ঢাকি ঘুমোচ্ছে। স্টলগুলো ফাঁকা। রোহিতকে নীচে দাঁড় করিয়ে লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল সব্যসাচীদা। এখানে ঘন জঙ্গল, বড়-বড় গাছও আছে।

"তোমার কি ভয় লাগছে ?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সব্যসাচীদা।

আমার ঠিক ভয় নয়, রোমাঞ্চ লাগছে। ধরা পড়লে ভয়ের কিছু নেই, সব্যসাচীদা আছে।

বললাম, "একেবারেই নয়।"

লোহার সিঁড়িতে বেয়ে ওঠা গাছগুলো পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কোনও অসুবিধে নেই। এরকম সিঁড়ি আমি আগেও চড়েছি। এই সিঁড়ি এখন আর ব্যবহার করা হয় না। তিনতলায় উঠে দেখা গেল, ঢোকার দরজা বন্ধ।

"এখন কী হবে ?"

"নো প্রবলেম।" বলেই আলতো চাপ দিল সব্যসাচীদা, "আরে ! আমাদের আগেও এখানে লোক এসেছিল। মৈনাক, এগিয়ে এসো। ধীরে-ধীরে পা রাখো, হ্যাঁ, ঠিক এইভাবে। বারান্দায় খুব ধুলো। নাকে রুমাল চাপা দাও।"

সব্যসাচীদার হাতের টর্চ সার্চলাইটের মতো ঘোরাফেরা করছে। ধুলো, মাকড়সার জালে ভরা এই বারান্দাতে আছে বহুদিনের অব্যবহৃত পিয়ানো, ভাঙা আলমারি, শ্বেতপাথরের চেয়ার-টেবিল। মনে হচ্ছে, দুর্গামোহনবাবুদের একপুরুষ আগেও এই জিনিসপত্রে হাত পড়েনি।

"এ জায়গায় কারও আসার চান্স নেই।" আমি ফিসফিস করে বললাম।

"থাকতেও পারে। কাঁকড়াবিছে ! মৈনাক, দ্যাখো।" সব্যসাচীদার টর্চের আলো পড়েছে পিয়ানোর রিডের ওপর। রিডের ওপর হুল নাড়ছে কালো কুচকুচে একটা কাঁকড়াবিছে !

আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। তারপরই, সব্যসাচীদা যা করল তার জন্য তৈরি ছিলাম না। হাতের হকি স্টিকটা চালিয়ে দিল কাঁকড়াবিছেটাকে লক্ষ্য করে।

"মিসফায়ার !" আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। কাঁকড়াবিছেটা টুক

করে পিয়ানোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই সব্যসাচীদা এগিয়ে গেল, আমাকেও এগিয়ে যেতে বলল।

সব ঘর তালাবন্ধ। দরজা জুড়ে মাকড়সার জাল ছড়িয়ে আছে।

মেঝের ওপর টর্চের আলো ফেলে সব্যসাচীদা বলল, "নিরীহ গোপীমোহন কি এতদূর আসতে পারবে? তবে এখানে কারও পায়ের ধুলো পড়েছে।" কার পায়ের ধুলো পড়েছে? এই পরিত্যক্ত জায়গাতে গৌতমমোহনের মতো হাফ-পাগল লোকও আসতে রিস্ক নেবে না।

"গৌতমমোহনবাবু?"

"সে বদ্ধুগ্রস্ত লোক। তার জন্য গ্রিলবিহীন জানলা আছে। মনে হয়, তাতেই গৌতমবাবু সুখে ছিলেন।"

সব্যসাচীদা কথাটা বলেই, টর্চের আলো ফেলল দেওয়ালে। দেওয়ালে ঝোলানো পুরনো ফোটো। সম্ভবত দুর্গামোহনবাবুদের কোনও পূর্বপুরুষের ছবি।

"কাকাতুয়ারও গৌতমমোহনের মতো দশা হয়েছে। কিন্তু কেন ওদের এই দশা হয়েছে, ভেবেছ কি?"

"জানি না।"

"জানি না বললেই কি সহকারীর দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল?" আমি কোনও জবাব দিচ্ছি না। সব্যসাচীদা প্রতিটি দরজায় টর্চের আলো ফেলে দেখছে। আমার সারা শরীর ঘেমে যাচ্ছে, কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছে। কোনওরকমে বললাম, "আর কতক্ষণ থাকতে হবে?"

"জাস্ট কয়েকটা জিনিস দেখে নিচ্ছি। শেষের তিনটে ঘরের তালা দেখা যাচ্ছে না, আসবাবপত্রে ঢেকে আছে।" সব্যসাচীদা চাপা গলায় বলল, "মৈনাক, সাবধানে এগিয়ে এসো। বিষাক্ত কাঁকড়াবিছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভুল হলেই হুল ফুটিয়ে দেবে।"

আসবাবপত্রে ঢাকা দরজাগুলোর দিকে টর্চের আলো ফেলতে লাগল সব্যসাচীদা। তারপর আস্তে-আস্তে পিছিয়ে এসে বলল, "এবার নামতে হবে। সাবধান, খুব আস্তে-আস্তে নামো।"

বাইরে এখন গভীররাত। দুটো কি আড়াইটে বাজে। চৌধুরীবাড়ির সকলেই ঘুমে ডুবে আছে। সব্যসাচীদা খুব সাবধানে নামছে। তার পেছনে-পেছনে আমি।

নীচে নেমেই চমকে উঠলাম। দেখলাম, রোহিতের হকি স্টিক আর টর্চটা পড়ে আছে। রোহিত নেই!

সব্যসাচীদা অবাক হয়ে বলল, "রোহিত, রোহিত কোথায় গেল?"

কপা এগোতেই দেখলাম, জঙ্গলে চিত হয়ে পড়ে আছে রোহিত। চোখে টর্চ পড়তেই সে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

॥ ৫ ॥

চৌধুরীবাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ ত্রিগুণামোহনবাবুর ঘুম ভেঙে যায় সকলের আগে। ঘুম ভেঙে তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে সামনের বাগানে কয়েক ঘণ্টা বসে থাকেন। সকালের প্রাতরাশ ওখানেই সেরে নেন। সব্যসাচীদা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায় জেনেও কোনও ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। আমাদের পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গেছে। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। কাল রাত্রের অভিযানের পর দশটা পর্যন্ত ঘুম দিয়ে নিয়েছি। রোহিত গুরুতর জখম হয়নি, পেছন থেকে কারা যেন প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। সব্যসাচীদা বলল, আতঙ্কে কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল রোহিতের। তবে বিপদ কিছু হয়নি, ঠিক সেই সময় আমরা না এসে পড়লে খারাপ কিছু হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কে আক্রমণ করেছিল, রোহিত তা বলতে পারেনি।

আমরা রিকশা করে চৌধুরীবাড়ির মণ্ডপের সামনে আসতেই দেখি জগমোহনবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণমোহন হাত নেড়ে কী যেন বলছেন। কৃষ্ণমোহনের সেই আস্ফালনের ভঙ্গি। জগমোহনবাবুকে কিছু একটা বলতে শুনলাম। আমাদের দেখে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

সব্যসাচীদা বলল, "দু'জনে ভাল জমে কিন্তু। একেবারে মেড ফর ইচ আদার।" দুর্গামোহনবাবু বললেন, "ত্রিগুণাবাবুকে বলেছি, ওই তো ওখানে বসে আছেন। দাঁড়ান, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

পুরনো আমলের কারুকার্যকরা বেতের চেয়ারে বসে আছেন অশীতিপর ত্রিগুণামোহন। ওঁর বয়সের হিসেবটা অবশ্য দুর্গামোহনবাবুও দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, "ওঁর কাছ থেকে খবর বের করতে গেলে ধৈর্য ধরতে হবে। কানে খুব একটা ভাল শুনতে পান না, আগেই বলেছি।" সব্যসাচীদা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায় শুনে তিনি ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, "তুমি কেডা? আজ কি বেস্পতিবার? অ রাইহরণ, আমি আজ ল্যাঠামাছ খাব না।"

সব্যসাচীদার ধৈর্য অসাধারণ। সে বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "এ বাড়ির সোনার দুর্গামূর্তি কে পেয়েছিলেন?"

"বললাম তো ল্যাঠামাছ খাব না। কইছি তো, খাব না।"

সব্যসাচীদা দমবার পাত্র নয়। সে আবার কানের কাছে মুখ নিয়ে ওই একই প্রশ্ন করতে লাগল। বৃদ্ধ বারবার 'ল্যাঠামাছ' না খাওয়ার কথা বলতে লাগলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত বললেন, "সে কি আজকার কথা? কয় পুরুষ আগেকার কথা। আমাগো বড়কর্তায় জাহাজে করিয়া ভিনদেশে গেছিল।" বৃদ্ধের আবার স্মৃতিভ্রংশ ঘটল। সব্যসাচীদা তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ একবার মাথা নাড়ছে, আর-একবার রাইহরণের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন।

এই গোলমালের মধ্যেও দেখলাম সব্যসাচীদা কাগজ-কলম নিয়ে নানারকম পয়েন্ট লিখে যাচ্ছে। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা মণ্ডপের সামনে গিয়ে বোসো। আমি সময়মতো পৌঁছে যাব।"

বাগান ছেড়ে বেরিয়ে আসছি, দেখলাম শমীক আর বিজু খুব মন দিয়ে দাবা খেলছে। দামি শার্ট, ট্রাউজার পরা শমীক কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে মাটিতেই বসে পড়েছে।

রোহিতের দিকে আমি ইশারা করতেই সে মুখ টিপে হাসতে লাগল। বিজুর গায়েও একরঙের শার্ট। ধূসর রঙের ট্রাউজার ধুলোতে মাখামাখি। রোহিত তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "একেবারে মানিকজোড়। মেড ফর ইচ আদার।"

পাশে রাখা টেপ রেকর্ডে গান বাজছে। বিদেশি গানের সুর। আমরা ওদের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে শমীক কাঁধ নাড়ল। অর্থাৎ আমাদের এই কৌতূহলকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

"এরা বাংলা গান চালানোর পক্ষপাতী নয়।" রোহিত বলল, "তাও আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত। লোককে বোকা বানাচ্ছে।"

মণ্ডপের সামনের চেয়ারে বসতেই অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের সামনে কৃষ্ণমোহনবাবু জগমোহনবাবুর সঙ্গে ঝামেলা চালিয়ে যাচ্ছেন, "মশাই আমার ডাম্বেল নিয়ে আপনাদের ছেলের কী কাজ? ওই তো পাটকাঠির মতো চেহারা। ব্যায়াম করবার মতো তাকত ওদের আছে?" বলে জগমোহনবাবুর দিকে 'ভস্ম করে দেব' এইরকম চোখ করে তাকালেন।

আধঘণ্টা হয়ে গেল, এখনও সব্যসাচীদার দেখা নেই। ত্রিগুণামোহন পুরনো বেতের চেয়ারে বসে একমনে কী যেন বিড়বিড় করছেন। হয়তো রাইহরণের নাম জপছেন। আজ তিনি কোনও অবস্থাতেই ল্যাঠামাছ খাবেন না।

রোহিত বলল, "তা হলে পোনামাছের ঝোল খেতে দিক। সঙ্গে ধনেপাতা, জিরে।" ওর কথা শুনে আমি না হেসে পারলাম না। তারপরই দেখি কৃষ্ণমোহন গলার স্বর বাড়িয়ে উশীনরবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন।

কৃষ্ণমোহন বললেন, "স্বাস্থ্যই সম্পদ। অ্যাসেট মশাই, এই দেখুন আমার যাট চলছে, দু'বার এন্টেরিক ফিভার হয়েছিল। ব্যস, দ্বিতীয়বার আসলে আমার এক কোবরেজ বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। রোজ বিকেলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসত। একটাও ওষুধ ধরছে না। শেষপর্যন্ত একদিন আচ্ছা মসলা দিয়ে মাংস জমিয়ে খেলাম। পরদিন কোথায় জ্বর? সব হাওয়া।" উশীনরবাবু বললেন, "মাংস খেয়ে জ্বর উধাও?"

"আলবত। যে-সে মাংস নাকি? বনমুরগির মাংস। লাল-লাল ঝুঁটি, ক্ষুরের মতো নখ। দু-দুটো জোয়ান মানুষ লেগেছিল ব্যাটাকে কবজা করতে।"

ঠিক এইসময় সব্যসাচীদাকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। জগমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "খবরটা শুনেছেন জগমোহনবাবু?"

"গোপী সব স্বীকার করেছে, তাই তো! আজকাল এ-ধরনের অপরাধ বেড়েই চলেছে। বাহাদুর বটে পুলিশ! তা, ও নিশ্চয় একা করেনি? আর কে-কে ছিল?" উৎফুল্ল জগমোহনবাবু একটা চুরুট ধরালেন, "সবক'টাকে জেলে ভরে দিতে হবে। প্রত্যেকে ঠাণ্ডামাথার খুনি। তোমাকে কে বলল?"

"থানা থেকে খবর এসেছে। সব্যসাচীদাকে এ-ক'দিনে এই প্রথম হতাশ হতে দেখলাম। উলটো দিকেই চেয়ারে বসে বলল, "প্ল্যানটা অনেকদিন ধরে ফেঁদেছিল। তবে ওকে বাইরে থেকে যতটা বোকাসোকা মনে হয়, আসলে ততটা নয়। পুলিশ ওর শাগরেদদের খুঁজছে।"

"কফি খাবে নাকি?"

"চলতে পারে।"

"অ্যাই রামু, আমাদের দু' কাপ ব্ল্যাক কফি দিয়ে যা।" জগমোহনবাবুকে বেশ টগবগে দেখাচ্ছে। বললেন, "তা মূর্তির ব্যাপারটা কী বলল?"

"শমীবৃক্ষ চেনেন?" সব্যসাচীদার আচমকা এই প্রশ্ন শুনে আকাশ থেকে পড়লেন জগমোহনবাবু, "হোয়াট! কী বলছ, ও তো মহাভারতে পড়েছি।"

"তার দু-একটা নমুনা এ-গ্রামে নাকি এখনও আছে।"

জগমোহনবাবুর চুরুট নিভে গিয়েছিল। বিদেশি লাইটার জ্বেলে চুরুটটা ধরাতে-ধরাতে বললেন, "কী যা-তা বলছ! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ওই পাণ্ডবেরা যে গাছের কোটরে অস্ত্রশস্ত্র রাখত তাকেই তো..."

"এগজ্যাক্টলি। মূর্তি সে-গাছের কোটরেই রাখা আছে।"

সব্যসাচীদার জন্য কফি এসে গেছে। কফিতে চুমুক দিতে-দিতে সে বলল, "গোপীনাথ প্রাচীন পুঁথি পড়া লোক। সে এ-কথাই জানিয়েছে।"

"দ্যাখো ছোকরা, আমি কিন্তু হেঁয়ালি করার লোক নই। একটা অঞ্চলের সম্মানিত অ্যাডভোকেট। আমি অবনীশবাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

জগমোহনবাবুর চোখ-মুখ এখন উত্তেজিত। ঘন-ঘন চুরুট টানছেন, "আমার সঙ্গে রসিকতা করবে না কিন্তু। দুর্গাদা—"

ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে। জগমোহনবাবুর সঙ্গে এ ধরনের রসিকতা করার কী মানে, বুঝে উঠতে পারলাম না।

দুর্গামোহনবাবু নেই। কৃষ্ণমোহনকে পাঠানো হল ভগ্নিপতিকে খুঁজে আনতে।

চেয়ার ছেড়ে হঠাৎই উঠে পড়ল সব্যসাচীদা। তারপর আমাদের ইশারা করল রাস্তার দিকে। দেখলাম, দাবা খেলা বন্ধ করে শমীক উঠে দাঁড়িয়েছে। কঠিন হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো।

রাস্তার ধারে রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতুল। আমরা উঠে বসতেই রিকশা চলতে লাগল। এখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। চারদিকে বেশ রোদ। ধানখেতে হাওয়া বইছে। প্রথম কথা বলল সব্যসাচীদা, "রোহিত, কে কাকে ছুটি দেয়?"

রোহিত বলল, "আপনি আবার জগমোহনবাবুর সঙ্গে ঝামেলা বাধালেন।"

"উনিও কম নন। দেখলে তো আমাদের আগে কৃষ্ণমোহনবাবুর সঙ্গেও ঝামেলা বাধিয়েছিলেন। সবসময় আইন ফলানোর চেষ্টা। তবে এই ঝামেলার পর চৌধুরীবাড়িতে আমাদের অবস্থা খুব একটা ভাল হবে না, তা বলা বাহুল্য। তবে দুর্গামোহনবাবু যদি ব্যাপারটা মিটিয়ে দেন, সেটা অন্য কথা।" রোহিত আর আমি অবশ্য সব্যসাচীদার হাবভাব বুঝে উঠতে পারছি না। অনিদ্রা-রোগী গৌতমমোহনের ছেঁড়াখোঁড়া খাতায় লেখা 'শমীবৃক্ষ' শব্দটা নিয়েই বা এত মাতামাতি কিসের? গৌতমমোহন অপ্রকৃতিস্থ লোক, তাঁর কথা কিংবা লেখাতে নিশ্চয় এমন কিছু থাকতে পারে না, যাতে গোয়েন্দাগিরি সম্ভব হতে পারে। তা ছাড়া গোপীমোহন নাকি তার অপরাধ স্বীকার করেছে।

"লাই ডিটেক্টর মেশিন কাকে বলে জানিস?"

"অপরাধী মিথ্যে কথা বলছে কি না তা ধরে দেয় এই যন্ত্র।"

"এগজ্যাক্টলি।" সব্যসাচীদা আমার পিঠে আলতো চড় মেরে বলল, "ক্রিমিনোলজিতে একে 'পলিগ্রাফ' বলা হয়।"

"ত্রিগুণামোহনকে দিয়ে কাজ হল?"

"নিশ্চয়। গোয়েন্দাদের কাছে যে-কোনও আপাততুচ্ছ বিষয় অনেক জট খুলে দিতে পারে। জামায় লেগে থাকা সূক্ষ্ম পোকার ডানা অপরাধী ধরে দিয়েছে।" রিকশা এসে থামল নন্দনপুর থানার সামনে। আমাদের নামতে বারণ করে সব্যসাচীদা নেমে গেল। যাওয়ার আগে বলল, "দশ মিনিট পরে ফিরব, তার আগে একটা সূত্র দিচ্ছি। মাথা খাটিয়ে বার করো দেখি।"

"কী সূত্র?"

"গৌতমমোহনের ঘরের জানলার নীচে আয়ুর্বেদ বটিকার শিশি ভাঙা অবস্থায় পড়ে ছিল কেন?" প্রশ্নটা করেই সব্যসাচীদা দ্রুত হেঁটে থানার ভেতরে ঢুকে গেল। রোহিত আমার দিকে চোখ নাচিয়ে তাকাল। অর্থাৎ

আমার মাথায় কোনও জবাব এল কিনা। আমি মাথা নাড়ছি। গৌতমমোহন যা লোক, তাতে তার মতিগতি বোঝা সম্ভব নয়। চৌধুরীবাড়িতে সে আশ্রিত এবং সেখানে যে অবহেলা অনাদরে থাকে, তা ঘরদোর দেখে বোঝা যায়। কারও সাতে-পাঁচে থাকারও লোক নয় গৌতমমোহন, অন্তত দুর্গামোহনবাবু তো তাই বললেন।

ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে সব্যসাচীদা ফিরে এল। রিকশায় উঠতে-উঠতে বলল, "কী, উত্তর মাথায় এল ?"

রোহিত খুব গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "আর্য়ুবেদ বড়ি কাজে দিচ্ছিল না দেখে রেগে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।"

দেখলাম, সব্যসাচীদা হো-হো করে হাসছে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না মৈনাক, তুমি বলো।"

আমি বললাম, "হাত থেকে পড়ে গিয়ে—"

"না পড়লে ভাঙবে কী করে ?" সব্যসাচীদা বলল, "হোপলেস। চিন্তা না করে উত্তর দিলে এইরকম জবাব হবে। নো একস্ট্রা অর্ডিনারি অ্যানসার।"

অতুল রিকশা চালাচ্ছে। এখন আড়াইটে বাজে। বেশ গরম পড়েছে। ডান দিকের পুরনো আমলের দোতলা বাড়ির দিকে আঙুল তুলে সব্যসাচীদা বলল, "অতুল, এখানেও দশ মিনিটের জন্য থামতে হবে।"

আমাদের অপেক্ষা করতে বলে সব্যসাচীদা রিকশা থেকে নেমে পড়ল। বারকয়েক ডোর-বেল বাজাবার পর ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক বয়স্ক লোক এসে দরজা খুলে দিল। এই লোকটাকে বারকয়েক থানায় দেখেছি। লোকটা পুলিশের লোক নয়, কিন্তু থানার অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। রোহিত আমার দিকে চোখের ইশারা করল। আমি ঠোঁট ওলটালাম। আমার চেনার প্রশ্ন নেই। আমি গ্রামের অনেককেই চিনি না।

অতুল বলল, "বনোয়ারিজি। ঘুঘু লোক।"

মিনিট পনেরোর মধ্যেই সব্যসাচীদা বেরিয়ে এল। তারপর রিকশয় চাপতে-চাপতে বলল, "অনেক দেরি করিয়ে দিলাম। এবার আমার বাড়িতে লাঞ্চটা সেরে নেব।" খাবার কথায় রোহিত কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠল। আমারও ভীষণ খিদেয় পেট জ্বলছে, সেই সাড়ে দশটায় খানচারেক ময়দার পরোটা আর তরকারি করে দিয়েছিলেন মা।

রিকশা এসে থামল সব্যসাচীদার বাড়ির সামনে। রিকশা থেকে নেমে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম।

বসবার ঘরটাই এখন খাওয়ার ঘর। কাজের লোক খাবার দিয়ে গেল। হাত ধুয়ে বসতে-বসতে সব্যসাচীদা বলল, "তখনকার ধাঁধার জবাবটা হচ্ছে গৌতমমোহনের হাত থেকে শিশিটা ধস্তাধস্তিতে পড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ গৌতমমোহনকে জোর করে ঘর থেকে বার করা হয়েছে। গৌতমবাবুর জান হচ্ছে ওই আয়ুর্বেদ বড়ির শিশি। চরম বিপদের সময়েও সে ওটা হাতছাড়া করতে চায়নি। নাও, ফুলকপির তরকারিটা নাও।"

"কিন্তু গৌতমবাবুকে সরাবার চেষ্টা কেন হবে ?" রোহিত জিজ্ঞেস করল।

"আগেই বলেছি, কারণ ছাড়া কোনও কার্য হয় না।" সব্যসাচীদা বলল, "এমনকী বুড়ো কাকাতুয়া ভ্যানিশের সঙ্গেও গোটা ঘটনার সম্পর্ক আছে।"

আমরা লাঞ্চ সেরে সোফায় গিয়ে বসলাম। সব্যসাচীদা চেয়ারে বসে কাগজ-পেন বের করল। চৌধুরীবাড়ির পুরনো একটা বংশলতিকা বের করে সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে-দেখতে মাঝে-মাঝে মাথা নাড়তে লাগল। রোহিত একবার উঁকি মারল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা তার বোধগম্য হল না।

সব্যসাচীদা বলল, "এই ষড়যন্ত্রের পেছনে এই বংশলতিকাও কাজে লাগবে। একেবারে বেসিক থেকে স্টাডি করতে হবে।"

রোহিত ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি সোফায় হেলান দিয়ে একটা কমিক্স পড়ছি।

"বনোয়ারিলাল অনেক খবর রাখে।" সব্যসাচীদা বলল, "কিন্তু শমীবৃক্ষ ? গৌতমমোহনের কবিতাটা ভোলা গেল না, মৈনাক।"

আমি হালকাভাবে পাশ ফিরলাম। সব্যসাচীদার মৃদু গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। টেবিলে কনুই রেখে সে একমনে বলে যাচ্ছে, "যখন কোনও জটিল রোগব্যাধি হয়, তখন ডাক্তার ব্লাড, ইউরিন, ই সি জি, আলট্রা সোনোগ্রাফি ইত্যাদি রিপোর্টগুলো দেখে নেয়, এতে ট্রিটমেন্টের সুবিধে হয়।"

ঘুম থেকে উঠতে-উঠতে বিকেল। সব্যসাচীদা তখনও টেবিলে বসে আঁকিবুকি কেটে যাচ্ছে। বিজয়মোহন আর গৌরমোহন হচ্ছে দুই সৎ ভাই। বিজয়মোহনের ছেলে দুর্গামোহন আর গৌরমোহনের পালিত পুত্র জগমোহন। নিঃসন্তান গৌরমোহন জগমোহনকে পালিত পুত্র হিসেবে পালন করেন। সোনার দুর্গামূর্তিটা পেয়েছিলেন গৌরমোহন।

বিকেলে চা খেয়ে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময় নয়নবাবুকে দেখলাম হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা পার হচ্ছেন। সব্যসাচীদা তাকে দেখে বলে উঠল, "অত হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছেন কোথায় ?"

"মশাই, কাল ভোরেই চলে যেতে হবে। তাই একটু তাড়া আছে।"

"সন্ধেবেলায় চৌধুরীবাবুদের মণ্ডপে আসবেন, একটা দারুণ সারপ্রাইজ দেব।" সব্যসাচীদা রিকশায় উঠতে-উঠতে বলল, "দেখবেন, কী করি।"

"বলেন কী মশাই ! কী করবেন ?" নয়নবাবু রহস্যের গন্ধ পেয়ে এগিয়ে এলেন, "আপনি তো বড়সড় কিছু করবার তালে আছেন দেখছি।"

রিকশা চলতে শুরু করল। আমি আর রোহিত রীতিমত চিন্তায় পড়ে গেলাম। আজ সকাল থেকেই সব্যসাচীদার হাবভাবে একটু অন্যরকম ব্যাপার দেখছি। অন্যদিন থানাতে আমাদের দু'জনকে নিয়ে গেছে। আজ ও একাই গেল। তা ছাড়া অবনীশবাবুদের কাছের লোক বনোয়ারিলালের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে আলোচনা করল। কখনও-সখনও 'শমীবৃক্ষ' বলে বিড়বিড় করছে। এখন আবার নয়নবাবুকে বলছে আজ চৌধুরীবাবুদের মণ্ডপে সারপ্রাইজ দেখাবে !

রিকশা থামল জগদম্বা ভাণ্ডারের সামনে। সব্যসাচীদা বলল, "আমরা

শব্দসন্ধান

১	২	৩		৪		■	৫		৬
৭			■		■	■		■	
	■	৮			■	৯		১০	
১১		■	■	১২	১৩		■	১৪	
■	■	১৫	১৬	■	১৭		১৮		■
■	১৯			২০	■	২১		■	■
২২		■	২৩		২৪	■	■	২৫	২৬
২৭		২৮		■	২৯		৩০	■	
	■		■	■		■	৩১	৩২	
৩৩			■	৩৪					

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান, যা অচল ও অটল। (৫) হনুমানের জননী। (৭) বাড়ির কড়ি—ভাঙা। (৮) দু'জন হলে ভৃত্যের পক্ষে অসুবিধে। (৯) আসা-যাওয়া। (১১) মুন্ডহীন দেহ। (১২) পরলোকে পাপীদের আশ্রয়। (১৪) জাদুকর অনেক—তাক জানে। (১৫) বাসনা। (১৭) গভীর ঘুম। (১৯) একদন্ত দেবতা। (২১) য মেরে কাঁঠাল পাকানো যায় না। (২২) রসালো ফল। (২৩) বড়। (২৫) পুণ্যের চেয়ে যার আর্কষণ বেশি। (২৭) জ্ঞানী ব্যক্তি। (২৯) গোচারণ ভূমি। (৩১) সৌন্দর্য। (৩৩) অপদার্থ, দুষ্ট। (৩৪) ফন্দিবাজ। (২৯) যা লজ্জা দেয়।

উপর নীচ : (১) ঘিরে রাখা। (২) যে গোপন সংবাদ রাজাকে দেয়। (৩) যা ঘোড়াকে সামলায়। (৪) ঋষির আশ্রম। (৫) — পশু চোখে মনের কথা জানায়। (৬) অল্পবয়স্ক। (৯) যে-পাথর ঘষে মানুষ এককালে আগুন জ্বালাত। (১০) চালাক। (১৩) রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। (১৫) শাস্তি (১৬) অর্থ ও লোকবল। (১৮) মাথা মুড়িয়ে—ঢালা। (১৯) যাওয়া। (২০) নূতন। (২২) হুকুম মানতে যে বাধ্য। (২৪) অনিমন্ত্রিত আগন্তুক। (২৬) পায়ের ধুলো। (২৮) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। (৩০) সিরাজদ্দৌলা বাংলার যা ছিলেন। (৩২) স্থূলবুদ্ধি থাকে এদের।

গত সংখ্যার সমাধান

প	রা	শ	র	■	রা	জ	স্ব	■	অ
দা	ম	■	ক	র	ত	ল	■	না	ভি
ঘা	■	■	মা	■	দু	ধ	■	■	মা
ত	র	বা	রি	■	পু	র	বা	সি	নী
■	বি	■	■	■	র	■	প	ট	■
■	বা	মা	■	ম	■	■	■	কা	■
প	র	মা	দ	র	■	প	ঞ্চ	ন	দ
র	■	■	র	ণ	■	রি	■	■	র
গা	ন	■	কা	শী	ধা	ম	■	দি	বা
ছা	■	বি	র	ল	■	ল	জ্জা	ক	র

দেবসেনাপতি

এখান থেকে হেঁটে যাব। চৌধুরীবাবুদের বাগান দিয়ে পুজোমণ্ডপে ঢুকব।"

রোহিত বলল, "এখনও যে বিকেলের আলো আছে।"

"তাতে কী হয়েছে। রহস্য অনুসন্ধানের জন্য সবসময় আবছা অন্ধকারের দরকার হয় নাকি?" সব্যসাচীদা বলল, "হাঁস আর শজারু। দুটো মিলে কী হয়ে গেল?"

"হাঁসজারু।" রোহিতের ঝটিতি উত্তর।

"চৌধুরীবাবুদের বাড়িতে মোট ক'টা বড় গাছ আছে?"

"জানি না।"

"ষোলোটা। তার মধ্যে দুটোতে ঝুরি নেমেছে।" সব্যসাচীদা এখন কোনও সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে ভাবছে, ভুরু কোঁচকানো। আমরা চৌধুরীবাবুদের চার নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছি। প্রচুর আগাছার জঙ্গল, অসম্ভব মশা কামড়াচ্ছে। "গৌতমমোহনবাবু কিন্তু পাগল নন।" সব্যসাচীদা বাগানের ভেতর ঢুকে প্রতিটি গাছ বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, মৈনাক, এমন তো হতে পারে এইসব কাণ্ডের পেছনে গৌতমমোহন আছেন। তিনি যেটা করে আসছিলেন, সেটা ভান। অভিনয়। তাঁর দীর্ঘদিনের লক্ষ্যই ছিল দুর্গামূর্তি চুরি করা। তোমার কী মত?"

"হতে পারে।"

"যদি সন্দেহের তীরটা কৃষ্ণমোহনের দিকে রাখা যায়?"

আমি মাথা নাড়লাম। সব্যসাচীদা বলল, "দশ বছর পর এলেন কৃষ্ণমোহন, আর তখনই দুর্গামূর্তি গায়েব।"

"কিন্তু ভ্যানিশটা করল কী করে?"

"সেটা জানবার জন্যই তো এত কাঠখড় পোড়াচ্ছি মৈনাক।" সব্যসাচীদা ঝুরিভর্তি বটগাছটার দিকে এগিয়ে গেল। বটগাছের পাশে পরিত্যক্ত কুয়োর পাড়ে বসে বলল, "চৌধুরীবাড়ির মজা হচ্ছে, এই বাড়ির প্রতি কারও কোনও নজর নেই। একসেপ্ট দুর্গামোহন—তিনি এ-বাড়িতে সপরিবার থাকেন, পুজোআচ্চা করেন। বাড়িটার প্রতি, ঐতিহ্যের প্রতি দরদটা তাঁর অন্যদের চেয়ে বেশিই। ...তাঁকেও সন্দেহের উর্ধ্বে রাখা যায় না। মানছি, তিনি সাত্ত্বিক মানুষ। তবু লোভ জিনিসটা মারাত্মক। সারাজীবন আগলে-আগলে রয়েছেন, এখন পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে ওই মূর্তিটা রাখতে চান না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবেই রাখতে চান। হয়তো বুদ্ধিটা তাঁর নিজের নয়, পরিবারেরও হতে পারে। বাকি থাকল জগমোহনবাবু। লোকটা খুব চালিয়াত প্রকৃতির লোক। কথাবার্তা, আচার-আচরণে খুব চালিয়াতি আছে। এসব লোক খুব একটা পরিষ্কার মনের হয় না। সন্দেহের তালিকায় জগমোহনবাবুকেও রাখতে হবে।

সব্যসাচীদা কথা বলতে-বলতে পকেট থেকে নোটবইটা বের করল। তারপর দু-চারটে পাতা উলটে বলল, "আসল খেলাটা ওই মূর্তি ভ্যানিশ। গৌতমমোহন এই কেরামতি দেখাতে পারবে না। তার লোকবল নেই। বাকিদের তা আছে।"

সন্ধে হয়ে আসছে। এই পরিত্যক্ত জঙ্গলে বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব নয়। তিনজনে পেছনের গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। রোহিতের দিকে তাকিয়ে সব্যসাচীদা বলল, "একটু টাইট ফিল্ডিং দিতে হবে। মনে রেখো, চোখে বালি ছুড়ে যারা জিনিস হাপিস করে, তারা সাধারণ লোক নয়।" কথাটা কেন বলল, বুঝতে পারলাম না।

॥ ৬ ॥

সন্ধেবেলায় দুর্গামণ্ডপে খুব বেশি লোকজনের ভিড় নেই। আজ যদিও একাদশী, তবু প্রতিমা ভাসানো হয়নি। মণ্ডপের সামনে অনেক চেয়ার

পাতা। চেয়ারে অনেকেই বসে আছে। জগমোহনবাবু একটু দূরে গম্ভীর মুখে চুরুট টানছেন। মণ্ডপের সামনে ছোটদের ভিড়। স্টলগুলোতে ভিড় তেমন নেই, ভিড় যা আছে তা ছোটদের। সব্যসাচীদাকে দেখলাম বেলুনের স্টলের সামনে এয়ারগান নাড়াচাড়া করতে। স্টলের রোগা চেহারার ছেলেটাকে বোঝাতে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল। ক'দিন আগেই লাইট ফাটানো নিয়ে ছেলেটার সঙ্গে বচসা হয়েছিল। আজ দেখছি দু'জনে কথা বলছে।

রোহিতের দিকে তাকিয়ে সব্যসাচীদা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ স্টল ছেড়ে যাওয়া বারণ।

নয়নবাবু এসে গেছেন। পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি পরায় ভদ্রলোককে বেশ দেখতে লাগছে। মাথার চুল পাট করে পাতা। মাঝে-মাঝে ডিবে থেকে নস্যি বের করে নিচ্ছেন, "কই হে, তোমার সারপ্রাইজ দেখি।"

নয়নবাবুর কথা শুনে জগমোহনবাবু হঠাৎ ঘুরে তাকালেন। নয়নবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "কিসের সারপ্রাইজ ?"

"সব্যসাচীবাবু দেখাবেন বলেছেন।" নয়নবাবু চেয়ারে বসতে-বসতে বললেন, "এই বয়সে যদি একটু চমকে উঠতে পারি, মন্দ কী ?"

নয়নবাবুর কথায় জগমোহনবাবুর চোখে-মুখে সন্দেহের ছায়া। তিনি বললেন, "আবার শুরু হল। নাও এবার, বোঝো ঠ্যালা।"

সব্যসাচীদা সকলকে চমকে দেবেন, কথাটা ছড়িয়ে পড়তেই মণ্ডপের আশপাশে অনেকের ভিড় শুরু হল। দুর্গামোহনবাবুকেও দেখলাম চশমাটা ধুতিতে মুছে ফের পরে নিলেন। এই চাপা স্বভাবের ধর্মপ্রাণ মানুষটির মনের ভাব চট করে বোঝা যায় না।

কৃষ্ণমোহনবাবু বসেছেন একেবারে ডান দিকে। পাশে কার সঙ্গে যেন মাথা নিচু করে কীসব আলোচনা করছিলেন সব্যসাচীদা। "আমি এই গণেশ মূর্তিটা ভ্যানিশ করে দেব" বলামাত্রই তিনি প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন। দু'চোখ বড়-বড় করে বললেন, "এখন বাপু ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। আমি দিব্যি জেগে আছি।"

নয়নবাবু চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, "সকলের চোখের সামনে ভ্যানিশ ! দেখি কেমন বাহাদুর ছেলে তুমি।"

গোটা দুর্গামণ্ডপ হঠাৎ থমথমে হয়ে গেল। আমি উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছি। সব্যসাচীদার হাতে ফুটখানেকের ধাতুর একটা গণেশমূর্তি। মূর্তিটা তার সাইডব্যাগে ছিল, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। মূর্তিটা নিয়ে মণ্ডপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "প্রত্যেকে আমার দিকে লক্ষ রাখুন। আমার হাতে যে মূর্তিটা দেখছেন, তা পুরো পেতলের। ওজনটা নেহাত মন্দ নয়। মূর্তিটা আমি দুর্গামূর্তির পাশে রাখছি।"

কথাগুলো বলে খুব নাটকীয় কায়দায় দুর্গামূর্তির দিকে এগিয়ে গেল সব্যসাচীদা। তারপর স্টেজের ওপর মূর্তিটা বসাতে-বসাতে বলল, "ঠিক যেভাবে সেদিন দিনেদুপুরে সোনার দুর্গামূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেভাবেই এই মূর্তিও আমি সকলের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য করে দেব।"

কথা বলতে-বলতেই স্টেজ থেকে নেমে এল সব্যসাচীদা। সবাই তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। মণ্ডপের জোরালো আলোয় সব্যসাচীদা হেঁটে যাচ্ছে। পরনে নীল রঙের জামা, সাদা ট্রাউজার, পায়ে ধবধবে স্পোর্টস শু। একরাশ কোঁকড়ানো চুল হাওয়ায় উড়ছে। তার চলাফেরায় এখন বেশ ড্রামা। মিনিট পনেরো আগে যে সব্যসাচীদা আমাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছিল, সেই সব্যসাচীদার সঙ্গে কোনও মিল নেই।

"সেদিন ঠিক এইভাবেই মূর্তিটা ভ্যানিশ করা হয়েছিল।" কথাগুলো বলে মণ্ডপ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সব্যসাচীদা, দুটো হাত সামনে তুলে।

দেখলাম বেশ নাটকীয় কায়দায় মণ্ডপ ছেড়ে স্টলগুলোর সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। উত্তেজনায় কৃষ্ণমোহনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে সব্যসাচীদার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। নয়নবাবুকে দু' হাতের তালু মুড়ে বারকয়েক কাশতে দেখা গেল।

এর পর সব্যসাচীদা যা করল, তা এককথায় অবিশ্বাস্য ! দেখলাম, বেলুন স্টলে ঢুকে এয়ারগানটা তুলে নিচ্ছে আর দোকানের ছেলেটি তার দিকে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে। পর মুহূর্তে স্টল থেকে বেরিয়ে ঝাড়বাতির দিকে তাক করে গুলি চালাল। দুটো লাইট ঝনঝন শব্দ করে ভেঙে পড়ল। তারপর দেখলাম, এয়ারগানটা চলে গেল ছেলেটির হাতে। সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "গণেশ মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

সকলেই দুর্গামূর্তির পাশে তাকিয়ে দেখল, গণেশ মূর্তি নেই।

প্রথমেই ছুটে এলেন দুর্গামোহনবাবু, "এসব কী অনাসৃষ্টি করছ সব্যসাচী !"

"না, না। এসব ভাল জিনিস নয়।"

"আমি কিন্তু সোনার দুর্গামূর্তি অদৃশ্য হওয়ার রহস্যটা দেখিয়ে দিয়েছি।"

সব্যসাচীদা বলল, "আজ একজোড়া লাইট ভাঙলেও সেদিন দুপুরেও কিন্তু আরও একজোড়া ভাঙা হয়েছিল। এই তার নমুনা—" বলে পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করল সব্যসাচীদা। দুর্গামোহনবাবুর দিকে সেটা দেখিয়ে সে বলল, "যিনি সেদিন এই কাণ্ডটি করেছিলেন, তিনি আপনার খুবই স্নেহের পাত্র দুর্গামোহনবাবু। রাইফেল শুটিংয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন, আরও অনেক গুণপনা আছে তাঁর। আসানসোলের থানার হাজতেও একবার তাঁকে রাত্রিবাস করতে হয়েছে। কী শমীকবাবু, আমি নিশ্চয় ভুল বলছি না।"

কাছাকাছি বাজ পড়লেও সকলে এতটা চমকে উঠত না। সব্যসাচীদার কথা শুনে শমীক চিৎকার করে বলে উঠল, "শাট আপ। লায়ার। আই, আই..."

জগমোহনবাবু বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, "কী, এতবড় কথা ! আমি তোমাকে..."

"না। জগমোহনবাবু, আপনার ছেলের কাজে কোনও বাহাদুরি নেই। অতি সাধারণ একটা কৌশল।" সব্যসাচীদা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় বলল, "সেদিন সে এইভাবেই ঝাড়বাতির দুটো লাইট ফাটিয়ে দিয়েছিল। আমার কাছে যে বাল্‌বের টুকরো আছে, তাতে ওয়াট পর্যন্ত লেখা আছে। দত্ত ইলেকট্রিকের লোকেরাও তা আইডেন্টিফাই করেছে। লাইট ফাটাতেই মণ্ডপে যে ক'জন ছিল, তাদের মনোযোগ সেদিকে চলে গিয়েছিল। সেই সুযোগে শমীকবাবুর শাগরেদ বিজু স্টেজের কোণে ঘাপটি মেরে থেকে মূর্তিটা সরিয়ে দেয়। ব্যস ! সোনার দুর্গামূর্তি ভ্যানিশ।"

আমার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। দেখলাম, শমীক চিৎকার করছে, "আই সে গেট আউট। লায়ার ! আমি তোমাকে শেষ করে দেব।" তারপরই বিদ্যুদ্বেগে শরীরটা ছুড়ে দিল সব্যসাচীদার দিকে। সব্যসাচীদার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যে লোকটা জুজুৎসুর প্যাঁচ কষে শমীককে মাটিতে পেড়ে ফেললেন, তিনি কৃষ্ণমোহনবাবু। সব্যসাচীদা তাঁর দিকে ঘুরে 'শাবাশ' বলেই ভিড়ের মধ্যে কাকে ইশারা করল। দেখলাম, বিজুকে ধরে আছেন নন্দনপুর থানার সাব-ইনস্পেক্টর চন্দ্রমোহনবাবু, যিনি সারাক্ষণই সাদা পোশাকে ঢাকির পাশে পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিলেন।

উত্তেজনায় জগমোহনবাবু ঘেমে উঠছেন, "এটা একটা চক্রান্ত। তোমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করব। সিভিল, ক্রিমিনাল দুটোই।"

"মামলাটা আপনি ছেলের বিরুদ্ধেই করুন, চৌধুরী বংশের সুনামে কালি

ছিটিয়েছে আপনার গুণধর ছেলে!" সব্যসাচীদার হাবভাবে এখন কোনও ভান নেই,"খুব স্বাভাবিক গলার স্বর নিরীহ গৌতমমোহনকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। কারণ এই অপকর্ম সে দেখে ফেলেছিল, রেহাই পায়নি বুড়ো কাকাতুয়া..."

উত্তেজিত জগমোহনবাবুকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন দুর্গামোহনবাবু। নয়নবাবু চুপ হয়ে বসে আছেন। জগমোহনবাবুর স্ত্রী চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "এ কখনও হতে পারে না। আমার শমু এ কাজ করতে পারে না!" ভদ্রমহিলাকেও মণ্ডপ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

মাটির ওপর বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে আছে শমীক। তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চন্দ্রমোহনবাবু।

দুর্গামোহনবাবু বলতে লাগলেন, "মূর্তি তুমি কোথায় রেখেছ শমীক?"

"শমীকবাবু না বললেও আমি বলে দিচ্ছি। মূর্তি রয়েছে আপনাদের বাগানের পেছন দিকে অশ্বত্থগাছের কোটরে।" সব্যসাচীদা বলল, "বেচারা গৌতমমোহন কাব্য করে লিখেছিলেন, 'শমীবৃক্ষে কী লুক্কায়িত'। সেই অপরাধে তাঁকে গুম করা হয়েছে। গৌতমমোহনবাবু কোথায় আছেন শমীকবাবু? জবাব দেবে, না পুলিশি বলপ্রয়োগ করতে হবে?"

বারান্দায় দাঁড়িয়ে জগমোহনবাবু তখনও চেঁচিয়ে বলেছেন, "প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। এজন্য তোমাকে 'পে' করতে হবে। আসানসোলে জাঁদরেল উকিল বলেই আমাকে চেনে সকলে—"

সব্যসাচীদা সেদিকে খেয়াল না করে শমীকের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, "ঝাড়বাতির লাইট ফাটানোর কথা দুর্গামোহনবাবুর কানে না তোলার জন্য বেলুন স্টলের ছোকরাকে প্রথমে অনুরোধ, পরে হুমকি দিয়েছ। শেষপর্যন্ত তাকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অফার করেছ, যাতে সে মুখ না খোলে। কী, সত্যি বলিনি?" সব্যসাচীদার দিকে শমীক এমন চোখে তাকাল, মনে হল সামনে পেলে সে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটিয়ে দেবে।

দুর্গামোহনবাবু মণ্ডপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। বারবার মাথা নাড়ছেন। সব্যসাচীদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা হলে পুলিশ যে গোপীমোহনকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছিল?"

"ওটা নাটক। এর ফলে অপরাধীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, আমাদেরও সুবিধে হয়েছিল তাদের গতিবিধি লক্ষ করতে।"

নয়নবাবু বললেন, "আমিও ভাবছিলাম, গোপী সোনার দুর্গামূর্তি কীভাবে ভ্যানিশ করতে পারে। তবে আজকাল সবই সম্ভব। যাক, সব্যসাচী, আমি কিন্তু অবাক হয়ে গেছি। শাবাশ।"

কৃষ্ণমোহনবাবু বললেন, "দেখলেন তো স্রেফ জুজুৎসুর প্যাঁচ দিয়ে কী বিপদ থেকেই না বাঁচালাম। এক প্যাঁচে..." তারপর দুর্গামোহনবাবুকে দেখে গলার স্বর নিচু করে ফেললেন, "সেদিন দুপুরে একটা শব্দ শুনেছিলাম বটে, তবে আমি ভাবলুম কাকে বুঝি চামচ বা খোকাখুকুর খেলনা গাছ থেকে ফেলেছে। আমার আবার একটু ঘোরমতো এসেছিল। আসলে ঘুম এসেছিল কি আসেনি—আওয়াজটাকে গুরুত্ব দিইনি। আমার আবার দিবানিদ্রার দোষ আছে কিনা দুপুরে, এই মিনিট বিশেক..."

॥ ৭ ॥

বুড়ো কাকাতুয়ার মুখে বাংলা গানের কলি শোনার পর থেকে রোহিত একবার চিড়িয়াখানায় একটা বেঢপ চেহারার পাইথনকে একটানা ঢেকুর তুলতে দেখেছিল, সেটা নাকি অনেক বেশি 'সারপ্রাইজিং'।

রাত এখন একটা বাজে। সব্যসাচীদার বসার ঘরে সোফায় মশারি ছাড়া শুয়ে আমরা মশার সঙ্গে যুদ্ধ করছি। বিষাক্ত কাঁকড়াবিছের চেয়ে মশার কামড় অনেক বেশি নিরাপদ—যদি না ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়, রাতদুপুরে এই তত্ত্বটা বোঝাতে-বোঝাতে সব্যসাচীদা টুক করে ক্যাসেটটা চালিয়ে দিল। টেপরেকর্ডে ধীরে-ধীরে বাজছে, 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।'

"বিজুর ক্যাসেটে এই গান শুনে বেচারি কাকাতুয়া সেটা নকল করে নিজের প্রাণ হারাল।" সব্যসাচীদা বলল, "শমীকেরা মিছিমিছি বুড়ো কাকাতুয়াকে কুয়োয় ফেলে দিল।"

আজ সন্ধের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ধাঁধার মতো লাগছে। সব্যসাচীদার গণেশমূর্তি ভ্যানিশ, শমীকের ধরা পড়া থেকে শুরু করে জগমোহনবাবুর দাপাদাপি, ঢাকি সেজে সাব-ইনস্পেক্টর চন্দ্রমোহনবাবুর মটকা মেরে পড়ে থাকা, সবকিছুই কেমন গোলকধাঁধার মতো লেগেছে। সন্ধেবেলার সেই রুদ্ধশ্বাস নাটকে নয়নবাবু পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। ভদ্রলোক নাকি জীবনে বহু ভয়ঙ্কর ঘটনা 'ফেস' করেছেন।

এত রাত্রিতে তিনজনের জন্য তিন কাপ ব্ল্যাক কফি তৈরি করেছে। টেবিলে রাখতে-রাখতে বলল, "গোপীমোহনকে পুলিশ লোক-দেখানো অ্যারেস্ট করেছিল। সেই ফাঁদেই শমীকেরা পা দেয়।"

সব্যসাচীদা বলল, "গোড়ায় একটা গলদ ছিল। সোনার মূর্তিটা দুর্গামোহনবাবুর হেফাজতে থাকলেও এর আসল দাবিদার কিন্তু জগমোহনবাবু। গৌরমোহনবাবু ওই সোনার দুর্গামূর্তি পেয়েছিলেন, আইন অনুযায়ী ওই মূর্তি পাওয়ার হক ছিল গৌরমোহনবাবুর পালিত পুত্র জগমোহনবাবুর। ভদ্রলোক ব্যাপারটা জানতেন, তবু তেমন উৎসাহ দেখাননি। বংশের বড় ছেলের কাছে আছে, সুতরাং নো প্রব্লেম। তবে তাঁর স্ত্রী হয়তো এ-নিয়ে কখনও বাড়িতে কথা তুলেছিলেন। ওদের বাড়িতে এ-ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হত। সেই সূত্রে শমীক ঘটনাটা জানত।"

"শমীবৃক্ষে লুক্কায়িত ব্যাপারটা কী?" কফিতে চুমুক দিতে-দিতে রোহিত বলল।

"ব্যাপারটা হচ্ছে, শমীক কোনও বৃক্ষে কোনও কিছু লুকিয়ে রেখেছে এই ব্যাপারটা প্রতীকীভাবে বলতে চেয়েছিলেন গৌতমবাবু। ঘটনাটা গৌতমমোহনবাবুর নজরে পড়ে যায়। আর তা চোখে পড়ে যায় শমীকদের। ফলে গৌতমমোহনকে ওরা গুম করে দেয়। স্বীকার করতেই হচ্ছে শমীক খুব ডেসপারেট ছেলে। অনেকটা প্রফেশনাল ক্রিমিনালের মতো। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড জানবার জন্য অবনীশবাবুকে খোঁজখবর নিতে বলি। আসানসোল থানার রেকর্ড ঘেঁটে দেখা যায়, শমীক ক্রিমিনাল অফেন্সে হাজতবাস করেছে। তার হয়ে জামিন নেন জগমোহনবাবুর বন্ধু কিশোরীলাল। ছেলেটা মারাত্মক, সেদিন রোহিতের ভাগ্য ভাল, সে গুরুতর আহত হয়নি। আসলে রাত্রিবেলাতে ঝুরিঅলা বটগাছের কোটরে মূর্তিটা ঠিক আছে কি না,সেটা দেখতে গিয়েছিল শমীক।

রাত্রেই ফোর্স নিয়ে এসেছিলেন অবনীশবাবু। শমীককে তিনি হাজতে পুরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ, নিষ্ঠাবান দুর্গামোহনবাবু বাধা দিয়ে বলেছিলেন, মূর্তি যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন এসবে কাজ কী? না না। ছেলেমানুষ ভুল করেছে। পরে ভুল বুঝতে পারবে।"

জগমোহনবাবু অবশ্য ছেলেদের হাজতে দেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন, "ওই কুলাঙ্গারদের জন্য আমি মুভ করব না। ওরা ক্রিমিনাল ছাড়া আর কিছুই নয়।"

হাজতে ভরতে না পেরে হতাশ অবনীশবাবু মন্তব্য করেছেন, "অপরাধকে অঙ্কুরে বিনাশ করাই উচিত। এর জন্য একদিন চৌধুরী বংশকে চোখের জল ফেলতে হবে।" সব্যসাচীদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ অবনীশবাবু বলেছেন, "আপনি তো মশাই আমাদের চাকরি খেয়ে নেবেন। আমরা তো অন্য লাইনে এগোচ্ছিলাম, কাজের লোকগুলোকে রামধোলাই

দিয়ে..."

সব্যসাচীদা বলল, "ফর্মুলাটা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। আসলে ঘটনা ঘটার পর দুটো ব্যাপার আমাকে নাড়া দিয়েছিল। এক নম্বর, ঝাড়বাতির দুটো লাইট টাটকা-টাটকা ভাঙা ; দুই, শমীকের হাতের অব্যর্থ টিপ। আমিও খুব ভাল রাইফেল চালাতে পারি, কিন্তু শুনেছি আমার চেয়েও নিখুঁত টিপ শমীকের। সেই চ্যালেঞ্জের বশেই আমি পরপর পাঁচটা বেলুন ফাটিয়েছিলাম। দুটো ঘটনার যোগফল করলে যা দাঁড়ায়, তাতে সন্দেহের তীরটা গিয়ে পড়ে শমীকের দিকে। কিন্তু বিনা প্রমাণে ধরা মুশকিল। সেদিন অবশ্য 'সোনার মূর্তি ভ্যানিস' করব বলে চুরিটা করেনি। মণ্ডপে জনাদশেক ছেলেবুড়ো ছিল, বিজু ধুনো জ্বেলেছিল। বেশ ধোঁয়াও হয়েছিল। ঢাকিরা ঢাক বাজাচ্ছিল। পরিষ্কার চিত্রনাট্য। প্রথমে এয়ারগান নিয়ে বেলুনঅলার সঙ্গে ধস্তাধস্তি, তারপর পর-পর দুটো লাইট মেরে ফাটায়। সবাই চমকে এ দিকে তাকাতেই বিজু দুর্গামূর্তিটা ব্যাগে ঢুকিয়ে মণ্ডপের পেছন দিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। জঙ্গলে গাছের কোটরে রেখে ফিরে আসে। ভিড়, শোরগোলে তাকে কেউ খেয়াল করেনি। মণ্ডপের মধ্যে বড়রা যারা ছিল, তারা ভাতঘুম দিচ্ছিল। ক্লিন অপারেশন।"

অবনীশবাবু এসব শুনে বলে উঠেছিলেন, "তা হলে পেটে-পেটে এও ছিল। আচ্ছা, এই মূর্তি চুরি করার দরকার পড়ল কেন ?"

"কেন আবার ? আমার যতদূর অনুমান, আসানসোলে শমীকেরা যাদের সঙ্গে মেশে, তাদের সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারছে না। তার প্রচুর টাকার দরকার। হয়তো সে কোনও ব্ল্যাকমেলেরও শিকার হতে পারে। ও যাদের সঙ্গে মেশে, তারা সব ভুঁইফোঁড়ের দল। শমীক দেখল, হকের জিনিস সরিয়ে যদি পকেট ভর্তি টাকা পাওয়া যায়, তা হলে ক্ষতি কী ? বাবার দেওয়া পকেট মানিতে তার পোষাবে কেন ?"

রাত সাড়ে বারোটায় অবনীশবাবু জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, "হাজতের হাওয়া আর জেলের জল পেটে পড়লে শুদ্ধিকরণ ঘটত। কিন্তু সেন্টিমেন্টেরই জয় হল। এনি ওয়ে, আমরা কোনও কেস স্টার্ট করছি না। চন্দ্রমোহনবাবু থাকলেন, তিনি গৌতমমোহনবাবুকে খুঁজে বের করবেন। এ কাজটা ওঁকেই করতে দিন, নইলে ওঁর চাকরি থাকে কী করে ?"

প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে চৌধুরীবাড়ি তোলপাড় করা হয়েছে। প্রতিটি ঘর খুলে টর্চ জ্বেলে দেখা হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি। চন্দ্রমোহনবাবুকে খুব চিন্তিত দেখা গিয়েছিল। তিনি একবার একতলা, একবার দোতলা করে বেড়িয়েছেন। শেষপর্যন্ত জঙ্গলে ঢুকে "হেল্প সব্যসাচীবাবু" বলে চেঁচাতেই আমরা সদলবলে গিয়ে পড়েছিলাম। তিনি কাতর সুরে বলেছেন, "প্লিজ, দারোগাবাবুকে জানাবেন না। আমার গেঁটে বাতের প্রব্লেম ক'দিন ধরে বেড়ে গেছে। উফ !"

শমীক আর বিজু প্রথমে আকাশ থেকে পড়লেও সব্যসাচীদার চোখ রাঙানিতে স্বীকার করেছে, গৌতমমোহনবাবুকে জঙ্গলের শেষের ঘরে রাখা হয়েছিল।

সেই ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে খোঁড়া একটা কুকুর ঘুমোচ্ছে। চন্দ্রমোহনবাবু টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে ঘরের চারদিকে খুঁজেও পেলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে যেতেই হঠাৎ হাই তোলার শব্দ। তারপর সেই ঘরের ছাতে পাওয়া গেল গৌতমমোহনবাবুকে। ছাতের ওপর কী করে এলেন, সে-প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। দু'দিন খেতে না পাওয়া অনিদ্রারোগী।পরে ডাক্তারি পরিচর্যার পর তিনি বললেন, "দু'দিন খুব ভাল ঘুম হয়েছে।"

শমীকেরা স্বীকার করেছে, গৌতমবাবুকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। চন্দ্রমোহনবাবুকে পর্যন্ত মানতে হয়েছিল দুর্গামোহনবাবুর ভাইপোরা 'রিয়্যালি ক্রিমিনাল।"

পরের দিন সাড়ে দশটায় ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট করছি, এমন সময় ডোর-বেলের শব্দ। গোপীমোহন। হাতে কোথাকার কোন জাগ্রত দেবতার প্রসাদ।

সব্যসাচীদা বলল, "পুলিশের জিপে উঠতে ভয় পাওনি তো ?"

"না, না। আপনি তো বলে দিয়েছিলেন, তোমার কিছু ভয় নেই। তবে থানার ব্যারাকে বড্ড মশা।"

"হাজতে আরও বেশি।" হাসতে-হাসতে রিকশায় উঠল সব্যসাচীদা, "সোনার দুর্গামূর্তি ফেরত এসেছে আর কি !"

গোপীমোহনের চোখ-মুখ হঠাৎ কালো হয়ে গেল। চোখের কোণে জল, "কিন্তু দাদাবাবু, কাকাতুয়া...শেষপর্যন্ত অমন করে..."

সব্যসাচীদা জবাব দিল না। অতুলকে রিকশা চালাতে বলল। এই প্রশ্নের জবাব সে দিতে চাইছে না।

ঝকঝকে নীল আকাশ। একটুকরো মেঘ নেই। দুর্গামোহনবাবু আজ লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছেন। রোহিতের মুখে টুথব্রাশের বিজ্ঞাপনের মতো হাসি। কিছুক্ষণ পরেই চৌধুরীবাড়ি এসে গেল। রিকশা থেকে প্রথমে নামল সব্যসাচীদা, তারপর রোহিত, সবশেষে আমি। গেটের ডান দিকে জগমোহনবাবুর মরিস মাইনর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ঢোকার আগেই, গটগট করে বেরিয়ে এলেন জগমোহনবাবু। পেছনে-পেছনে তাঁর স্ত্রী। কোনওদিকে না তাকিয়ে দু'জনে গাড়িতে উঠে বসলেন। উঠেই গাড়ি স্টার্ট। রোহিত আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

আমরা এগোতেই দুর্গামোহনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন, "আসুন, আমরা আপনার অপেক্ষা করছি।"

উঠোনে চেয়ার পাতা। সেখানে কৃষ্ণমোহনবাবু, উশীনরবাবুরা বসে আছেন। কৃষ্ণমোহনবাবু বললেন, "আজ সারাদিন কিন্তু জম্পেশ আড্ডা দেব। দাবা খেলবেন নাকি ?"

"দাবা ! আপনি দাবা খেলেন নাকি ?" সব্যসাচীদা ওঁর পাশে বসতে বসতে বলল, "দাবা এবং জুজুৎসু—বাঃ দারুণ কম্বিনেশন তো !"

"তা ইয়ে দাবায় আমার বড্ড শখ।" কৃষ্ণমোহন বললেন, "আজ কিন্তু চ্যালেঞ্জ ! আপনাকে হারাবই।"

"চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন ?" সব্যসাচীদা চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "আপনি মশাই চ্যাম্পিয়ান লোক।"

"দুর্গা তার উলটোটা বলে। বলুন দেখি, সোনার দুর্গামূর্তি ফেরত পাওয়া গেল, কোথায় এনকারেজ করবে, তা নয় সারাক্ষণই চোখরাঙানি। বলুন তো, যদি আমি জুজুৎসুর প্যাঁচটি না কষতুম, তা হলে কী কাণ্ডটাই না হয়ে যেত ! বাপু ধান দিয়ে শিখিনি !" তারপরই এগিয়ে আসা দুর্গামোহনবাবুকে দেখে চুপ হয়ে গেলেন কৃষ্ণমোহনবাবু।

"আজ দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার নেমন্তন্ন ভুলে যাননি তো !" কৃষ্ণমোহনবাবু বললেন, "আয়োজন খুবই সামান্য।"

"শমীককে দেখছি না যে।" সব্যসাচীদা প্রশ্নটা করেই হঠাৎ থম মেরে গেল। প্রশ্নটা না করলেই ভাল হত। দুর্গামোহনবাবুর মুখটা থমথমে হয়ে গেল। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল। তারপর বললেন, "বেচারা গৌতমকে অমন অত্যাচার করার কীই-বা দরকার ! টাকার দরকার, বললেই পারত। ...ছিছিছিছি..." এ প্রশ্নের জবাব যাদের দেওয়ার কথা, তারা এখন ত্রিসীমানার বাইরে। কাল রাত থেকেই তাদের আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষ্ণমোহন অবশ্য বললেন, "দেখুন গিয়ে ভাল কোনও জুজুৎসুর কোচ খুঁজতে গেছে। পাবে না মশাই, পাবে না। আমি বহু ঘাম ঝরিয়ে..."

(সমাপ্ত)

ছবি : অনুপ রায়

নানারকম

ধাঁধা

এবারের ধাঁধাটা ছোট্‌কা নাকি নিজে তৈরি করেনি। একরকম কুড়িয়েই পেয়েছে বলা যায়। ছোট্‌কাই এভাবে বলল কথাটা।
তা বলে সত্যি কি আর পথের ধুলোয় পড়ে ছিল ধাঁধাটা ? তা নয়। আবার কিছুটা তাও। ব্যাপারটাই কেমন ধাঁধা-ধাঁধা লাগছে, তাই না ? বেশ। প্রথম থেকেই বলি বরং।
আসলে ছোট্‌কা সেদিন ফেরার পথে অফিসের গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিল। অফিসপাড়া থেকে হাঁটতে-হাঁটতে গিয়েছিল কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায়। সেখানে খানিকটা সময় এ-বই ও-বই নাড়াচাড়া করে একটা খালি ট্রামে উঠে পড়ে। সেই ট্রামেই ছিল কয়েকজন কলেজের ছাত্র। নতুন ভর্তি হয়েছে কলেজে। একেবারে কলকল করছিল উচ্ছ্বাসে আর উল্লাসে। তো, তাদেরই নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি থেকে ছোট্‌কা ধাঁধাটা পেয়ে যায়।
এইরকম— **প্রথম ধাঁধা** ॥ বিকাশ, সুশীল আর পল্লব—তিন বন্ধু ঠিক করল যে কলেজ স্ট্রিটের বিখ্যাত

কচুরির দোকানে ঢুকে বিকেলের জলখাবারটা সেরে নেবে। কিন্তু ঢোকার আগেই বাধা। পল্লবের পকেট টুঁ-টুঁ, সুশীলের পকেটে খুচরো কুড়ি পয়সা মাত্র। টাকা বলে কিছু নেই। বিকাশ শুনে বলল,"নো প্রবলেম। আমি ধার দেব।"বলেই নিজের পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করল বিকাশ। দেখা গেল, ব্যাগে যে-টাকা আছে তা সমান তিনটে ভাগ হয়। একভাগ নিজে রেখে, দু'ভাগ দুই বন্ধুর হাতে আগাম তুলে দিল সে। ধার।
খাওয়াদাওয়ায় বাধা রইল না আর। মাথাপিছু চারটে করে কচুরি খেল তিন বন্ধু। দামও মেটাল মাথাপিছু চার টাকা করে।
দোকান থেকে বেরিয়ে নিজেদের বাকি টাকা বিকাশকে ফিরিয়ে দিল সুশীল আর পল্লব। ধার কমাল। বিকাশ নিজের টাকা আর দুই বন্ধুর ফেরত দেওয়া টাকা এক করতে গিয়ে দেখল, ব্যাগ খুলে টাকা ভাগের পর এক-একজনের ভাগে যত টাকা পড়েছিল, ঠিক তত টাকা তখন তার হাতে।
কত টাকা ছিল বিকাশের ব্যাগে, দোকানে ঢোকার সময় ?
দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ চারটে ২ দিয়ে ২৩ লিখতে পারো ? কীভাবে ?
তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—
ত্রাঙ্গুঅলিণ
গতবারের উত্তর ॥ (১) (ক) (৮৮৮৮-৮৮৮)÷ ৮ ; (খ) ৮(৮×৮+৮×৮)-৮-৮-৮ ; (গ) ৮+৮/৮-(৮×৮×৮-৮)-৮
(২) দুকূলে। দুকূল মানে রেশমি কাপড়। (৩) বদমেজাজি।
সত্যসন্ধ

ভাবতে ভাবতে

ছবি ও কবিতার মতো মানুষের আর-একটি ভাললাগার বিষয় হল সঙ্গীত। গান ভালবাসে না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। গান মানুষের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ। আমাদের গানের ভাণ্ডারও কিন্তু সমৃদ্ধ। তাই আমাদের গান গর্বের বস্তু। এবারে আমরা সঙ্গীত জগতের কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর জেনে নেব।
১ ॥ কে. এল. সায়গলের পুরো নাম কী ?
২ ॥ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গানের রেকর্ড আছে কোন সঙ্গীতশিল্পীর ?
৩ ॥ মোৎজার্টের শেষ বিখ্যাত সিম্ফনিটির নাম কী ?
৪ ॥ ভারতে জন্ম এবং এখন আমেরিকায় থাকেন এমন একজন বিখ্যাত সুরকারের নাম কী ?

উত্তর : (১) কুন্দনলাল সায়গল। (২) লতা মঙ্গেশকরের। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা আনুমানিক ৩০ হাজার। (৩) 'সিম্ফনি নং-৪১'। (৪) জুবিন মেহতা। এঁর জন্ম ভারতের বোম্বাইয়ে।
বর্ণপ্রিয়

মজার খেলা

এবারে মজার খেলাটা শুধুই খেলা নয়, খেলতে-খেলতে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি পরিমাপের এবং বাড়িয়ে নেওয়ারও একটা সহজ সুযোগ।
একটা খেলা শিখলেই দেখবে এই ছাঁচে নিজেরাই নতুন-নতুন তালিকা তৈরি করে নতুন-নতুন পরীক্ষা নিতে পারবে।
ভাবছ তো, তালিকাই বা কোথায়, পরীক্ষাই বা কী ধরনের ! বেশ। এবারের খেলাটা সহজ ইংরেজি দিয়েই শিখবে এসো। পরিষ্কার পুরো পাতা কাগজে নীচের তালিকার অনেক কপি তৈরি করে রাখো। কার্বন পেপারে লিখলে কপি বানানো সহজ। যে-ক'জন বন্ধুকে নিয়ে খেলবে, সেই ক'টা কপি হলেই চলবে আপাতত। লেখো—

IMP	TER
CAR	HER
FAT	NIC
BET	ENT
NAP	TEN
BUT	BIT
TEA	TON
RAT	KEY
DON	ART
COW	POT
TIT	TLE
MOM	KIN
BUT	BOY
SET	PET
ROT	RAY
PIC	HER

লিখেছ। এবার বন্ধুদের প্রত্যেকের হাতে কাগজটার কপি ধরিয়ে দাও। তাদের কাজ হবে প্রথম কলমের শব্দের যোগ্য বাকি অংশটুকু দ্বিতীয় কলম থেকে খুঁজে নিয়ে ছ' অক্ষরের ১৬টা চেনা ইংরেজি শব্দ তৈরি করে ফেলা। তৈরির দরকার হবে না। ঠিকমতো জুড়তে পারলেই ১৬টা শব্দ একেবারে বাদল শেষের 'চামেলি কলিয়া' হয়ে হেসে উঠবে।

সমাধান : IMPART, CARPET, FATHER, BETRAY, NAPKIN, BUTTER, TEAPOT, RATHER, DONKEY, COWBOY, TITBIT, MOMENT, BUTTON, SETTLE, ROTTEN এবং PICNIC
মজারু

নাইল হার্বাল ঠিক যেন আপনার চুলের সুষম আহার

দীর্ঘ জীবনের জন্য আমাদের যেমন প্রয়োজন প্রাকৃতিক ফলমূল ও শাকসব্জি, ঠিক তেমনই একমাথা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের জন্য দরকার শিকাকাই, তুলসী, রিঠা ও আমলকী সমৃদ্ধ নাইল।

নাইল তৈরী হয়েছে সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ 'চরক সংহিতা'য় নির্দেশিত সূত্র থেকে। রিঠা, তুলসী, আমলকী, শিকাকাই-এর সুষম ও সঠিক ভেষজ মিশ্রণে গুণান্বিত নাইল আপনার চুলকে জোগাবে পর্যাপ্ত পুষ্টি, গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত চুলকে করে তুলবে শক্তপোক্ত।

রিঠা ও আমলকী শ্যাম্পু

'চরক সংহিতা'র সূত্রানুযায়ী রিঠা ও আমলকীর সংমিশ্রণ চুলকে দেবে 'কন্ডিশনিং' এর পরিচর্যা এবং চুলকে তার স্বাভাবিক উজ্বল কালো রং ফিরিয়ে দিয়ে করে তুলবে স্বাস্থ্যোদীপ্ত।

আমলকী ও শিকাকাই শ্যাম্পু

'চরক সংহিতা'র নির্দেশমত আমলকী ও শিকাকাই মিশ্রণে তৈরী শ্যাম্পু চুলকে দেবে পুষ্টি, ঘনত্ব ও মসৃণতাকে করবে সুনিশ্চিত, সেই সংগে খুশকী থেকে দেবে মুক্তি।

তুলসী ও আমলকী শ্যাম্পু

'চরক সংহিতা'র মতে, তুলসী ও আমলকীর মিশ্রণে তৈরী শ্যাম্পু চুলের গোড়া শক্ত করতে, চুল পড়া বন্ধ করতে, এবং একই সংগে চুলকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কালো, মসৃণ ও চিকন করে তুলতে দারুণ কার্যকারী।

নাইল™
হার্বাল শ্যাম্পু

নাইল হার্বাল শ্যাম্পু এখন ১২ মিলি স্যাচে পাওয়া যাচ্ছে।

নাইল-এ আছে গুণসমৃদ্ধ ভেষজ এর সঠিক মিশ্রণ যা চুলের পুষ্টি জোগাতে এবং চুলকে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত স্বাস্থ্যময় করে তুলতে অদ্বিতীয়।

তুলসী ও আমলকী · রিঠা ও আমলকী · আমলকী ও শিকাকাই

স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল... দিনের পর দিন, বহু দিন...

FOUNTAINHEAD-1547-95

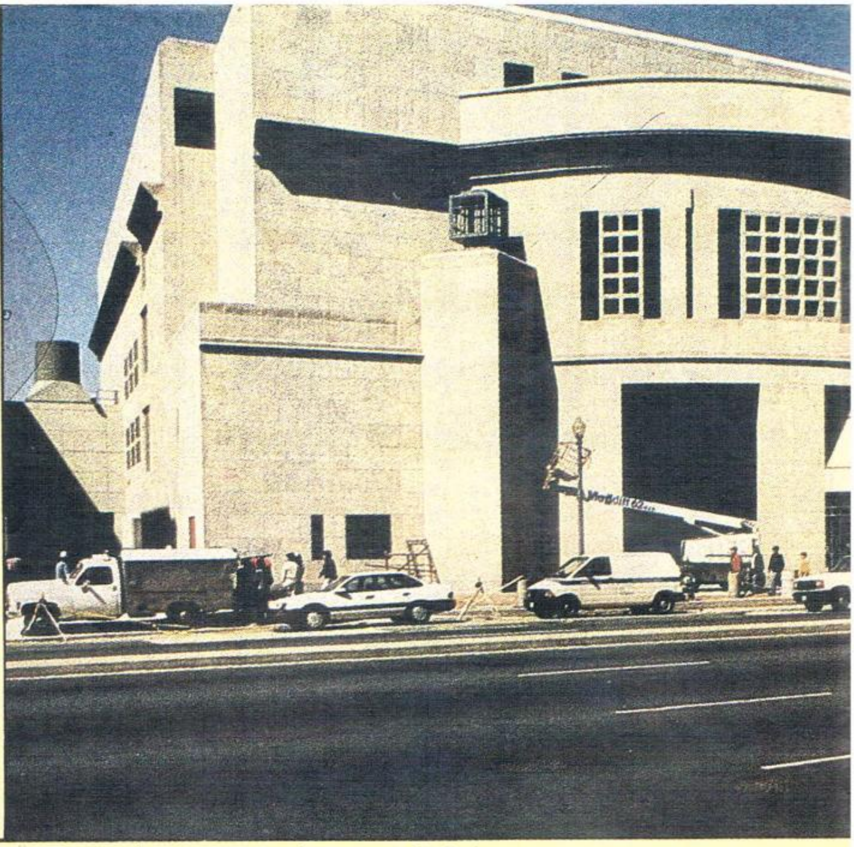

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে গড়ে উঠেছে হলোকস্ট মিউজিয়ম

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মনে পড়িয়ে দেয় যে জাদুঘর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ও মর্মান্তিক স্মৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে ওয়াশিংটনের 'দ্য হলোকস্ট মিউজিয়ম'। লিখেছেন **প্রশান্তকুমার বসু**

এই জাদুঘরে ঢুকতে গেলে বয়স হতে হবে কম করে ১১ বছর। কারণ এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি এর চেয়ে ছোট বয়সের কারও পক্ষে বুঝতে পারা মুশকিল। ওয়াশিংটনের 'হলোকস্ট মিউজিয়ম'-এর দর্শনীয় জিনিসগুলির বিভীষিকা এমনই। নতুন এই জাদুঘর বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার এক নীরব অথচ মর্মান্তিক সাক্ষী। তবে হলোকস্ট মিউজিয়মে ছোটদের জন্যও সাজানো আছে অনেক কিছু। ছোটদের 'গ্যালারি'তে ঢোকার মুখেই জ্বলজ্বল করছে এই ক'টি কথা—শিশুদের মনে রেখো। বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা আট বছরের ড্যানিয়েল যে চোখে দেখেছিল, সেই চোখ দিয়েই আজকের হাজার-হাজার ড্যানিয়েলরাও দেখছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে ১৫ লক্ষ শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল,

বিশ্বযুদ্ধের অনেক গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এ ধরনের দুধের পাত্রে

ড্যানিয়েল যেন তাদেরই প্রতীক। এই অংশের একটি দেওয়ালে আছে ড্যানিয়েল এবং অন্য নিহত শিশুদের স্মৃতির উদ্দেশে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মার্কিন কিশোর-কিশোরীর সেরামিক টালিতে আঁকা ছবি।

১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল উদ্বোধন হল হলোকস্ট মিউজিয়মের। যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্যাপিটল হল বিল্ডিং'-এ এই উদ্বোধন উপলক্ষে এসেছিলেন অনেকেই। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যাগতদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ অফিসার, বিদেশি কূটনীতিক থেকে শুরু করে জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফন ওয়াইজেকার, আমেরিকার 'জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ' কলিন পাওয়েল, প্রতিনিধিসভার অধ্যক্ষ টম কোলি, জার্মানির বিদেশমন্ত্রী হান্স ডিয়েট্রিশ গেন্সার এবং আরও অনেকে। মিউজিয়মটি উদ্বোধন করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন। সেদিন ছিল ভীষণ ঠাণ্ডা, বৃষ্টি পড়ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত ৬০ লক্ষ ইহুদি, জিপসি, পোলিশ, প্রতিবন্ধী, রাজনৈতিক বন্দি এবং ধৃত সৈন্যদের দীর্ঘশ্বাস যেন শোনা যাচ্ছিল বাতাসে কান পেতে। যাঁরা মৃত, যাঁরা কোনওমতে বেঁচে ফিরতে পেরেছেন, সকলের উদ্দেশেই সজল-চোখে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সমবেত অতিথিরা। নোবেলজয়ী চেসল মিলাজ পাঠ করেছেন ওঁদের উদ্দেশ্যে কবিতা।

এই অনুষ্ঠানের একটি পর্ব ছিল ছ'টি প্রদীপ জ্বালানো। এই কাজে অতিথিদের সাহায্য করতে

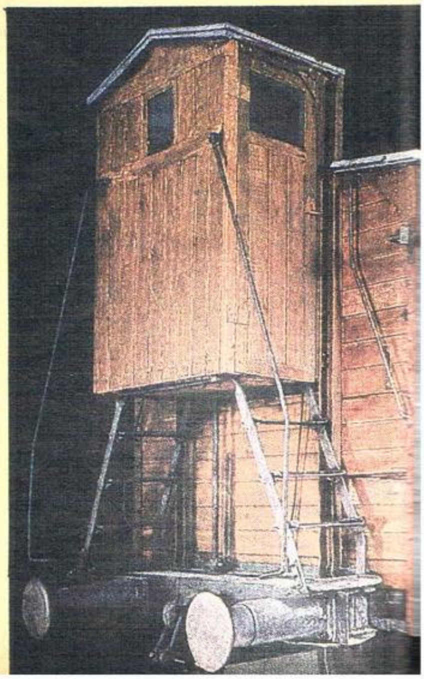

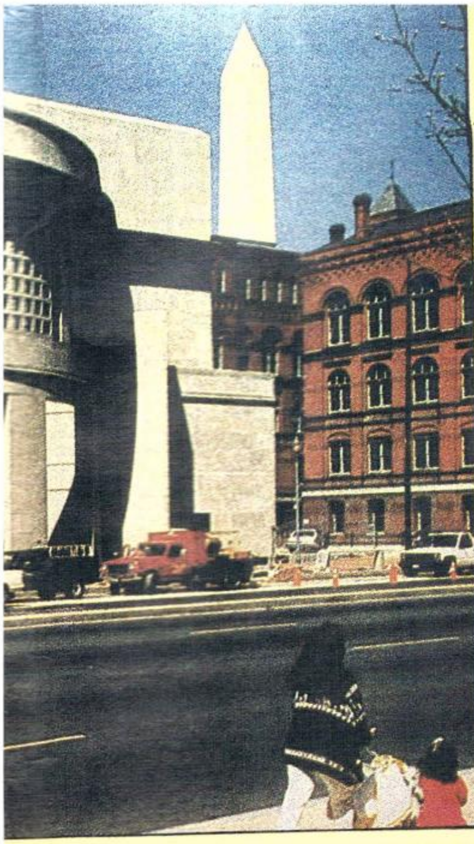

এগিয়ে এসেছিল ১১ বছরের অ্যাশলে ব্ল্যাক। নিউ জার্সির যে অঞ্চলে অ্যাশলে থাকে সেখানে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে একজন যোদ্ধা হিসেবে সে একটি বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা বেঞ্জামিন মিড বলেছেন, "পরিবর্তনশীল সময়ে যেমন স্বাধীনতার নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ হচ্ছে, পাশাপাশি উদ্বেগ এবং উদ্ভাবনাও বাড়ছে।" এই জাদুঘরের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য হল আজকের মানুষদের এই মর্মন্তুদ হত্যালীলার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া এবং যাঁরা এই বিভীষিকার সাক্ষী, তাঁদের কথা মনে রাখা।

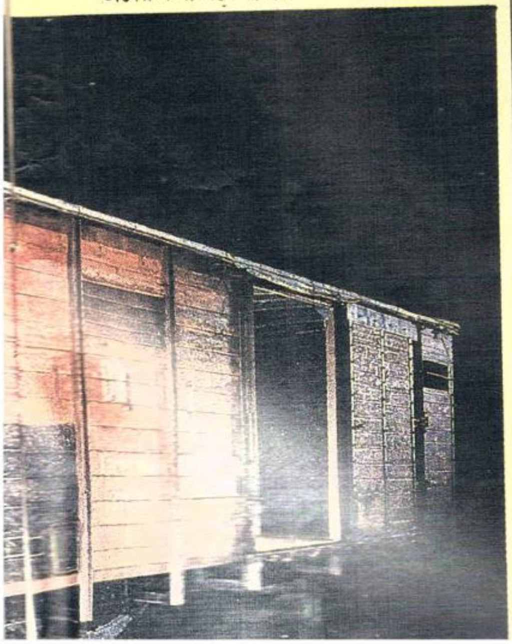

এ ধরনের ট্রেনে করেই যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে যাওয়া হত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে

মার্কিন কংগ্রেসে ১৯৮০ সালে একটি সর্বসম্মত সনদের ভিত্তিতেই এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সূচনা। মিউজিয়মের নকশা করার দায়িত্বে ছিলেন জেম্‌স ইঙ্গোফ্রিড। তিনি মাথায় রেখেছিলেন ওই চত্বরের অন্য স্থাপত্যগুলির কথা। তার আগে ঘুরে বেড়িয়েছেন কুখ্যাত 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প'গুলিতে, যেখানে নিরপরাধ মানুষরা অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে মৃত্যুর প্রহর গুনেছেন। এসব চিন্তারই পরিণতি ওয়াশিংটনের 'ফোর্টিন্‌থ স্ট্রিট' এবং 'রাওল ওয়ালেনবার্গ প্লেস'-এর মাঝামাঝি এই বাড়িটি। এই বাড়িটির তিনটি তলা জুড়ে আছে বিশ্বযুদ্ধের স্থায়ী প্রদর্শনী। ছবি, ফোটো, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এবং অন্যান্য সংগ্রহ নিয়েই গড়ে উঠেছে এই জাদুঘর। এ-বাড়িতে সংগৃহীত জিনিসপত্রের স্থায়ী ঠিকানা যেখানে, সেই 'হল অব উইটনেস' থেকেই দর্শকদের নিয়ে যাওয়া হয় পাঁচ তলায়। তারপর ঘোরানো সিঁড়ির সাহায্যে এক-এক করে নীচে নামার পথে তাঁরা দেখতে-দেখতে আসেন প্রতিটি কক্ষ। নামার পথে প্রত্যেকেই পাবেন একটি আইডেনটিটি কার্ড, যেটিতে লেখা থাকবে বিশ্বযুদ্ধে নিহত কোনও নিরপরাধ মানুষের জীবনপঞ্জী। যত সময় এগোবে, তত নতুন-নতুন সংগ্রহের মুখোমুখি হবেন দর্শকরা। কার্ডে উল্লিখিত দুর্ভাগা মানুষটির সঙ্গে ক্রমে একাত্ম হয়ে উঠবেন তাঁরা।
জাদুঘরের স্থায়ী যে অংশ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে সেখানে আছে মার্কিন সেনাদের এই যুদ্ধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বিবরণ। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে ১৯৪৫ সালে হানা দিয়ে এঁরা মুক্ত করেছিলেন বন্দিদের। দেখা যাবে কীভাবে ১৯৩০ সাল থেকে শুরু করে ঠাণ্ডা মাথায় চালানো হয়েছিল এই নিধনযজ্ঞ। দেখা যাবে কুখ্যাত 'ঘেটো' এবং 'ডেথ ক্যাম্প'-এর দৃশ্যও। যুদ্ধ থেকে ফিরে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন যেসব মার্কিন সৈন্য, আছে তাঁদের কথাও।
জাদুঘর ঘুরে দেখার শেষ পর্যায়ে দর্শকরা আকাশের আলোয় স্নিগ্ধ এক ছ'কোনা স্মরণকক্ষে এসে দাঁড়াবেন। একটি জানলার ভেতর দিয়ে দেখা যাবে 'ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল' এবং আর একদিক দিয়ে 'জেফারসন মেমোরিয়াল'। জাদুঘরের একটি কক্ষে কম্পিউটারের সাহায্যে দর্শকরা নিজেরাই অনেক তথ্য পেতে পারেন। অথবা পেতে পারেন প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিডিও রেকর্ডিং। যাঁরা পেশাদার শিক্ষক হিসেবে হলোকস্ট সম্পর্কে জানতে চান তাঁদের জন্য আছে হলোকস্ট শিক্ষাকেন্দ্র। বাইরেও বিভিন্ন জায়গায়

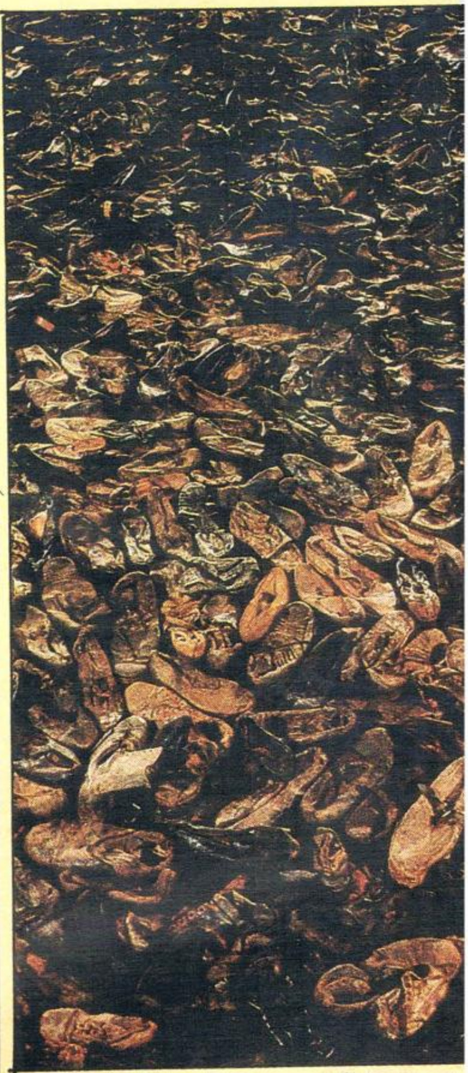

সংরক্ষিত আছে বিশ্বযুদ্ধে নিহত ৪০০০ পোলিশ-এর জুতো

শিক্ষকদের সুবিধের জন্য নানারকম অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।
অনন্য এই জাদুঘর সম্পর্কে আরও কিছু না বললে এর সম্পর্কে তথ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বর্তমানে এই জাদুঘরটিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হলোকস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়। এদের বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে আছে শিক্ষাসংক্রান্ত সম্মেলনের আয়োজন করা, বইপত্র প্রকাশ এবং পড়াশোনার জন্য বৃত্তি প্রদান। এ ছাড়া সংগ্রহশালায় আছে একটি লেখ্যাগার ('আর্কাইভ'), গ্রন্থাগার, ছবির সংগ্রহশালা, মৌখিক ইতিহাসের সংগ্রহশালা এবং অতি সযত্নে রক্ষিত জীবিত ইহুদি সাক্ষীদের সম্পর্কে নানা তথ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গড়ে তোলা এই হলোকস্ট মিউজিয়ম এভাবেই হয়ে উঠেছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর মানুষের এক সম্মিলিত প্রতিবাদ।

★ *সৌজন্য : মার্কিন তথ্য দফতর*

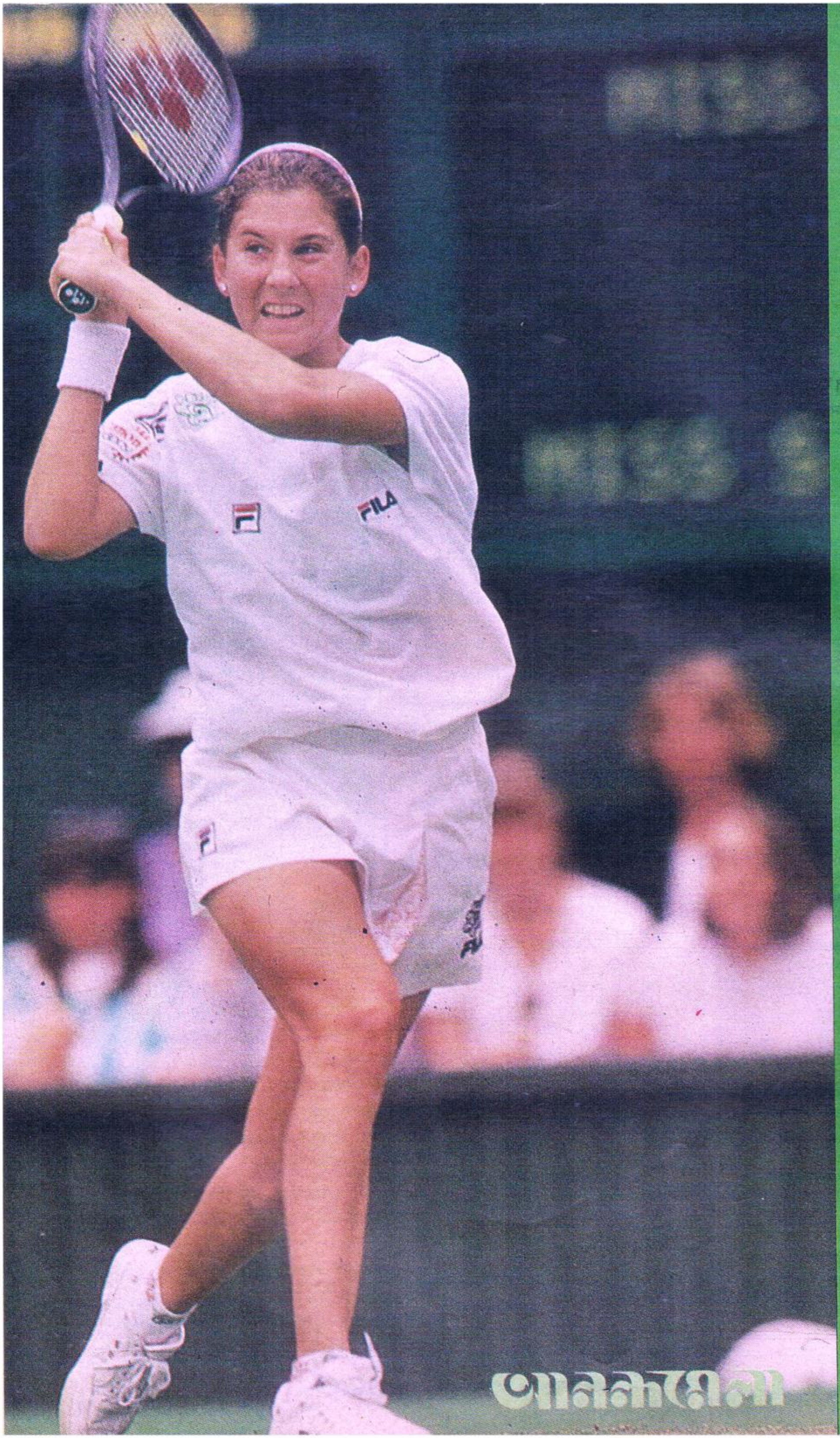

মো নি কা সে লে স

মেয়েদের টেনিসে স্টেফি গ্রাফের প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য খর্ব করেছিলেন মোনিকা সেলেস। ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে প্রায় দু'বছর তিনি টেনিস-কোর্টের বাইরে ছিলেন। এখন ফিরে এসেছেন সেলেস, এবং সবার আশা, ইউ এস ওপেন থেকেই মেয়েদের টেনিসে আবার শুরু হয়ে যাবে জোর লড়াই। স্টেফির সঙ্গে এখন যুগ্মভাবে শীর্ষস্থানে আছেন সেলেস।

একদিনের ক্রিকেট : সেরা পাঁচ বোলারের তিনজনই পাকিস্তানের

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেরা পাঁচ বোলারের মধ্যে আছেন পাকিস্তানের দুই ক্রিকেটার। একদিনের ক্রিকেটেও পাকিস্তানের বোলাররা সফল। লিখেছেন **হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম পাঁচ সেরা বোলারের মধ্যে তিনজনই পাকিস্তানের। মাত্র ১০৪টি ম্যাচ খেলে ১৭৬টি উইকেট দখল করে ওয়াকার ইউনুস আছেন পঞ্চম স্থানে। ১৭৫টি ম্যাচে ১৮২টি উইকেট জয়ী পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইমরান খানের স্থান চতুর্থ। ১৮৯টি ম্যাচে ২৭৩টি উইকেট নিয়ে এই মুহূর্তে শীর্ষে আছেন ওয়াসিম আক্রম। কিন্তু যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হল '৯৬ সালের বিশ্বকাপে আক্রম কি এক নম্বর বোলার হতে পারবেন ? গত পাঁচটি বিশ্বকাপে এ-পর্যন্ত মোট ২৮টি ম্যাচ খেলে ৩৪টি উইকেট দখল করে শীর্ষস্থানে আছেন ইমরান খান। দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের ইয়ান বথাম, তাঁর সংগ্রহ ২২টি ম্যাচে

পুরনো অ্যালবাম থেকে : আকিব জাভেদ, ইমরান খান ও ওয়াসিম আক্রম

বিশ্বকাপের সেরা পাঁচ বোলার

বোলার	দেশ	ম্যাচ	বল	রান	উইকেট	গড়	সেরা বোলিং
ইমরান খান	পাকিস্তান	২৮	১০১৭	৬৫৫	৩৪	১৯.২৬	৪/৩৭
ইয়ান বথাম	ইংল্যান্ড	২২	১৩৩২	৭৬২	৩০	২৫.৪০	৪/৩১
কপিলদেব	ভারত	২৬	২৩৭	৮৯২	২৮	৩১.৮৫	৫/৪৩
অ্যান্ডি রবার্টস	ওঃ ইন্ডিজ	১৬	১০২১	৫৫২	২৬	২১.২৩	৩/৩২
ক্রেগ ম্যাকডারমট	অস্ট্রেলিয়া	১৬	৮৭৬	৫৯৭	২৬	২২.৯৬	৫/৪৪
ওয়াসিম আক্রম	পাকিস্তান	১৭	৯২৫	৬৩৫	২৫	২৫.৪০	৪/৩২

ক্রেগ ম্যাকডারমট

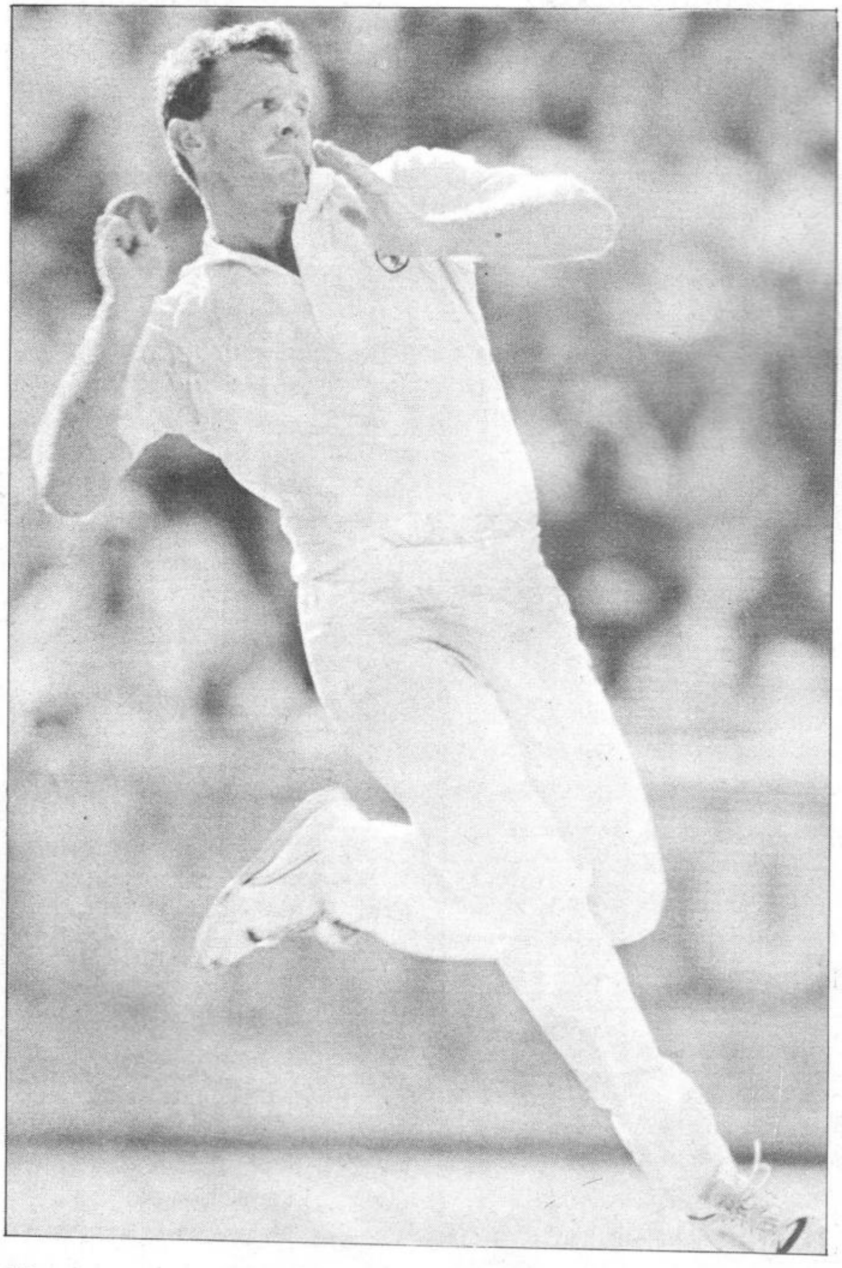

কপিলদেব

৩০টি উইকেট। ২৬টি ম্যাচে ২৮টি উইকেট তুলে নিয়ে ভারতের কপিলদেবের স্থান তৃতীয়। যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থানে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যাণ্ডি রবার্টস ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রেগ ম্যাকডারমট। দু'জনেই ১৬টি ম্যাচ খেলে ২৬টি করে উইকেট পেয়েছেন। আক্রম আছেন এই মুহূর্তে পঞ্চম স্থানে। ১৯৮৭ ও ১৯৯২—এই দুটি বিশ্বকাপে ১৭টি ম্যাচ খেলে আপাতত আক্রম পেয়েছেন ২৫টি উইকেট। ইমরান, বথাম, কপিল ও রবার্টস—চারজনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ফলে তাঁদের পক্ষে নিজেদের জায়গা ধরে রাখা আর সম্ভব হবে না। শীর্ষ স্থানাধিকারী ইমরানের সঙ্গে আক্রমের তফাত মাত্র ৯টি উইকেটের। অঘটন না ঘটলে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সেই ঘাটতি পুষিয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের এক নম্বর বোলারের মর্যাদা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আক্রমের। অবশ্য এই লড়াইয়ে তাঁকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিতে পারেন ম্যাকডারমট। তিনিও গত দুটি বিশ্বকাপে ১৬টি ম্যাচ খেলে আক্রমের চেয়ে একটি উইকেট বেশি দখল করেছেন। এঁদের পেছনে তাড়া করছেন ইংল্যান্ডের ফিলিপ ডেফ্রিটাস (১৮টি ম্যাচে ২৩টি উইকেট) এবং ভারতের মনোজ প্রভাকর (১৫টি ম্যাচে ২১টি উইকেট)। প্রশ্ন উঠতে পারে, ওয়াকার ইউনুস এই তালিকায় নেই কেন ? আসলে একদিনের ক্রিকেটে মাত্র ১০৪টি ম্যাচে ১৭৬টি উইকেট কুড়িয়ে নেওয়া ইউনুস এখনও বিশ্বকাপ ক্রিকেটে খেলেননি। ১৯৯২-এর বিশ্বকাপে আঘাতজনিত কারণে শেষপর্যন্ত তিনি দল থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য

হন।

টেস্ট ক্রিকেটের পঞ্চম ও সীমায়িত ওভারের ক্রিকেটের চতুর্থ স্থানাধিকারী বোলার, ইউনুসের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন, ইমরান বিশ্বকাপের এক নম্বর বোলারের জায়গাটি এবার আর সম্ভবত ধরে রাখতে পারবেন না। তবে ইমরানের তাতে কিছু যায়-আসে না। রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্যই। ইমরান তার চেয়েও বড় কাজ করেছেন দেশের জন্য। তাঁর স্বপ্ন ছিল, পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ এনে দেবেন। এবং সেটা তিনি এনে দিয়েছেন ১৯৯২ সালে।

ভারতীয় অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন সম্প্রতি ঠিকই বলেছেন—"যে-মুহূর্তে সার রিচার্ড হ্যাডলির ৪৩১টি উইকেট টপকে গিয়ে ৪৩২টি উইকেটে পৌঁছে কপিলদেব টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে বেশি 'উইকেট দখলের বিশ্ব রেকর্ড'টি গড়েন, তখনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে তাঁর অবসর নেওয়া উচিত ছিল। তা হলে টেস্ট ক্রিকেট ও সীমায়িত ওভারের ক্রিকেট—দুটোতেই শীর্ষে থেকে অবসর নিতে পারতেন কপিল। সেটা না করায় কিছুদিনের মধ্যেই একদিনের ক্রিকেটের এক নম্বর জায়গাটি থেকে কপিলকে সরিয়ে দেন আক্রম। আপাতত ১৮৯টি ম্যাচে ২৭৩টি উইকেট দখল করেছেন তিনি। ২২৪টি ম্যাচে কপিলের সংগ্রহ ২৫৩টি উইকেট। তবে দু'নম্বর জায়গাটি কপিল আরও কিছুদিন ধরে রাখতে পারবেন। আপাতত যিনি তৃতীয় স্থানে আছেন, সেই ক্রেগ ম্যাকডারমট এখনও ২০০ উইকেটে পৌঁছতে পারেননি। ১২৯টি ম্যাচ খেলে এ-পর্যন্ত তিনি পেয়েছেন

একদিনের ক্রিকেটে বোলার আক্রম এখন সবার আগে

১৯০টি উইকেট। তাঁকে তাড়া করছেন ইউনুস। ম্যাচ-প্রতি উইকেট দখলের হিসেবে সকলকে ছাপিয়ে গেছেন এই পাক পেসারটি। এই ধারা বজায় রাখতে পারলে একমাত্র ওয়াকার ইউনুসই পারবেন সতীর্থ আক্রমকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিতে। আপাতত তাঁর লক্ষ্য ম্যাকডারমটকে অতিক্রম করা। যেমন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোর্টনি ওয়াল্‌শের আশু টার্গেট, রিচার্ড হ্যাড্‌লি, স্টিভ ও'দের ছাপিয়ে যাওয়া। হ্যাড্‌লি ও কোর্টনি ওয়াল্‌শ যুগ্মভাবে আছেন সপ্তম স্থানে। দু'জনেই ১৫৮টি উইকেট দখল করেছেন। তবে এজন্য হ্যাড্‌লিকে (১১৫) ২৭টি ম্যাচ কম খেলতে হয়েছে ওয়াল্‌শের (১৪২) চেয়ে।

একদিনের আন্তর্জাতিকে সেরা ১০ ব্যাটস্‌ম্যানের তালিকায় একজন মাত্র ভারতীয় ক্রিকেটার আছেন, তিনি মহম্মদ আজহারউদ্দিন। তবে সেরা ১০ বোলারের তালিকায় কপিল ছাড়া আরও একটি নাম আছে, মনোজ প্রভাকর। তাঁর স্থান আপাতত দশম। ১২১টি ম্যাচ খেলে প্রভাকর ১৪৭টি উইকেট দখল করেছেন। তাঁর ওপরে রয়েছেন কার্টলে অ্যামব্রোজ, তিনি পেয়েছেন ১১৪টি ম্যাচে ১৫৪টি উইকেট। আমরা কিন্তু খেয়ালই করিনি, একদিনের ক্রিকেটে প্রভাকর ১৫০টি উইকেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। কৃতিত্বটা মোটেই উপেক্ষার নয়।

একদিনের আন্তর্জাতিকে প্রথম ১০ বোলার

বোলার	দেশ	ম্যাচ	বল	রান	উইকেট	গড়	সেরা বোলিং
ওয়াসিম আক্রম	পাকিস্তান	১৮৯	৯৮০০	৬১৭৪	২৭৩	২২.৬১	৫/১৫
কপিলদেব	ভারত	২২৪	১১২০৪	৬৯৪৬	২৫৩	২৭.৪৫	৫/৪৩
ক্রেগ ম্যাকডারমট	অস্ট্রেলিয়া	১২৯	৭০২৩	৪৭৩৩	১৯০	২৪.৯১	৫/৪৪
ইমরান খান	পাকিস্তান	১৭৫	৭৪৬১	৪৮৪৫	১৮২	২৬.৬২	৬/১৪
ওয়াকার ইউনুস	পাকিস্তান	১০৪	৫২৩১	৩৮০০	১৭৬	২১.৫৯	৬/২৬
স্টিভ ও	অস্ট্রেলিয়া	১৮৫	৭৩৩২	৫৪১৪	১৬২	৩৩.৪১	৪/৩৩
রিচার্ড হ্যাড্‌লি	নিউজিল্যান্ড	১১৫	৬১৮২	৩৪০৭	১৫৮	২১.৫৬	৫/২৫
কোর্টনি ওয়াল্‌শ	ওঃইঃ	১৪২	৭৪৭৬	৪৭৮৪	১৫৮	৩০.২৭	৫/১
ম্যালকম মার্শাল	ওঃইঃ	১৩৬	৭১৭১	৪২৩৩	১৫৭	২৬.৯৬	৪/১৮
কার্টলে অ্যামব্রোজ	ওঃইঃ	১১৪	৬০৯৫	৩৫৭৬	১৫৪	২৩.২২	৫/১৭
মনোজ প্রভাকর	ভারত	১২১	৫৯৪৫	৪১৮৮	১৪৭	২৮.৪৮	৫/৩৫

খেলার খবর

আনাতোলি কারপোভ এ-মাসেই আসছেন ভারতে। কোনও ম্যাচ খেলতে নয়। সাংহি চেজ অ্যাকাডেমিতে তিনি তরুণ দাবা শিক্ষার্থীদের খেলা শেখাবেন। তাঁদের সঙ্গে দিনকয়েক

আনাতোলি কারপোভ

থাকবেনও। অ্যাকাডেমির কর্মকর্তারা চেষ্টা করেছিলেন, যদি এ-বছরে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান গ্যারি কাসপারভকেও 'গেস্ট লেকচারার' হিসেবে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকায় তিনি আসতে পারছেন না। তবে আগামী বছর তিনি আসার ইচ্ছে জানিয়েছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিশ্বনাথন আনন্দের পর যাতে নতুন প্রতিভা ভারতে উঠে আসে, সেজন্যই তাঁরা এইসব বিশ্ব-সেরা খেলোয়াড়কে এখানে আনছেন।

❑

আলজিরিয়ার মাঝারিপাল্লার দৌড়বীর নুরুদ্দিন মোরসেলির কাছে বিশ্ব রেকর্ড এখন যেন জলভাত। নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙছেন, মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানেই দু-দুটি বিশ্বরেকর্ড করলেন তরুণ মোরসেলি। মাত্র একটি ইভেন্টে নয়, মাঝারিপাল্লার প্রায় সব ইভেন্টেই এখন মোরসেলির একচ্ছত্র আধিপত্য।

১৫০০ মিটার দৌড়ে সম্প্রতি নিজেরই বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন মোরসেলি, ফ্রান্সের নিস-এ আন্তর্জাতিক গ্রাঁ প্রি অ্যাথলেটিক্স টুর্নামেন্টে, দৌড়লেন ৩ মিনিট ২৭.৩৭ সেকেন্ডে। ১৯৯২-এর সেপ্টেম্বরে ইতালিতে এই ১৫০০ মিটারেই বিশ্বরেকর্ড গড়েন তিনি। তখন সময় নেন ৩ মিনিট ২৮.৮৬ সেকেন্ড। ১৫০০ মিটার দৌড়ের কয়েকদিন আগে ২০০০ মিটার দৌড়েও নতুন বিশ্বরেকর্ড (৪:৪৭.৮৮ সেকেন্ড) গড়েন মোরসেলি। ১৫০০ এবং ২০০০ মিটার ছাড়াও এই মুহূর্তে ৩০০০ মিটার দৌড়ের বিশ্বরেকর্ডের মালিকও তিনি। ১৫০০ এবং ১০০০ মিটার দৌড়ের ইণ্ডোর বিশ্বরেকর্ডও মোরসেলির দখলে। এত বিশ্বরেকর্ড গড়লেও মোরসেলি জানিয়েছেন, "বিশ্বরেকর্ড করা সহজ নয়। এক-একটা রেকর্ডের জন্য নিজেকে ছ'-সাত বছর ধরে তৈরি করতে হয়।" বিশ্বরেকর্ড গড়লেও সময় নিয়ে কিন্তু মোরসেলি সন্তুষ্ট নন। তিনি আরও সময় কমাতে চান। কিন্তু করবেন কী করে? ১৫০০ এবং ২০০০ মিটার দৌড়ের দুটি ইভেন্টেই দেখা গেল, শেষ ৫০০ মিটারে ট্র্যাকে রয়েছেন তিনি একা। কাছাকাছি কেউ নেই। মজা করে ২৫ বছর বয়সী তরুণ দৌড়বীর মোরসেলি বলেছেন, "প্রতিদ্বন্দ্বীই নেই। সময় কমাব কী করে?"

❑

মাইক টাইসনের প্রত্যাবর্তনের লড়াই নিয়ে সাধারণ দর্শক যত না উত্তেজিত, তার চেয়েও বেশি তৎপর আমেরিকার বিভিন্ন টেলিভিশন সংস্থা। আর কয়েকদিন পরেই, ১৯ অগস্ট টাইসন লাস ভেগাস-এ লড়বেন আর-এক বক্সার পিটার ম্যাকলিনের সঙ্গে। এই লড়াই সরাসরি টিভিতে দেখবেন কয়েক কোটি দর্শক। এটি প্রচারের স্বত্ব পেয়েছে 'শো টাইম এন্টারটেনমেন্ট' টেলিভিশন সংস্থা। তারাই বিভিন্ন কেব্‌ল টিভি এবং অন্য সংস্থাকে বিশাল অর্থের বিনিময়ে এই লড়াই দেখানোর সুযোগ দিচ্ছে। কেব্‌ল টিভি সংস্থাগুলি আবার প্রতিটি দর্শকের কাছ থেকে আগাম অর্থ নিয়ে নিচ্ছে। এর আগে কোনও কিছু দেখানোর জন্য এরকমভাবে আগাম অর্থ

মাইক টাইসন

নেওয়া হয়নি। ১৯৯১ সালের এপ্রিলে হোলিফিল্ড এবং ফোরম্যানের লড়াইয়ে এইরকম উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এই লড়াইয়ের কাছে তা কিছুই নয় বলে জানিয়েছেন বক্সিং বিশেষজ্ঞরা। শোনা যাচ্ছে, মাইক টাইসন ভালই প্র্যাকটিস করছেন। অনুশীলনে যে ছ'জন সহকারীকে তিনি রেখেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই নক আউট করতে একেবারেই সময় নিচ্ছেন না।

❑

অদূরভবিষ্যতে ভারত কি একজন প্রথম শ্রেণীর গলফ খেলোয়াড় পেতে চলেছে? দিল্লির গলফ মাঠে আজকাল একজন নতুন খেলোয়াড়ের প্র্যাকটিস ঘিরে যেমন প্রবল উৎসাহ দেখা যাচ্ছে দর্শকদের মধ্যে, তাতে মনে হতেই পারে এ-কথা! নিজের 'পজিশন' ঠিক করে নিয়ে, মাথা তুলে তিনি একবার ৩৮০ মিটার দূরের ফ্ল্যাগটা দেখে নিচ্ছেন, তারপর স্টিক দিয়ে বল মারছেন। এবং মোটামুটি সফলও হচ্ছেন। হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন উপস্থিত দর্শকরা। এই নতুন

গলফ খেলোয়াড়টির নাম কপিলদেব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁর এখন সবচেয়ে প্রিয় খেলা গলফ। ভাল গলফার হতে গেলে দরকার মনোযোগ, ধৈর্য এবং টেকনিক— প্রথম দুটি কপিলদেবের যথেষ্ট আছে, তৃতীয়টিই এখন শিখছেন তিনি। তবে ক্রিকেটের প্রতি তাঁর ভালবাসা এখনও অটুট। ভিডিওতে দেখছেন লিলির দুর্দান্ত বোলিং-এর কিছু ইনিংস। এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করেন, "কী অসাধারণ বোলিং। ফিটনেসের সমস্যা থাকলেও লিলির স্ট্রাইক রেট কখনও কমেনি। তরুণদের দেখা উচিত এই বোলিং।" বিখ্যাত ক্রিকেটারদের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা থাকলেও কপিল নিজে কিন্তু এখন আর ক্রিকেট খেলতে একেবারেই আগ্রহী নন। কপিল ঠিক করেছেন, তিনি এখন আর কোনও ক্রিকেট ম্যাচই খেলবেন না। এমনকী কোনও 'বেনিফিট ম্যাচ'ও খেলার ইচ্ছে নেই তাঁর। অর্থাৎ তাঁর মণপ্রাণ জুড়ে এখন শুধুই গল্‌ফ।

কপিলদেব

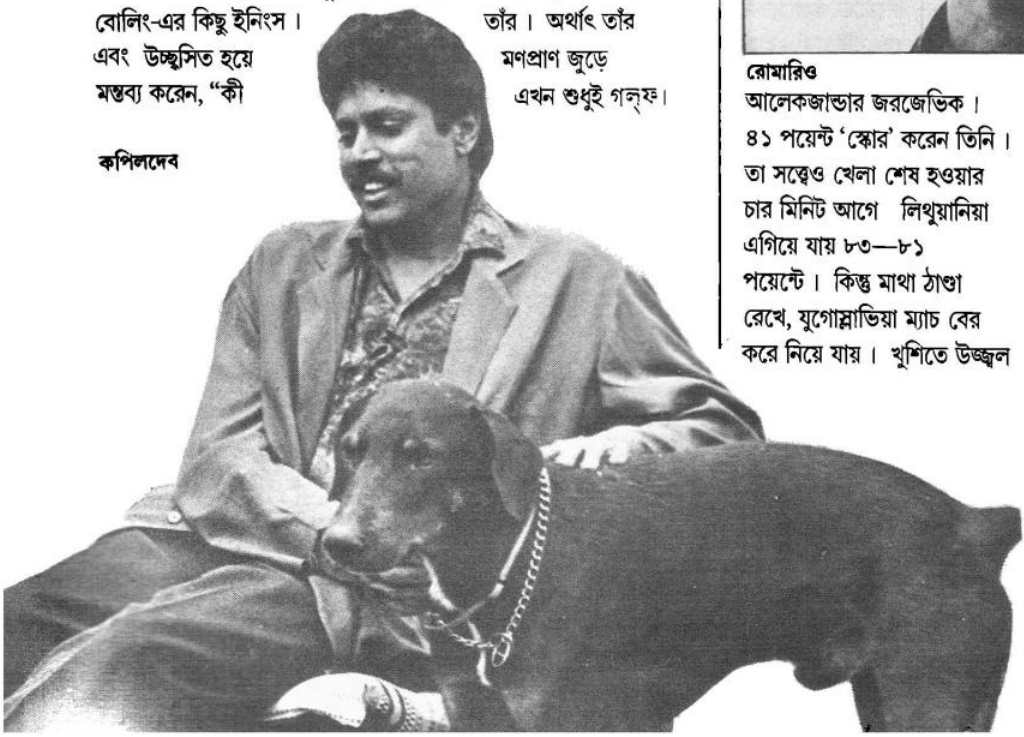

❑

নাটকীয় বললে কম বলা হবে, প্রকৃতপক্ষে চরম উত্তেজনার মধ্যে আথেন্স-এ শেষ হল এবারের 'ইউরোপিয়ান বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ'। ফাইনাল ম্যাচ। জিতল যুগোস্লাভিয়া। হারাল লিথুয়ানিয়াকে। ৯৬—৯০ পয়েন্টে জিতল যুগোস্লাভিয়া। পয়েন্টের ব্যবধান দেখেই বোঝা যাচ্ছে কী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল এই ম্যাচে। হাফ-টাইমে লিথুয়ানিয়া এগিয়ে ছিল ৪৯—৪৮ পয়েন্টে। এর পরই শুরু হয় একবার এ-দলের এগনো, আর-একবার অন্য দলের। শেষদিকে দুর্দান্ত খেলেন যুগোস্লাভিয়ার 'প্লেমেকার' আলেকজান্ডার জরজেভিক। ৪১ পয়েন্ট 'স্কোর' করেন তিনি। তা সত্ত্বেও খেলা শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে লিথুয়ানিয়া এগিয়ে যায় ৮৩—৮১ পয়েন্টে। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে, যুগোস্লাভিয়া ম্যাচ বের করে নিয়ে যায়। খুশিতে উজ্জ্বল যুগোস্লাভিয়ার কোচ ডুসান ইভকোভিক বলেন, "আমার ছেলেরা দেশের প্রাপ্য সম্মান এনে দিল।" লিথুয়ানিয়ার খেলোয়াড় এবং কোচের অভিযোগ, আমেরিকার রেফারি তাঁদের জোর করে হারিয়ে দিয়েছেন। এই টুর্নামেন্টে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান পায় ক্রোয়েশিয়া এবং গ্রিস।

❑

যতই তাঁকে ব্রাজিল দল থেকে বাদ দেওয়া হোক, এখনও ব্রাজিলে রোমারিও যে কতখানি জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝা গেল সম্প্রতি একটি ঘটনায়। একটি শক্ত ম্যাচের দু'দিন আগে ফ্লেমেঙ্গো ক্লাবের প্র্যাকটিসে সব খেলোয়াড় উপস্থিত থাকলেও দেখা যায়নি

রোমারিও

রোমারিওকে। কী ব্যাপার ? খোঁজা হল বাড়িতে। সেখানে তিনি নেই। সঙ্গে-সঙ্গে সারা রিও শহর তোলপাড়। কর্মকর্তাসহ সমর্থকরা খবর পেয়েই উদ্বিগ্ন, খবর গেল পুলিশে। সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হল সতর্ক বার্তা। কিন্তু ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই রোমারিও হাজির। কী হয়েছিল তাঁর, কোথায় গিয়েছিলেন তিনি! সলজ্জ ভঙ্গিতে রোমারিও জানান, গত রাতে বন্ধুর বাড়িতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলেন তিনি। ফলে উঠতে দেরি হয়েছিল।

দর্শক

এবার সুইপার হিসেবে খেলবেন গুলিট

হল্যান্ডের আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা রুড গুলিটকে এবার নতুন 'পজিশন'-এ খেলতে দেখা যাবে। লিখেছেন **সমর গুপ্ত**

গত মরসুমে দুর্দান্ত ফুটবল খেলে ইংল্যান্ডের দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন জুরগেন ক্লিন্সম্যান। এবার ইংল্যান্ডের টটেনহ্যাম হসপার ক্লাব ছেড়ে স্বদেশ, জার্মানিতে ফিরে গিয়েছেন স্ট্রাইকার ক্লিন্সম্যান। তিনি ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে যাওয়ায় সে-দেশের দর্শকরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের নিরাশা অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছেন রুড গুলিট। হল্যান্ডের এই অভিজ্ঞ 'স্ট্রাইকার' এবার যোগ দিয়েছেন ইংল্যান্ডের চেল্‌সি ক্লাবে। শুধু যোগ দেওয়াই নয়, এবার একটা চমকও দেবেন গুলিট। স্ট্রাইকার হিসেবে তিনি এবার খেলবেন না। খেলবেন সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত 'পজিশন'-এ। 'সুইপার' হিসেবে খেলতে দেখা যাবে গুলিটকে। নিজের দলের গোলরক্ষকের ঠিক আগে রক্ষণভাগের দুর্গ সামলাবেন রুড গুলিট। অনভ্যস্ত হলেও গুলিট এই পজিশনে প্রথম খেলছেন না। ফুটবল-জীবনের একেবারে প্রথম দিকে রক্ষণভাগেই খেলতে ভালবাসতেন তিনি। পরে কোচের পরামর্শে আক্রমণ ভাগে চলে আসেন। স্ট্রাইকার তিনি সাফল্য পান, আন্তর্জাতিক তারকা হয়ে ওঠেন। স্ট্রাইকার হিসেবে তিনি হল্যান্ডের হয়ে গোল করেছেন ১৬টি, আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ৬৬টি। ইতালির এ. সি. মিলান এবং সাম্পাদোরিয়া ক্লাবে গত আট বছর তিনি আক্রমণভাগেই খেলেছেন। আর এক ডাচ স্ট্রাইকার মার্কো ভ্যান বাস্তেনের সঙ্গে তিনি এক সময় ইউরোপীয় ফুটবলে ঝড় তুলেছিলেন।

হাঁটুর আঘাতের জন্য গুলিট গত কয়েক বছর ভাল খেলতে পারছিলেন না। কিন্তু ৩২ বছর বয়সী গুলিট এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এবং সেজন্যই তিনি ইতালির সাম্পাদোরিয়া ছেড়ে ইংল্যান্ডের চেল্‌সি ক্লাবে গিয়ে নতুন পজিশনে খেলার চ্যালেঞ্জ নিতে পারলেন। গুলিট বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কোনও-না-কোনও সময়ে এরকম চ্যালেঞ্জ আসে। নতুন পজিশনে গুছিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে, কিন্তু আমি ভাল খেলবই।"

গুলিট এই চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন আরও একটি কারণে। চেল্‌সির বর্তমান ম্যানেজার গ্লেন হোডেলকে খুব শ্রদ্ধা করেন গুলিট। তাঁর আহ্বানেই প্রকৃতপক্ষে গুলিট চেল্‌সিতে খেলতে রাজি হয়েছেন।

গুলিট যে ভাল খেলবেনই সে সম্বন্ধে নিশ্চিত চেল্‌সি ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তাঁকে এখন প্রতি সপ্তাহে ১৫ হাজার পাউন্ড বা সাত লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। দর্শক-সংখ্যা, অর্থাৎ টিকিট বিক্রি বাড়লেই এই টাকা আরও বাড়বে। সুইপার হিসেবে গুলিটের খেলা দেখতে যে মাঠ দর্শকে ভরে যাবে তা এখনই বলে দেওয়া যায়।

ইউ. এস. ওপেনে কি নতুন কেউ চ্যাম্পিয়ান হবেন

আর ক'দিন পরেই নিউ ইয়র্কের ন্যাশনাল সেন্টার কোর্টে শুরু হচ্ছে ২৭তম ইউ. এস. ওপেন। টেনিস-তারকাদের বছরের এই শেষ অগ্নিপরীক্ষায় কারা সফল হতে পারেন ? লিখেছেন **দেবকিশোর সরকার**

মেরি পিয়ার্স

টমাস মুস্টার

কনচিতা মার্টিনেজ

বিশ্ববিখ্যাত টেনিস-তারকা বিল টিলডেন, জিমি কোনর্স, জন ম্যাকেনরো, বরিস বেকার, স্তেফান এডবার্গ, গোরান ইভানেসেভিচ, টড মার্টিন ও পিট সাম্প্রাস— এঁদের মধ্যে মিল কোথায় ? টিলডেন বেসরকারি ভাবে নিজের সময়ে এক নম্বর টেনিস-তারকা ছিলেন। বাকিদের মধ্যে টড মার্টিন ও ইভানিসেভিচ ছাড়া আর প্রত্যেকেই এটিপি টুরে কোনও-না-কোনও সময়ে এক নম্বরে থেকেছেন। সাম্প্রাস তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন। টেনিস সম্বন্ধে যাঁরাই একটু খোঁজখবর রাখেন চোখ বুজে বলে ফেলবেন এঁরা প্রত্যেকেই 'বিগ সার্ভার', এঁরা কিন্তু রোলা-গ্যাঁরোর মন্থর, লাল মাটিতে সফল হতে পারেননি। কিন্তু বিগ সার্ভাররা যে 'ফ্লাশিং মেডো'য় সবচেয়ে বেশি সফল, তার প্রমাণ আগের ইউ. এস. ওপেন গুলির ফলাফল দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জিমি কোনর্স পাঁচবার, তাঁরই সতীর্থ ম্যাকেনরো চারবার। আর বাকিদের মধ্যে মার্টিন ও ইভানিসেভিচ ছাড়া প্রত্যেকেই এক বা একাধিকবার ওপেন খেতাব জয় করেছেন। এর ব্যতিক্রম ঘটেছে কেবল ইভান লেন্ডলের ক্ষেত্রে। বিগ সার্ভার না হয়েও লেন্ডল পরপর তিনবার ইউ. এস. খেতাব দখলে রাখেন। কিন্তু উইম্বলডন তাঁর ভাগ্যে কখনও জোটেনি।

আজ থেকে ২৭ বছর আগে ১৯৬৮ সালে প্রথম ইউ. এস. ওপেন পুরুষ সিঙ্গল্‌সের খেতাবটি অ্যামেচার টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে লাভ করেছিলেন আর্থার অ্যাশ। এর পর থেকে

টেনিস-দুনিয়ার অনেক রথী-মহারথী ইউ. এস. ওপেনে এসেছেন। কিন্তু ডিকো টার্ফের ছলাকলা, বলের অসমান 'বাউন্স' ও টেনিসের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হাওয়া বুঝতে না বুঝতেই বিদায় নিতে হয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার কোর্ট থেকে। বিশ্বের কমবয়সী পুরুষদের টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে এবার নিয়ে পরপর টানা তিনবার উইম্বলডন জয়ী সাম্প্রাস। ১৯৯০-এর ইউ. এস. ওপেন খেতাবটি তিনি জয় করেছিলেন। মেয়েদের মধ্যে কমবয়সী খেলোয়াড় হিসেবে ট্রেসি অস্টিন ১৯৭৯ সালে এই সম্মান পেয়েছিলেন। ফ্রেঞ্চ ওপেনে সাফল্য না পেলেও বাকি তিনটে গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স হওয়ার সুবাদে, ধারাবাহিকতার দিক থেকে এবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান সাম্প্রাসই অনেকটা এগিয়ে আছেন। যদিও গত ইউ. এস. ওপেন ও এবারের

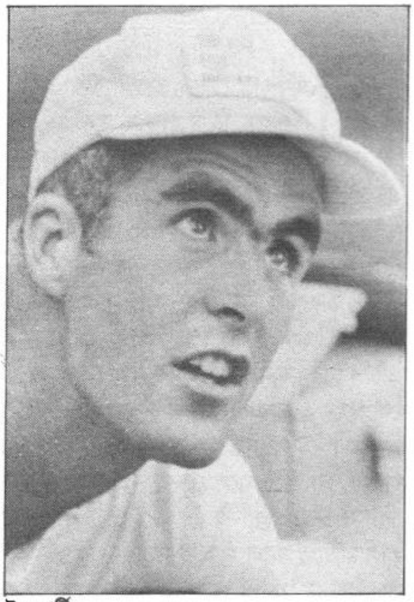

টড মার্টিন

অস্ট্রেলিয়া ওপেন জয়ী আগাসি এক নম্বর জায়গাটা এখন নিজের দখলেই রেখেছেন। এ-বছর উইম্বলডন জিতে হ্যাট্‌ট্রিক করার সুবাদে সাম্প্রাস যে দারুণ ফর্মে আছেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। এই মুহূর্তে টেনিস সার্কিটে তাঁকে হারাতে পারেন আন্দ্রে আগাসি ছাড়া আর কোনও খেলোয়াড় আছেন কি না সন্দেহ।

এখন টেনিস সার্কিটে জয়ের জন্য বিগ সার্ভার হওয়া যেমন দরকার, সেইসঙ্গে 'ক্রশকোর্ট ভলি', 'ড্রপশট', 'ফোর হ্যান্ড' ও 'ব্যাক হ্যান্ড'-এ চোখধাঁধানো 'পাশিং শট', দুর্দান্ত 'সার্ভিস রিটার্ন', জোরালো 'গ্রাউন্ড স্ট্রোক' ও সবচেয়ে 'পাওয়ার টেনিস' দরকার। এ ছাড়া দরকার 'ফিটনেস'ও। এবারের উইম্বলডনে সাম্প্রাস যে ফেভারিট ছিলেন, সেটা টেনিস-বোদ্ধারা আগেই স্বীকার করেছিলেন। ১৯৯৩, '৯৪ ও '৯৫-এর উইম্বলডন, '৯০ ও '৯৩ ইউ. এস. ওপেন, '৯৪-এ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী সাম্প্রাসের এ-বছরের রেকর্ড ৩৭টি জয় ও ৯টি পরাজয়। দ্রুতগতির সার্ভ, প্রচণ্ড শক্তিশালী গ্রাউন্ড স্ট্রোক, ক্রশ কোর্ট ভলি, ব্যাকহ্যান্ড ও ফোরহ্যান্ডে জোরালো পাশিং শট, এ ছাড়া পুরুষদের সার্কিটে এখন অন্যতম সেরা সাম্প্রাস। শারীরিক দিক থেকেও তিনি শতকরা একশোভাগ ফিটনেসের অধিকারী। এখনকার ফর্মকে সাম্প্রাস যদি ন্যাশনাল সেন্টার কোর্টে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারেন, তা হলে উইম্বলডনের পর ইউ. এস. ওপেনে চ্যাম্পিয়ানের ট্রোফিটিও তাঁর হাতেই হয়তো দেখা যাবে। এদিকে এক নম্বর শীর্ষবাছাই গতবারের ইউ. এস. ওপেন এবং এবারে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ী যুক্তরাষ্ট্রের আন্দ্রে আগাসি ফর্মের দিক থেকে পিছিয়ে নেই। এবারে উইম্বলডনে চমৎকার খেলা সত্ত্বেও তৃতীয় বাছাই বরিস বেকারের কাছে তাঁকে হারতে হয়। বেসলাইন থেকে যে উইম্বলডন জেতা যায় '৯২-এর উইম্বলডন জিতে আগাসি তা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এবারে তিনি ব্যর্থ হলেন। উইম্বলডনে ব্যর্থ হলেও ফর্মের ও খেলার দিক থেকে আগাসি এগিয়ে আছেন। দুর্দান্ত সার্ভিস রিটার্ন ও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বেসলাইন থেকে টপস্পিন নির্ভর গেমে যে ফ্লাশিং মেডোয় সফল হওয়া যায়, তা গতবারে ইউ. এস. ওপেন ফাইনালে জার্মানির মাইকেল স্টিখকে ৬-১, ৭-৬ ও ৭-৫ স্ট্রেট সেটে গুঁড়িয়ে দিয়ে আগাসি প্রমাণ করেছিলেন। সুতরাং এবারেও তিনি যে চ্যাম্পিয়ান তালিকায় ফেভারিট, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সাম্প্রাস ও আগাসি ছাড়া চ্যাম্পিয়ান তালিকায় আর যাঁরা থাকবেন তাঁরা হলেন, এবারের উইম্বলডন রানার্স বরিস বেকার, ইভানেসেভিচ, টড মার্টিন, এডবার্গ, কাফেল নিকভ ও সেড্রিক পিওলিন। '৮৯ সালে ইউ. এস খেতাব জয়ী বেকার উইম্বলডনে তাঁর '৮৫ সালের ফর্ম ফিরে পাওয়ায় মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে যে অনেকটাই এগিয়ে আছেন, এ-বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। সুতরাং ওই ট্রোফি জয়ের দৌড়ে তিনি যে ইউ. এস. ওপেনে চমক দেখাবেন, তা বলা যেতে পারে। এ ছাড়া মাইকেল স্টিখও লড়বেন। বাকিদের মধ্যে আছেন সেড্রিক পিওলিন, যিনি '৯৩-এর ইউ. এস. ওপেন রানার্স, এবারেও ভাল ফর্মে আছেন। আর যদি কোনও অঘটন ঘটে তবে ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ী টমাস মুস্টারের মতোই নতুন কেউ চ্যাম্পিয়ানের ট্রোফিটি হাতে নিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসবেন।

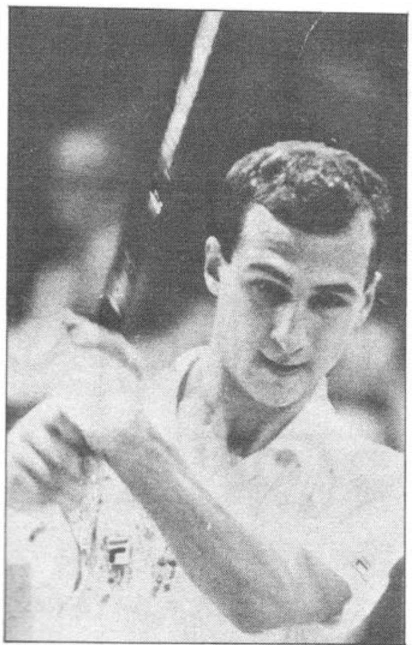

আন্দ্রেই মেদভেদেভ : চমক দেখাতে পারেন

মেয়েদের মধ্যে জার্মান তরুণী স্টেফি গ্রাফ যে অপ্রতিরোধ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৮৮-'৯০ ও '৯৪-এ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ১৯৮৭-৮৮, '৯৩ ও '৯৫-এ ফরাসি ওপেন, ১৯৮৮-'৮৯ ও '৯৩-এ ইউ. এস. ওপেন ও ১৯৮৮-'৮৯, ১৯৯১-'৯৩ ও '৯৫-এ উইম্বলডন জয়ী স্টেফির বিজয়রথ থামানোর মতো আর কোনও মহিলা-তারকা আছেন বলে মনে হয় না। একমাত্র গতবারের ইউ. এস. ওপেন জয়ী, এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন রানার্স সাঞ্চেজই তাঁকে বেগ দিতে পারেন। এবারের উইম্বলডনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই সত্ত্বেও স্পেনের ২৩ বছরের এই তরুণীটি স্টেফির কাছ থেকে উইম্বলডনের মুকুটটি ছিনিয়ে নিতে পারেননি। ১৭ বার গ্র্যান্ড স্লাম ও সব মিলিয়ে মোট ৯২টি সিঙ্গল্‌স খেতাব বিজয়িনী স্টেফি যদি অসুস্থ না হয়ে পড়েন, তা হলে সামনের ইউ. এস. ওপেনে তাঁর চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এবারের টেনিসের চমকপ্রদ বিষয় হল মোনিকা সেলেসের প্রত্যাবর্তন। আড়াই বছর পর এই প্রথম ইউ. এস. ওপেনে সেলেসকে র‍্যাকেট হাতে নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে খেলতে দেখা যাবে। সফল হবেন কি হবেন না, সেটা অবশ্য পরের কথা। ক্লে কোর্টে পারদর্শী তিন বার গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী ও সব মিলিয়ে ২২টি সিঙ্গল্‌স খেতাব জয়ী সাঞ্চেজ গতবারের চ্যাম্পিয়ান খেতাবটি ধরে রাখার জন্য এবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। কনচিতা মার্টিনেজ ও মেরি পিয়ার্স নিজেদের ফিরে পেতে ইউ. এস. ওপেনে লড়াই করবেন।

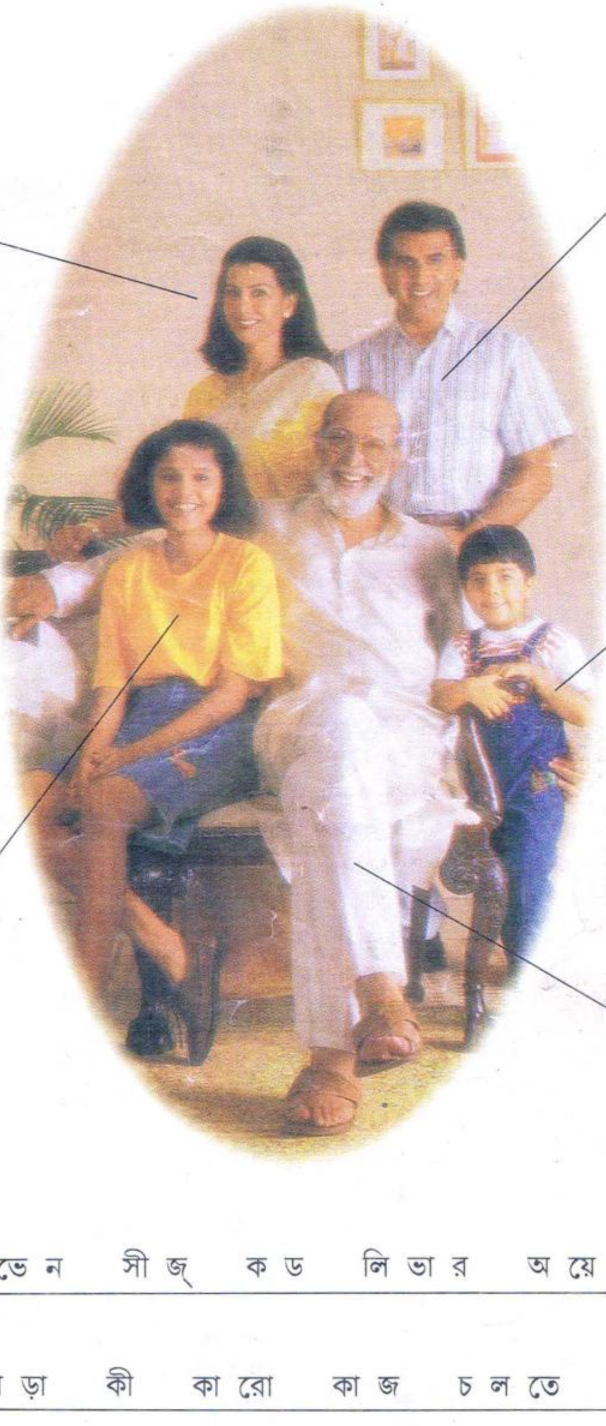

স্ট্যামিনা বাড়ায় । ফলে লিফট্
বন্ধ থাকলেও সিঁড়ি ভাঙ্গাটা
কষ্টসাধ্য হয় না ।

*লে আনে বাড়তি জৌলুষ । আর
ত্বককে এমনই সজীব করে* যে
পনার বয়স চট্ করে আন্দাজ করে
উঠতে পারবেনা সকলে ।

দাঁত ও হাড় শক্ত করে । যাতে
স্কুল-মাস্তানদের মোকাবিলা করাটা
বাঁ-হাতের খেলা হয়ে দাঁড়ায় ।

-কাশি রোধের ক্ষমতা বাড়ায় ।
সেইজন্যেই তো স্কুল কামাই করার
অজুহাতটা মাঠে মারা যায় ।

গাঁটের ব্যথা বেদনা দূর করে । তাই
নাতি-নাতনিদের সাথে সমানতালে
হুটোপুটি করাটা সহজ হয়ে দাঁড়ায় ।

সে ভে ন সী জ্ ক ড লি ভা র অ য়ে ল ।

এ টা ছা ড়া কী কা রো কা জ চ ল তে পা রে ?

সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল পাওয়া যায় ক্যাপসুল ও তরল রূপে । জীবনের খুঁটিনাটি ঝুটঝামেলা সামলানোর অফুরন্ত শক্তি ও উদ্যম পেতে হলে নিয়মিতভাবে রোজ এটি সেবন করুন ।

শ ক্তি র উ ৎ স্ ।

THE VITAL DAILY FOOD
SEVENSEAS
COD LIVER OIL

Grey UG.1.92 BEN

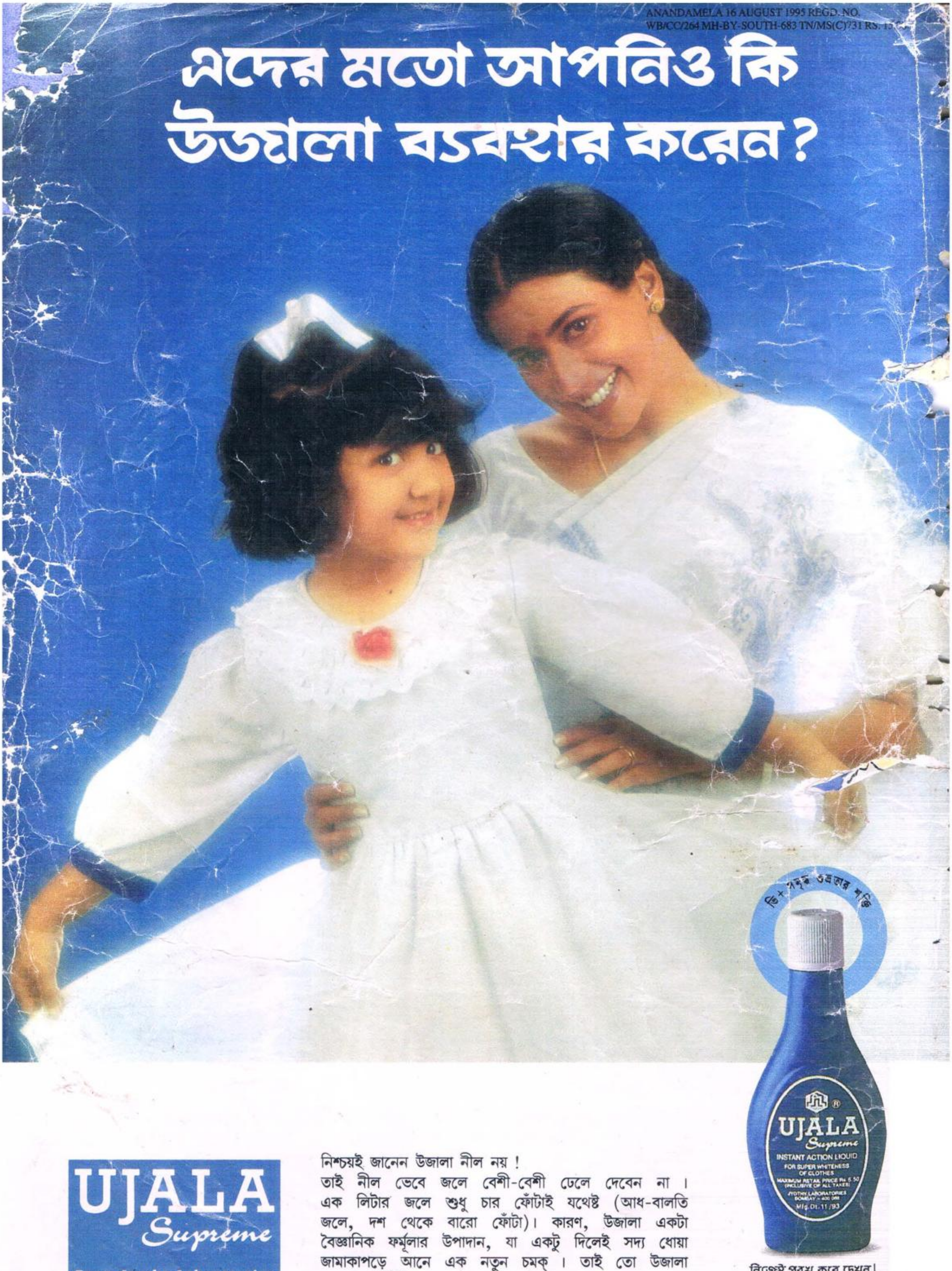
ANANDAMELA 16 AUGUST 1995 REGD. NO.
WB/CC/264 MH-BY-SOUTH-683 TN/MS(C)731 RS. 15
এদের মতো আপনিও কি
উজালা ব্যবহার করেন?
UJALA
Supreme
INSTANT ACTION LIQUID
FOR SUPER WHITENESS
OF CLOTHES
Mfg. Dt. 11/93
UJALA
Supreme
From Jyothy Laboratories
নিশ্চয়ই জানেন উজালা নীল নয় !
তাই নীল ভেবে জলে বেশী-বেশী ঢেলে দেবেন না । এক লিটার জলে শুধু চার ফোঁটাই যথেষ্ট (আধ-বালতি জলে, দশ থেকে বারো ফোঁটা)। কারণ, উজালা একটা বৈজ্ঞানিক ফর্মূলার উপাদান, যা একটু দিলেই সদ্য ধোয়া জামাকাপড়ে আনে এক নতুন চমক্ । তাই তো উজালা সচেতন গৃহিনীদের একমাত্র পছন্দ ।
নিজেই পরখ করে দেখুন।
উজালায় সত্যিই একটা ব্যাপার আছে